আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র গ্রন্থমালা—৬

আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা

পঞ্চম খণ্ড

আইজ্যাক অ্যাসিমভ

অনুবাদ : তুষার দে

॥ বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন ॥
কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের পক্ষে
শ্রীসুরেন নিয়োগী,
সাধারণ সম্পাদক
২০৩।২বি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
(ফোন—৩৪-৫৪৭৮)

মুদ্রাকর :
শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার
নিউ ভারতী প্রেস
২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

বাইণ্ডার :
ক্লাসিক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৫, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—১৯৬০ (সেপ্টেম্বর)

সূচীপত্র

পঞ্চম খণ্ড

দ্বাদশ অধ্যায়

কোষ

ক্রোমোজোম

অত্যন্ত বিচিত্র মনে হবে যে, অল্পদিন আগেও মানুষের নিজের দেহ সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল অতি সীমিত। বস্তুতঃ রক্ত সঞ্চালন সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান জন্মায় মাত্র ৩০০ বছর আগে এবং মাত্র গত অর্ধশতকের মধ্যেই বহু শারীর-যন্ত্রের-কার্যাবলী আবিষ্কৃত হয়।

রন্ধনের জন্য প্রাণীদেহ ছেদন করে এবং মরণোত্তর শবদেহ সংরক্ষণ প্রথার ফলে, প্রাগৈতিহাসিক মানুষ বড় বড় শারীর-যন্ত্রের, যথা—মস্তিষ্ক, যকৃৎ, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, অন্ত্র, মূত্রাশয় প্রভৃতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়। প্রাচীন গ্রীকেরা শারীরস্থান (anatomy) (গ্রীক কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কর্তন করা) সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাণীদেহ এবং এমন কি মানুষের মৃতদেহ পর্যন্ত ব্যবচ্ছেদ করত। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্ধে রোমে চিকিৎসা ব্যবসায়ে রত গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেনের সময়েই প্রাচীন শরীর-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধিত হয়। গ্যালেন শারীরক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে যে তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন, তা পরবর্তী দেড় হাজার বছর বেদবাক্যের মতো মেনে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মানবদেহ সম্বন্ধে তাঁর ধারণাগুলি ছিল বিচিত্র ত্রুটিতে পূর্ণ। এর কারণ অবশ্য সহজেই অনুমেয়। প্রাচীনেরা, নানা জীবজন্তুর দেহ ব্যবচ্ছেদ করেই তাঁদের অধিকাংশ জ্ঞান সঞ্চয় করতেন। নানা সংস্কারের প্রতিকূলতায় মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করা সম্বন্ধে মানুষের মনে অস্বস্তি ছিল।

পৌত্তলিক গ্রীকদের কটাক্ষ করে প্রাচীন খ্রীষ্টান লেখকেরা জীবিত মানবদেহ নির্মমভাবে ব্যবচ্ছেদ করার জন্য তাদের অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু সে অভিযোগ বিতণ্ডামূলক সাহিত্যপত্রের অন্তর্গত। গ্রীকরা সত্যই জীবিত মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করত কিনা তা যেমন সন্দেহজনক. তেমনই একথাও স্বতঃসিদ্ধ যে মানবীয় শারীরস্থান সম্বন্ধে বেশি কিছু জানবার মতো যথেষ্ট

শবও তারা ব্যবচ্ছেদ করত না। যাই হোক, শব ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে চার্চের নামঞ্জুরীই সারা মধ্যযুগে শারীরস্থান অধ্যয়ন কার্যতঃ স্থগিত রাখে। অবশ্য গোপনে, এ সম্বন্ধে কিছু কিছু গবেষণা চলত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি কিছু কিছু শব ব্যবচ্ছেদ করেন এবং তার থেকে শারীর বিদ্যার (physiology) যে তত্ত্বগুলি প্রণিধান করেন—সে তত্ত্বগুলি, গ্যালেনের তত্ত্বের চেয়েও অনেক প্রাগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু লিওনার্দো শিল্প ও বিজ্ঞান উভয় বিষয়েই প্রতিভাশালী হওয়া সত্ত্বেও সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় তাঁর কোনোই প্রভাব ছিল না। অনিচ্ছা অথবা সাবধানতা, যে কোনো কারণেই হোক, তিনি তাঁর আহৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি প্রকাশ না করে গোপন নোটবই-এ সাঙ্কেতিক অক্ষরে লিখে রেখে যান। পরবর্তীকালে তাঁর নোটবইগুলি প্রকাশিত হওয়ার পরই, উত্তরকালে তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে।

ফরাসী চিকিৎসক জঁ। ফেরনেলই, আধুনিককালে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করাকে চিকিৎসকের অন্যতম কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি এ বিষয়ে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। কিন্তু পরবর্তী বছরে উৎকৃষ্টতর আর একটি গ্রন্থ প্রকাশনার ফলে, তাঁর পুস্তক প্রায় সম্পূর্ণভাবে লোকচক্ষুর অগোচরে রয়ে গেল। শেষোক্ত পুস্তকটি হচ্ছে বিখ্যাত "ডি-হিউম্যানি করপোরিস ফেব্রিকা" মানবদেহ গঠন সম্পর্কীয়)। লেখক—এ্যানড্রিয়াস ভেসালিয়াস বেলজিয়ামবাসী ছিলেন, যদিও তাঁর অধিকাংশ কাজ তিনি ইতালীতে করেছিলেন। "মানব জাতির প্রকৃত জ্ঞাতব্য বিষয়—মানুষই"—এই তত্ত্বের ভিত্তিতে ভেসালিয়াস যথাযথ শব ব্যবচ্ছেদ করে গ্যালেনের বহু ত্রুটি সংশোধন করেন। তাঁর বইতে মানুষের শারীরস্থান সম্বন্ধীয় অঙ্কনগুলি (কথিত আছে সেগুলি বিখ্যাত শিল্পী টিশিয়ানের আঁকা) এতই সুন্দর ও নিখুঁত যে সেগুলি আজকের দিনেও পুনর্মুদ্রিত করা হয় ও ক্লাসিক বলে স্বীকৃত। এই কারণে ভেসালিয়াসকে আধুনিক শারীরস্থান বিদ্যার জনক বলা চলে। একই বৎসরে প্রকাশিত কোপার্নিকাসের "ডি-রেভোলিউশানিবাস অরবিয়াম্ সিলেসিয়াম-এর (De-Revolutionibus Orbium Coelestium) মতো তার ফেব্রিকা" Fabrica পুস্তকটিকেও বৈপ্লবিক পর্যায়ভুক্ত করা চলে।

কোপার্নিকাস যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন তাকে যেমন গ্যালিলিও ফলপ্রসূ করেছিলেন, ঠিক তেমনই ভেসালিয়াস কৃত সূচনা, উইলিয়াম হার্ভের

যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলিতে পূর্ণতা লাভ করে। হার্ভে ছিলেন ইংরেজ চিকিৎসক এবং গবেষণাবাদী। গ্যালিলিও এবং চৌম্বক সম্বন্ধে গবেষণাকারী উইলিয়াম গিলবার্টের তিনি সমসাময়িক। অতি প্রয়োজনীয় দৈহিক নির্যাস—রক্ত সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কৌতূহল ছিল। শরীরে এ বস্তুটির কার্যকারিতা কী—এই ছিল তাঁর প্রধান কৌতূহল।

এ তথ্য তাঁর জানা ছিল যে, জীবদেহে দু'রকম রক্তবহানালী আছে—শিরা ও ধমনী। খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে গ্রীক চিকিৎসক কস্‌বাসী প্র্যাক্সাগোরাস শেষোক্তটির নামকরণ করেন—"আর্টারী" (artery) যার গ্রীক শব্দগত অর্থ "আমি বাতাস বহন করি।" কারণ মৃতদেহে এই নালীগুলিকে রক্তশূন্য দেখা যেত। গ্যালেন পরবর্তীকালে দেখিয়েছিলেন যে, প্রাণীর জীবনকালে এগুলি রক্ত বহন করে। আরও জানা ছিল যে, হৃদস্পন্দন থেকেই রক্ত প্রবাহে গতি সঞ্চালিত হয়। কারণ কোনোও ধমনী ছিন্ন হলে হৃদস্পন্দন ও নাড়ীর সঙ্গে সমতালে ঝলকে ঝলকে রক্তপাত হয়ে থাকে।

গ্যালেন মত প্রকাশ করেছিলেন যে, রক্তবহা নালীগুলির মধ্যে রক্ত প্রবাহ করাতের গতির মতো দ্বিমুখী, অর্থাৎ একবার একমুখে শরীরের মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং পরে আবার বিপরীত মুখে প্রবাহিত হয়। এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাঁর ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন ছিল যে, দ্বিধা বিভক্ত হৃদপিণ্ডের মধ্যের প্রাচীরের মধ্য দিয়ে দ্বিমুখী ধারায় প্রবাহিত রক্তস্রোত, কেন প্রতিরুদ্ধ হয় না। গ্যালেন সহজে এর জবাব কল্পনা করে নিয়েছিলেন যে, এই প্রাচীর অদৃশ্য ছিদ্রে ভরা, যার মধ্যে রক্তপ্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয় না।

হার্ভে হৃদপিণ্ডকে আরও নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, দ্বিধা বিভক্ত হৃদপিণ্ডের প্রত্যেকটি ভাগ আবার দুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। এই দুটি প্রকোষ্ঠকে পৃথক করে রাখে একটি একমুখী দ্বার (One way valve); এর মধ্য দিয়ে, রক্ত—উপর প্রকোষ্ঠ বা অলিন্দ (auricle) থেকে নীচের প্রকোষ্ঠ বা নিলয়ে (ventricle) চলাচল করতে পারে; কিন্তু বিপরীত চলাচল সম্ভব হয় না। অন্য কথায়, অলিন্দে প্রবিষ্ট রক্ত সঙ্কোচনের ফলে নীচস্থ নিলয়ে এবং তার থেকে যে সব রক্তবহানালীর উৎপত্তি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু বিপরীত পথে প্রবাহিত হতে পারে না।

রক্তবহানালী দিয়ে কোন দিকে রক্ত প্রবাহিত হয় তা জানবার জন্য হার্ভে কতকগুলি সহজ এবং সুন্দর সুস্পষ্ট পরীক্ষা করলেন। তিনি জীবিত প্রাণী

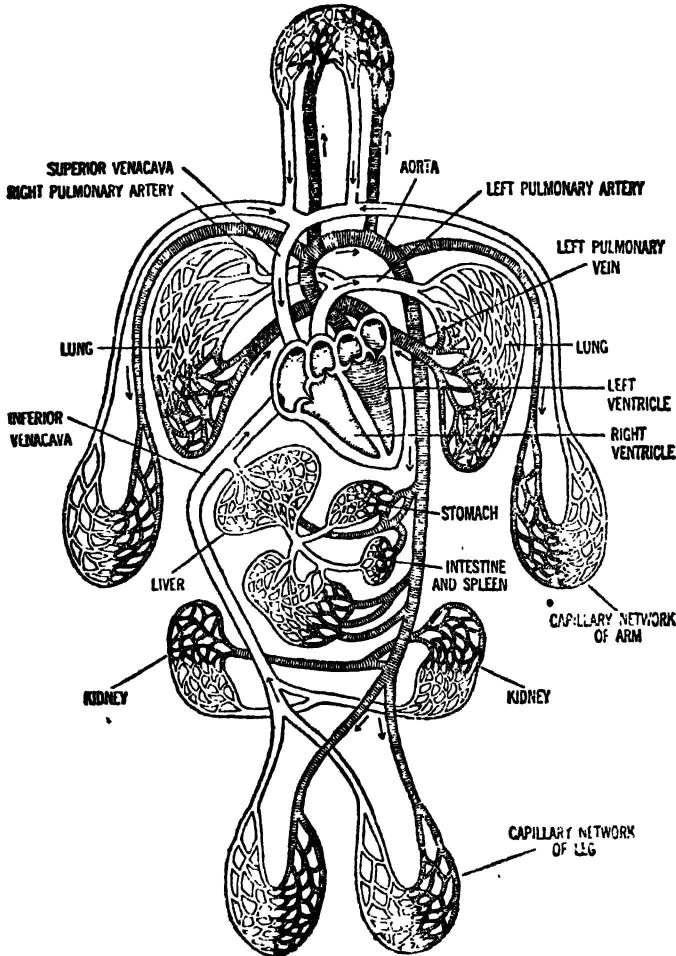
দেহের কোনো শিরা অথবা ধমনী বেঁধে দিয়ে লক্ষ্য করতেন, এই বাধার ফলে রক্তচাপজনিত স্ফীতি বাঁধনের কোন দিকে হয়। তিনি দেখলেন, ধমনী প্রবাহ রুদ্ধ হলে তাতে যে চাপজনিত স্ফীতি তা সব সময়েই হৃদপিণ্ড ও বাঁধনের মধ্যখানে হয়। এর অর্থ, হৃদপিণ্ড থেকে বর্হিগামী পথেই ধমনীতে রক্ত সঞ্চালিত হয়ে থাকে। আবার শিরার বাঁধনে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, চাপজনিত স্ফীতি বিপরীত দিকে হয়। অতএব সিদ্ধান্ত করা চলে যে, শিরার মধ্যে রক্ত চলাচল অবশ্যই হৃদপিণ্ডমুখী হয়ে থাকে।

হার্ভে রক্তপ্রবাহের পরিমাণেরও মাত্রিক পরিমাপ করেন (এবং বস্তুতঃ তিনিই প্রথম জীববিজ্ঞানে গণিতের প্রয়োগ করেন)। তাঁর পরিমাপ অনুযায়ী প্রত্যেক অর্ধঘণ্টায় যে পরিমাণ রক্ত হৃদপিণ্ড থেকে চালিত হয় তা সমগ্র দেহের রক্তের পরিমাণের সমান। এ অনুমান অযৌক্তিক যে, এই হারে শরীরে নতুন রক্ত উৎপাদিত হতে পারে অথবা নিঃশেষে ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত এই যে একই রক্ত বারংবার আবর্তিত হতে থাকে। যেহেতু রক্ত হৃদপিণ্ড থেকে ধমনীতে প্রবাহিত হয় এবং শিরার মধ্য দিয়ে আবার হৃদপিণ্ডে ফিরে যায়, হার্ভে সিদ্ধান্ত করেন যে, হৃদপিণ্ডের সঙ্কোচনের ফলে রক্ত ধমনীতে পরিচালিত হয়। সেখান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় শিরায় এবং শিরার মধ্য দিয়ে আবার ফিরে যায় হৃদপিণ্ডে। হৃদপিণ্ডের সঙ্কোচনের ফলে রক্ত আবার ধমনীতে প্রবেশ করে। চক্রাকারে একই ব্যাপার চলতে থাকে। অর্থাৎ হৃদপিণ্ড এবং রক্তবহানালীর মাধ্যমে রক্ত, সর্বদা একই গতিপথে প্রবাহিত হয়।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সমেত পূর্ববর্তী শারীরস্থানবিদ্‌রা এই রকম তত্ত্বেরই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, কিন্তু হার্ভেই প্রথম বিশদ অনুসন্ধান করে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তাঁর পরীক্ষার যুক্তিসঙ্গত বিবরণী "ডি মোটাস্ করডিস্" (De Motus Cordis) (হৃদয়ের গতি সম্পর্কে) নামে একটি নিকৃষ্টরূপে মুদ্রিত ক্ষুদ্র পুস্তকে ; ১৬২৮ সালে এটি প্রকাশ করেন। এই বইটি এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানের ক্লাসিক পর্যায়ের অন্তর্গত।

হার্ভের পুস্তকে যে প্রধান প্রশ্নটি অনুত্তর ছিল তা হল—কেমন করে রক্ত ধমনী থেকে শিরায় প্রবেশ করে? হার্ভে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই কোথাও সংযোগ সাধনী নালী আছে, যদিও তা এত সূক্ষ্ম যে দেখা যায় না। এ কথায় মনে পড়ে গ্যালেনের তত্ত্ব যে, 'হৃদপিণ্ড বিভক্তকারী প্রাচীর অদৃশ্য ছিদ্রে ভরা'।

অবশ্য গ্যালেনের তত্ত্ব প্রমাণিত হয়নি, কারণ হৃদপিণ্ডের প্রাচীর মধ্যে ছিদ্রের সন্ধান কখনোই পাওয়া যায়নি। কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে



রক্ত সংবহন প্রণালী

হার্ভে কথিত সংযোগসাধনী নালীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হল। হার্ভের মৃত্যুর ঠিক চার বৎসর পরে ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় চিকিৎসক মারসেলো ম্যালপিঘি আদি

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাঙের ফুসফুস-কলা (lung tissues) পরীক্ষা করছিলেন। সেখানে হার্ভে কথিত ধমনী ও শিরার সংযোগ-সাধনী ক্ষুদ্র রক্তবহানালীর সন্ধান নিশ্চিতরূপে পাওয়া গেল। তিনি তাদের নাম দিলেন "কৈশিক নালী" (capilliaries), যার ল্যাটিনগত অর্থ হচ্ছে চুলের মতো।

অণুবীক্ষণের ব্যবহার প্রচলিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জীববিদ্যাবিদ্‌রা জীবিত বস্তুর মর্মমূলে প্রবেশের ছাড়পত্র পেলেন। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, ইংরেজ বৈজ্ঞানিক রবার্ট হুক তাঁর নবাবিষ্কৃত মিশ্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রে (compound microscope), (যাতে একটি মাত্র লেন্সের পরিবর্তে একাধিক লেন্স ব্যবহৃত হয়, ফলে বিবর্ধন বৃদ্ধি পায়) আবিষ্কার করলেন যে, এক ধরনের গাছের বল্কল যা ছিপি রূপে ব্যবহৃত হয় তা অতি মিহি স্পঞ্জের মতো (sponge) বহু ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। তিনি এগুলির নামকরণ করলেন কোষ (cell)। মঠে সাধু সন্ন্যাসীদের বসবাসের জন্য যে ছোট ছোট ঘর থাকে "সেল" কথাটি তার থেকেই গৃহীত। অন্যান্য অণুবীক্ষণ ব্যবহারকারীরা, তরল পদার্থপূর্ণ অনুরূপ নানা কোষ জীবিত কলার মধ্যেও পরে লক্ষ্য করেন।

পরবর্তী দেড় শতাব্দীতে, জীবতত্ত্ববিদ্‌রা ক্রমশঃ ক্রমশঃ উপলব্ধি করলেন যে, সমস্ত জীবিত বস্তুই কোষ দ্বারা গঠিত এবং প্রত্যেকটি একক কোষই জীবন হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কয়েক ধরনের প্রাণপদার্থ এবং কিছু অণুপ্রাণও (micro-organism) একটি মাত্র কোষে গঠিত। বৃহত্তর প্রাণী দেহ বহু সুসম্বদ্ধ কোষের সমন্বয়। এই মতবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে ফরাসী শারীর-বৃত্তবিশারদ রেণি জোয়াকিম্ হেন্‌রী ডুট্রোশেট অন্যতম। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর বিবরণী অবশ্য পণ্ডিতদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে অসমর্থ হয়। ১৮৩৮ ও ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, যথাক্রমে জার্মান পণ্ডিত ম্যাথিয়াস্ জেকব স্লেডেন্ এবং থিওডোর শোয়ান্ পরস্পর নিরপেক্ষভাবে এই কোষ-মতবাদ প্রকাশ করলে তবেই তা প্রাধান্য লাভ করে।

রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যায় পারমাণবিক তত্ত্বের যে, ভূমিকা—জীববিদ্যায় কোষতত্ত্বেরও সেই একই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রাণের গতিবিদ্যায় এর গুরুত্ব, জার্মান রোগবিদ্যাবিদ্ (Pathologist) রুডল্‌ফ্ ভিরশাউ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এক সুপ্রথিত ল্যাটিন্ বাক্যাংশে প্রকাশ করেন, যার অর্থ "কোষ থেকেই সকল

কোষের উৎপত্তি।" তিনি প্রমাণ করলেন যে, রোগগ্রস্ত কলাগুলির কোষসমূহ মূলতঃ সুস্থ কোষসমূহ বিভাজনের ফলে উৎপন্ন হয়।

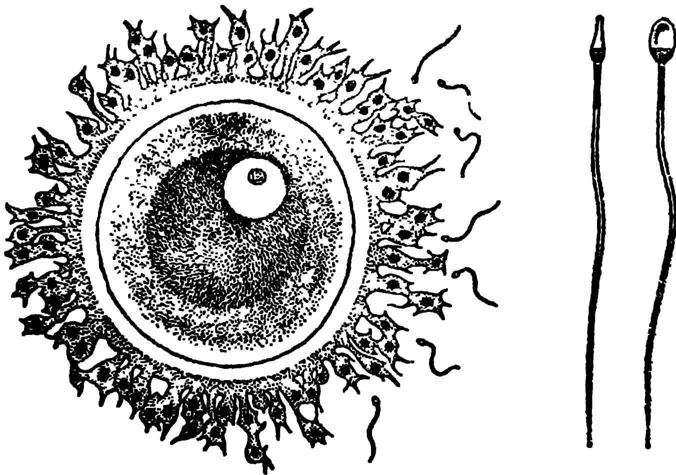
এই সময়ের মধ্যে এ তথ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রত্যেক প্রাণই, এমন কি বৃহত্তম প্রাণীও একক কোষরূপে জীবন শুরু করেছিল। আদি অণুবীক্ষণ-বিদদের মধ্যে লীভেন হুকের সহকারী জোহান হ্যাম্ শুক্ররসের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর সন্ধান পান, পরে যার নাম দেওয়া হয় শুক্রাণু (Spermatozoa, গ্রীক শব্দগত অর্থ 'প্রাণীর বীজ')। আরও অনেক পরে, ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে, জার্মান শরীরতত্ত্ববিদ্ কার্ল আর্নেষ্ট ফন বেয়ার স্তন্যপায়ী জীবের "ওভাম" (ovum) বা 'ডিম্বকোষ' আবিষ্কার করেন। জীববিদ্যাবিদ্‌রা ক্রমশঃ উপলব্ধি করেন যে, ডিম্বকোষ ও শুক্রাণুর মিলনের ফলে একটি নিষিক্ত ডিম্বাণুর (fertilised ovum) সৃষ্টি হয়, যার থেকে পুনঃপুনঃ কোষ বিভাজন ও পুনর্বিভাজনের ফলে প্রাণীর উৎপত্তি হয়।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল—কোষ কি করে বিভাজিত হয়? এর উত্তর পাওয়া গেল কোষের একটি গুটিকাকৃতি এবং অপেক্ষাকৃত ঘনবস্তুর মধ্যে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে, স্কটল্যাণ্ডবাসী উদ্ভিদ বিদ্যাবিদ্ রবার্ট ব্রাউন প্রথম এর বিবরণ দান করেন এবং নামকরণ করেন "কেন্দ্রক" (nucleus) (পরমাণু কেন্দ্রক থেকে পার্থক্যের জন্য এখন থেকে আমরা এটিকে 'কোষ-কেন্দ্রক' বলে অভিহিত করব)।

যদি কোনো এক-কোষ প্রাণী দুটি অংশে বিভাজিত হবার সময় কোষ-কেন্দ্রকটি একটি অংশের অন্তর্গত হয়, তাহলে কোষ কেন্দ্রকটি যে অংশে থাকে তা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি লাভ করে এবং পুনরায় বিভাজিত হয়, কোষ-কেন্দ্রকহীন অপর অংশটি হয় না। (পরে জানা গিয়েছে যে, স্তন্যপায়ী জীবের লোহিত-কণিকায় কেন্দ্রকের অভাব থাকায় সেগুলি স্বল্পায়ু এবং সেগুলির বৃদ্ধি অথবা বিভাজনের ক্ষমতা থাকে না। সেজন্য এগুলি সঠিকভাবে কোষ বলে গণ্য হয় না, সাধারণতঃ এগুলিকে বলা হয় কণিকা—corpuscles)।

দুর্ভাগ্যক্রমে কোষ-কেন্দ্রক এবং বিভাজন প্রক্রিয়ার আরও বিস্তৃত পর্যালোচনা বহুদিন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, কারণ কোষ কিছুটা স্বচ্ছ হওয়ায় তার অন্তঃস্থ পদার্থগুলি দেখা সম্ভব ছিল না। অবশেষে যখন আবিষ্কৃত হল যে, কোনো কোনো রঞ্জক, কোষের বিশেষ অংশগুলিকে রঞ্জিত করে, পরিশিষ্ট অংশকে করে না, তখন পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হল। "হিমাটক্সিলিন"

রঞ্জক (মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকায় জাত বৃক্ষ **Halmatoxylon Campechianum**-এর সারকাষ্ঠ উপজাত রঙ) কোষ-কেন্দ্রকটি কালো রঙে রঞ্জিত করে বর্ণহীন কোষের পটভূমিকায় সুস্পষ্ট করে তোলে। পার্কিন



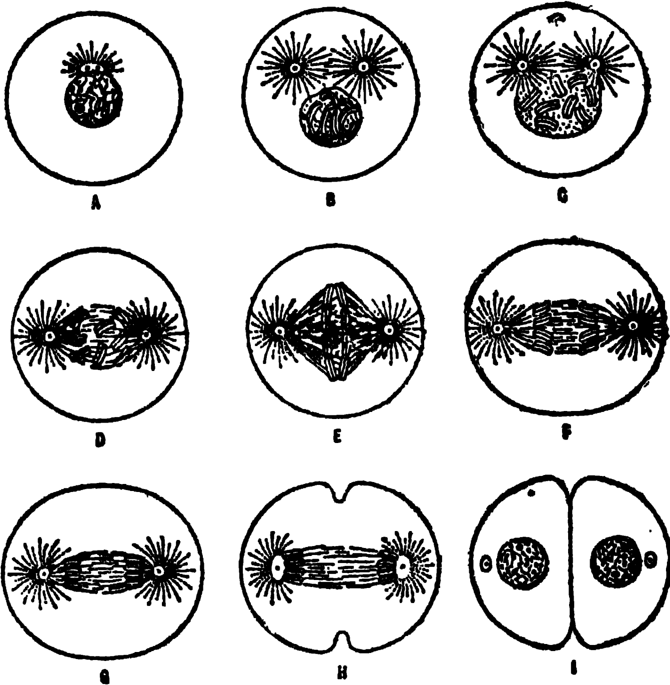
মনুষ্য ডিম্ব এবং শুক্রকোষ সমূহ

এবং অন্যান্য রসায়নবিদরা সংশ্লেষিত রঞ্জকের উৎপাদন শুরু করলে জীববিদ্যাবিদরা নানা রঙের মধ্যে নিজেদের মনোমত রঞ্জক পছন্দ করার সুযোগ পেলেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে, জার্মান জীববিদ্যাবিদ ওয়েলথার ফ্লেমিং লক্ষ্য করেন যে, কোনো কোনো লাল রঞ্জকের সাহায্যে কোষ-কেন্দ্রকে ছড়িয়ে থাকা কণাময় এক বিশেষ বস্তুকে রঙ করা যায়। তিনি এইগুলির নাম দেন "ক্রোমাটিন" (**chromatin**, গ্রীক শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ রঙ)। এই বস্তুটিকে পরীক্ষা করে ফ্লেমিং কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত কতকগুলি পরিবর্তন অনুধাবন করতে সক্ষম হন। অবশ্য রঞ্জিত করার ফলে কোষটির মৃত্যু হয়। তবু পাতলা এক টুকরা কলায় তিনি বিভিন্ন কোষকে বিভাজনের বিভিন্ন অবস্থায় দেখতে পান। ঐগুলি যেন স্থির চিত্র—যেগুলি পর পর যুক্ত করে তিনি কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার এক রকম গতিশীল চিত্র সৃষ্টি করেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লেমিং একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক প্রকাশ করেন, যাতে তিনি কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ার বিশদ বর্ণনা দেন। কোষ বিভাজন শুরুর প্রাক্কালে

ক্রোমাটিন কণাগুলি সূত্রাকারে দলবদ্ধ হয়। পরে, কোষ-কেন্দ্রক পরিবেষ্টনকারী পাতলা ঝিল্লীগুলি যেন দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং একই সঙ্গে কেন্দ্রকের বাইরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র বস্তু দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ফ্লেমিং বস্তুটির নামকরণ করেন "এ্যাস্টার" (aster) [গ্রীক শব্দের অর্থ—তারকা] কারণ, এর থেকে চতুর্দিকে সূত্রাকৃতি বস্তুসমূহ বার হয়ে ঠিক তারার মতোই এ'টি দেখতে হয়।



মাইটোসিস্ প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজন

বিভাজনের পর এ্যাস্টারের দুই অংশ কোষের দুই বিপরীত প্রান্তে উপস্থিত হয়। দৃশ্যতঃ, এ্যাস্টারদ্বয়ের প্রলম্বিত সূত্রগুলির সঙ্গে কোষের কেন্দ্রস্থলে ইতিমধ্যে সারিবদ্ধ সূত্রাকৃতি ক্রোমাটিনগুলি জড়িয়ে যায় এবং এক প্রান্তের এ্যাস্টারের টানে অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমাটিন কোষের সেই প্রান্তে উপস্থিত হয়। বাকী অর্ধেক অনুরূপভাবে কোষের অপর প্রান্তে উপনীত হয়। ফলে কোষটি মধ্যখানে সঙ্কুচিত হয় এবং দুইটি কোষে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক কোষে একটি

করে কোষ-কেন্দ্রকের সৃষ্টি হয় এবং কেন্দ্রকের ঝিল্লী পরিবেষ্টিত ক্রোমাটিন বস্তুটি আবার বহুধা হয়ে কণাময় রূপ ধারণ করে।

কোষ বিভাজনে প্রক্রিয়ায় ক্রোমাটিন সূত্রগুলির মুখ্য ভূমিকার জন্য ফ্লেমিং সুতার গ্রীক শব্দের অনুসরণে এই প্রক্রিয়ার নাম দেন মাইটোসিস (mitosis)। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, জার্মান শারীরস্থানবিদ্ ভিলহেল্‌ম্ ভন্ ভ্যাল্‌ডেয়ার ক্রোমাটিন সূত্রগুলির নামকরণ করেন ক্রোমোজোম (chromosome) ঐ নামটিই আজো স্থায়ী। এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, ক্রোমোজোম (ক্রোমা = বর্ণ) নাম হওয়া সত্ত্বেও এগুলি স্বাভাবিক অরঞ্জিত অবস্থায় বর্ণহীন।

রঞ্জিত কোষগুলির ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়েছে যে, প্রাণী এবং উদ্ভিদের প্রত্যেক প্রজাতির কোষগুলি বিশেষ ও নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজম সমন্বিত। মাইটোসিস্-প্রক্রিয়ায় কোষ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পুর্বে ক্রোমোজোমের সংখ্যা দ্বিগুণিত হয়, ফলে উৎপাদিত দুইটি উত্তর-কোষের (daughter cells) প্রত্যেকটিতে বিভাজনের পর, উৎপন্নকারী পূর্ব-কোষের (mother cells) সমান সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, বেলজিয়ামবাসী ভ্রূণবিদ্যাবিশারদ্ এডওআর্ড ভ্যান বেনিডেন্ আবিষ্কার করেন যে, ডিম্ব অথবা শুক্রকোষ উৎপন্ন হবার কালে ক্রোমোজোমের সংখ্যা দ্বিগুণিত হয় না। ফলে প্রত্যেক ডিম্ব ও শুক্রকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা জীবের সাধারণ কোষস্থিত ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক। (যে কোষ বিভাজনের ফলে ডিম্ব ও শুক্র কোষের উৎপত্তি, তাকে বলা হয় "মায়োসিস্" (meiosis : যার গ্রীক শব্দগত অর্থ—কম করা)। যখন একটি ডিম্বকোষ এবং একটি শুক্রকোষ মিলিত হয় তখন মিলিত কোষটিতে (নিষিক্ত ডিম্বাণু) সম্পূর্ণ সংখ্যক ক্রোমোজোম উপস্থিত থাকে ; যার অর্ধেক ডিম্বকোষ (মাতার মাধ্যমে) এবং বাকী অর্ধেক শুক্রকোষ (পিতার মাধ্যমে) থেকে আসে। নিষিক্ত ডিম্ব পুর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে যখন জীবদেহ গঠিত হয় তখন সাধারণ মাইটোসিস্ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ সংখ্যক ক্রোমোজোম দেহের প্রতিটি কোষে বজায় থাকে।

॥ জীন (Gene) ॥

এই সময় একজন অষ্ট্রিয়ান সন্ন্যাসী গ্রেগর জোহান্ মেণ্ডেল, যিনি মঠের কর্তব্য সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকায় কোষ-বিভাজন ব্যাপারে জীববিদ্যাবিদ্‌দের

উত্তেজনার কোনোই খবর রাখতেন না, তিনি নির্জনে নিজের বাগানে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে উত্তরকালে ক্রোমোজোমের রহস্য স্পষ্টতর ভাবে বোধগম্য হয়েছিল। সাধু ছিলেন সখের উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্ এবং বিভিন্ন বিশেষত্ব সমন্বিত মটর উদ্ভিদের পরপ্রজনন (cross-breeding) সম্বন্ধে তিনি বিশেষ উৎসাহিত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন রঙের বীজ (সবুজ অথবা হলুদ রঙের) মসৃণ ও কুঞ্চিত বীজ, অথবা দীর্ঘ ও হ্রস্ব কাণ্ড সমন্বিত উদ্ভিদের মধ্যে—পরপ্রজনন কার্য সম্পাদন করে পরবর্তী জনিগুলিতে (generation) তার ফলাফল লক্ষ্য করতেন। মেণ্ডেল তাঁর পরীক্ষার ফলাফলের একটি সতর্ক পরিসাংখ্যিক বিবরণী রাখতেন, যার থেকে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি মুখ্যতঃ নিম্নলিখিত ভাবে সংক্ষেপিত করা যেতে পারে।

(১) বিশেষত্বগুলির প্রত্যেকটির 'নিয়ামক' (factor) নির্দিষ্ট, যা (মেণ্ডেল কৃত পরীক্ষা কার্যে) দুই রকমের মধ্যে যে কোনোও এক রকমের হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, বীজের রঙ নিধারণের কোনোও এক 'নিয়ামকে' বীজ সবুজ রঙের হয়, অন্য 'নিয়ামকে' বীজের রঙ হয় হল্‌দে। সুবিধার্থে, আমরা বর্তমান প্রচলিত পরিভাষা ব্যবহার করব। 'নিয়ামকগুলিকে' বর্তমানে জীন্‌স্ নামে অভিহিত করা হয়, যার গ্রীক শব্দগত অর্থ "জন্মদান করা" এবং একটি নির্দিষ্ট বিশেষত্ব নিয়ন্ত্রণকারী দুইটি বিভিন্ন ধরনের জীনকে বলা হয় "এ্যালীল্‌স্" (alleles)। সুতরাং (মেণ্ডেলের পরীক্ষায়) বীজের রঙ নিয়ন্ত্রণকারী জীনের দুইটি এ্যালীল ছিল—একটি সবুজ রঙের বীজের, অপরটি হল্‌দে রঙের বীজের।

(২) প্রত্যেক উদ্ভিদে প্রতিটি বিশেষত্ব প্রকাশের জন্য একজোড়া জীন্ থাকে, যা পিতামাতা প্রত্যেকে একটি করে দান করে। উদ্ভিদে যে একজোড়া জীন্ থাকে তার মাত্র একটি জনন কোষে (germ cell, ডিম্ব অথবা শুক্র কোষ) সঞ্চারিত হয়। সুতরাং পরাগসংযোগ (pollination) প্রক্রিয়ায় দুইটি উদ্ভিদের জনন-কোষ মিলিত হলে যে উদ্ভিদের জন্ম হয় তাতে পুনরায় বিশেষত্ব প্রকাশক দুইটি জীনের অস্তিত্ব দেখা যায়। এই জীন্ দু'টি হয় অভিন্ন না হয় এ্যালীল্‌স্ (বিভিন্ন ধরনের, যেমন একটি সবুজ, অপরটি হল্‌দে রঙ প্রকাশক)।

(৩) যখন জন্মদাতা উদ্ভিদদ্বয় একটি বিশেষ জীনের এ্যালীলগুলি উৎপন্ন উদ্ভিদে সঞ্চারিত করে, তখন একটি এ্যালীল অপরটির ফলাফলকে অতিক্রম

করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, হল্‌দে বীজ উৎপাদনকারী উদ্ভিদের সঙ্গে সবুজ বীজ উৎপাদনকারী উদ্ভিদের পরাপ্রজননের ফলে পরবর্তী জনির সমস্ত উদ্ভিদই হল্‌দে বীজ উৎপাদনকারী হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বীজের রঙ নিয়ন্ত্রণকারী জীনের হল্‌দে এ্যালীল্‌কে বলা হয় 'প্রকট' (dominant) এবং সবুজ এ্যালীল্‌কে বলা হয় 'প্রচ্ছন্ন' (recessive)।

(৪) যাই হোক্ না কেন, 'প্রচ্ছন্ন' এ্যালীল্ কিন্তু বিনষ্ট হয় না। উপরে প্রদত্ত উদাহরণের সবুজ এ্যালীলের কার্যকারিতা অপ্রকাশ থাকলেও তার উপস্থিতি বর্তমান। প্রত্যেকটিই দুইটি মিশ্র জীন্ অর্থাৎ প্রত্যেকটিতে (একটি সবুজ, অপরটি হলদে রঙের) এ্যালিল সমন্বিত এমন দুইটি সবুজ এ্যালীলের উপস্থিতি সম্ভব ; সেক্ষেত্রে, উক্ত নিষিক্ত ডিম্বাণু উৎপাদিত উদ্ভিদগুলি বংশানুক্রমে সবুজ বীজ উৎপাদন করবে। প্রত্যেকে একটি হল্‌দে এবং একটি সবুজ এ্যালীল সমন্বিত, এমন দুইটি উদ্ভিদের প্রজননের ফলে চার রকমের এ্যালীল্ সমবায় সম্ভব বলে মেণ্ডেল নির্দেশ করেন—(ক) প্রথম উদ্ভিদের হল্‌দে এ্যালীল্ দ্বিতীয়টির হল্‌দে এ্যালীলের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারে (খ) প্রথমটির হল্‌দে এ্যালীল্ দ্বিতীয়টির সবুজ এ্যালীলের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারে (গ) প্রথমটির সবুজ এ্যালীল দ্বিতীয়টির হল্‌দে এ্যালীলের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারে এবং (ঘ) প্রথমটির সবুজ এ্যালীল্ দ্বিতীয়টির সবুজ এ্যালীলের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারে। এই চারটি সমবায়ের মধ্যে কেবলমাত্র কোষের (ঘ) সমবায় উৎপাদিত উদ্ভিদই সবুজ বীজ উৎপাদন করবে। যদি ধরা যায়, এই চার ধরনের সমবায়ই সমানভাবে সম্ভব, তা'হলে উৎপাদিত নতুন জনির উদ্ভিদের এক চতুর্থাংশ সবুজ বীজ উৎপাদন করবে। মেণ্ডেল লক্ষ্য করেন, বাস্তবেও তাই হয়ে থাকে।

(৫) মেণ্ডেল আরও লক্ষ্য করেন যে, বিভিন্ন ধরনের বিশেষত্বগুলি—যেমন বীজের রঙ এবং ফুলের রঙ পরস্পর নিরপেক্ষভাবে বংশানুসৃত হয়। তার মানে লাল ফুলের হল্‌দে বীজ যেমনই সম্ভব, তেমনই সম্ভব লাল ফুলের সবুজ বীজ। সাদা রঙের ফুলের ক্ষেত্রেই একই ব্যাপার সত্য।

১৮৬০ সালের গোড়ার দিকে, মেণ্ডেল এই পরীক্ষাগুলি করে সযত্নে তা লিপিবদ্ধ করেন, এবং তার একটি নকল সুইজারল্যাণ্ডবাসী বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্ কার্ল-উইলহেল্ম্ ফন নায়জেলিকে পাঠিয়ে দেন। ফন্ নায়জেলির প্রতিক্রিয়া হল নেতিবাচক। আপাতদৃষ্টিতে একটি সর্ব তথ্যপরিবেষ্টনকারী

তত্ত্বের প্রতি ফন্ নায়জেলির প্রবণতা ছিল (তাঁর নিজের তত্ত্বীয় কার্য ছিল অর্ধ-অতীন্দ্রিয়গত এবং শব্দাড়ম্বরময়) এবং সত্যে উপস্থিতির উপায় হিসাবে মাত্র মটর উদ্ভিদ গণনায় তিনি কোনোও কৃতিত্ব দেখতে পেলেন না। উপরন্তু মেণ্ডেল ছিলেন একজন অজ্ঞাত সখের উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্।

মনে হয় ফন্ নায়জেলির মন্তব্যে মেণ্ডেল নিরুৎসাহ হন, কারণ তিনি তাঁর গবেষণাকার্য পরিত্যাগ করে মঠের কর্তব্যে মনোনিবেশ করেন এবং মোটা হতে শুরু করেন (এত মোটা যে ঝুঁকে বাগানে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না)। যাই হোক, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি অষ্ট্রিয়ার এক প্রাদেশিক পত্রিকায় নিজের গবেষণার বিবরণী প্রকাশ করেন, যা পরবর্তী এক পুরুষে কোনোই মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়নি।

কিন্তু অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের অজ্ঞাতে মেণ্ডেল যে সিদ্ধান্তে আগেই পৌছে-ছিলেন, তাঁরা ধীরে ধীরে সেই একই সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। যে পথটি ধরে তাঁরা সুপ্রজনন বিদ্যার (Genetics) প্রতি আকৃষ্ট হন তা হচ্ছে 'পরিব্যক্তির' (mutation) অর্থাৎ অস্বাভাবিক প্রাণী বা "দানব"—যা বরাবরই কুলক্ষণ বলে পরিগণিত হত, তারই পর্যালোচনা করে। (ইংরেজীতে monster বা দানব কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ থেকে, যার অর্থ সাবধানবাণী)। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে সেথ্ রাইট্ নামে ম্যাসাচুসেট্সের এক কৃষিজীবি, তাঁর মেষের পালে এক আকস্মিক আবির্ভাবকে বাস্তব ব্যবহারে প্রয়োগ করেন। একটি মেষশাবক জন্মেছিল, যার পাগুলি ছিল অস্বাভাবিক ছোট। সেই চতুর ইয়াঙ্কি বুঝলেন যে, হ্রস্বপদ মেষের পক্ষে তাঁর খামারের চতুর্দিকের নিচু পাথরের প্রাচীর পার হওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং সেই সৌভাগ্যক্রমেই আকস্মিকভাবে জাত হ্রস্বপদ মেষের ধারায় তিনি সুপরিকল্পিত প্রজনন কার্য চালালেন।

এই বাস্তব প্রয়োগের দৃষ্টান্তে, অন্যান্যেরাও প্রয়োজনীয় পরিব্যক্তির সন্ধান শুরু করলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মার্কিন উদ্যানবিদ লুথার বারব্যাঙ্ক নতুন ধরনের উদ্ভিদ প্রজননের পেশায় সাফল্যলাভ করেন, যেগুলি পুরাণো উদ্ভিদগুলির তুলনায় কোনো না কোনো বিষয়ে উৎকৃষ্টতর ছিল।

ইতিমধ্যে উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্‌রা পরিব্যক্তির কারণ অনুসন্ধানে সচেষ্ট ছিলেন, এবং এক পুরুষ পূর্বে মেণ্ডেল যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন, বিজ্ঞানের ইতিহাসের এক অত্যাশ্চর্য সমপাতনে অন্ততঃ তিন জন বিভিন্ন ব্যক্তি পরস্পর

নিরপেক্ষভাবে সেই একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেন। এই তিন জন হলেন— হল্যাণ্ডের হিউগো ডি ভ্রাইস্, জার্মানীর কার্ল এরিখ করেণস্ এবং অষ্ট্রিয়ার এরিখ ফন্ শেরম্যাক্। তাঁদের কেউই অপরের, অথবা মেণ্ডেলের কাজের কথা জানতেন না। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে, তিন জনেই নিজেদের কার্যাবলী প্রকাশের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিন জনেই এই ব্যাপারে পূর্ববর্তী গবেষণাপত্রগুলি শেষবারের মতো পরীক্ষা করতে গিয়ে সবিস্ময়ে মেণ্ডেলের প্রকাশিত বিবরণীর সন্ধান পেলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে, তিন জনেই মেণ্ডেলের প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করে, তাঁকেই আবিষ্কারকের সম্পূর্ণ কৃতিত্বটুকু অর্পণ করে নিজেদের গবেষণাকে তাঁরই সমর্থনে প্রকাশ করলেন।

কিছু সংখ্যক জীববিদ্যাবিদ্ সঙ্গে সঙ্গেই মেণ্ডেলের জীন্ এবং অণুবীক্ষণে দেখা ক্রোমোজোমের মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করলেন। এই সাদৃশ্যের দিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মার্কিন কোষবিদ্যাবিদ্ ডব্লিউ. এস্. সাটন্। ক্রোমো-জোমও যে জীন্গুলির মতো জোড়ায় উৎপন্ন হয় (যার একটি পিতা ও অপরটি মাতার জননকোষ থেকে আসে) সে বিষয়ে তিনিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু এই সাদৃশ্য নির্দেশে প্রধান অসুবিধা ছিল এই যে, যে কোনো জীবেরা বংশানুসৃত বিশেষত্বগুলির সংখ্যা অপেক্ষা কোষমধ্যস্থ ক্রোমোজোমের সংখ্যা স্বল্পতর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মানুষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাত্র ২৩ জোড়া। (বহুকাল ধরে জীববিদ্যাবিদ্দের ধারণা ছিল মনুষ্যকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ২৪ জোড়া; কিন্তু ১৯৫৭ সালে, এক নতুন ধরনের অণুবীক্ষণের সাহায্যে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, মানব-কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ২৩ জোড়া। বিভাজন চলা-কালে গৃহীত মনুষ্য-কোষের ক্রোমোজোমের আলোকচিত্র যাঁরা দেখেছেন তাঁরা এই গণন প্রমাদের কারণ সহজেই বুঝবেন, ক্রোমোজোমগুলি পাকানো হ্রস্ব নাড়ীভুঁড়ি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমির মতো দেখতে)। যেহেতু মানুষের ক্ষেত্রে বংশগতির বিশেষত্বগুলির সংখ্যা বহু সহস্র, জীববিদ্যাবিদ্রা সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হলেন যে, ক্রোমোজোমগুলি জীন্ নয়। প্রত্যেকটি ক্রোমোজোম নিশ্চয়ই বহু জীনের সমষ্টি।

শীঘ্রই জীববিদ্যাবিদ্রা নির্দিষ্ট জীনের পর্যালোচনা করার এক চমৎকার অস্ত্র আবিষ্কার করলেন। এটি কোনোও বস্তুনির্মিত যন্ত্র নয়, এক নতুন ধরনের গবেষণাগারের প্রাণীমাত্র। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যাবিদ্

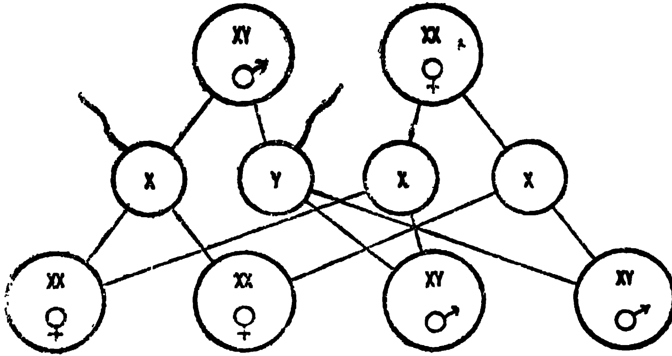
টমাস্ হাণ্ট মর্গান সুপ্রজনন বিদ্যার গবেষণা কাজে ফলের মক্ষিকা (Drosophila melanogaster) ব্যবহারের কথা চিন্তা করেন। এই সময়েই ইংরেজ জীববিজ্ঞাবিদ্ উইলিয়াম বেট্‌সন সুপ্রজননবিদ্যা (Genetics) এই পরিভাষাটি উদ্ভাবন করেন।

জীনের বংশগতি পর্যালোচনায় মটর উদ্ভিদ অপেক্ষা (অথবা গবেষণাগারে ব্যবহৃত যে কোনোও প্রাণী অপেক্ষা) ফলের মক্ষিকা ব্যবহারে সুবিধা বেশি। স্বল্পসময়ে এগুলির জনন হয় প্রচুর সংখ্যায়, কম খাদ্য ব্যবহারে শতাধিক মাছির চাষ করা যায়, বংশানুসৃত বিশেষত্বগুলি সংখ্যায় বহু ও সেগুলির পর্যবেক্ষণ সহজসাধ্য এবং ক্রোমোজোম বিন্যাস অপেক্ষাকৃত সরল, প্রত্যেক কোষে মাত্র চার জোড়া ক্রোমোজোম থাকে।

এই মক্ষিকার সাহায্যে মর্গান এবং তাঁর সহকর্মীরা যৌন-বংশানুসৃতির রহস্য সম্বন্ধে একটি প্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, স্ত্রী মক্ষিকার চার জোড়া ক্রোমোজোমের—প্রতি জোড়ার একটি অপরটির নিখুঁত অনুকৃতি, যার ফলে ডিম্বকোষে সঞ্চারিত চারটি ক্রোমোজোমের প্রত্যেকটি, মূল ক্রোমোজোমগুলির এক একটির অনুরূপ। কিন্তু পুরুষ মক্ষিকার চার জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে এক জোড়ায় একটি স্বাভাবিক ক্রোমোজোম থাকে, যাকে বলা হয় "x-ক্রোমোজোম", অপরটি কিঞ্চিৎ খর্ব হয়, যার নাম "y-ক্রোমোজোম"। সুতরাং যখন শুক্রাণুর জন্ম হয় তখন শুক্রকোষে অর্ধেক সংখ্যক x-ক্রোমোজোম, ও অপর অর্ধেকে y-ক্রোমোজোম থাকে। যখন x-ক্রোমোজোম সমন্বিত কোনো শুক্রকোষ ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন চার জোড়া এই আকৃতির ক্রোমোজোম সমন্বিত নিষিক্ত ডিম্বাণু স্বভাবতঃই স্ত্রী-মাছির জন্ম দেয়। অপর পক্ষে y-ক্রোমোজোম বিশিষ্ট শুক্রকোষের সঙ্গে ডিম্বকোষের মিলনের ফলে পুরুষ মাছির জন্ম হয়। যেহেতু উপরোক্ত উভয় ব্যাপারই সমান হারে ঘটতে পারে, সেই হেতু, যে কোনো জীবিত প্রাণীর নির্দিষ্ট প্রজাতিতে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা মোটামুটি সমানুপাতিক। (কোনো কোনো প্রাণীতে, বিশেষ করে বিভিন্ন পাখীদের বেলায়, স্ত্রী প্রাণীতে y-ক্রোমোজোমের উপস্থিতি দেখা যায়)।

কোনোও কোনোও পরিব্যক্তি অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা শুধুমাত্র পুরুষ প্রাণীতেই কেন হয় তার কারণ খুঁজে পাওয়া গেল এই ক্রোমোজোম ঘটিত পার্থক্যে। যদি এক জোড়া x-ক্রোমোজোমের একটিতে কিছু ত্রুটি থাকে, অপরটি তথাপিও

স্বাভাবিক হতে পারে, যার ফলে পরিস্থিতির অবনতি রোধ করে। কিন্তু পুরুষ প্রাণীর ক্রোমোজোমের সঙ্গে জোটবদ্ধ x-ক্রোমোজোমে কোনো ত্রুটি



x ও y-ক্রোমোজোম দুইটির বিভিন্ন সম্মিলন

থাকলে তার সাধারণতঃ ক্ষতিপূরণ হয় না, কারণ y-ক্রোমোজোমে জীনের সংখ্যা কম। সুতরাং ত্রুটির বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

ফলের মক্ষিকার গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, মেণ্ডেলের অনুমিত "বিশেষত্বগুলি পরস্পর নিরপেক্ষভাবে বংশানুসৃত হয়"—সবক্ষেত্রে সত্য নয়। মটর উদ্ভিদের যে সাতটি বিশেষত্ব মেণ্ডেল পর্যালোচনা করেছিলেন ঘটনাচক্রে সেগুলি যে জীন্‌গুলিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত—তাদের অবস্থান ছিল বিভিন্ন ক্রোমোজোমে। মর্গান লক্ষ্য করলেন দু'টি বিভিন্ন বিশেষত্ব নিয়ন্ত্রণকারী দুটি বিভিন্ন জীনের অবস্থান একই ক্রোমোজোমে হলে তাদের বংশানুসৃতি একত্রেই হয় (ঠিক যেমন একই গাড়ীতে দুজন ভ্রমণকারীর একজন সামনের আসনে, অপরে পিছনের আসনে বসেও একই সঙ্গে ভ্রমণ করে)।

অবশ্য এই প্রজননগত সংযুক্তি (genetic linkage) অপরিবর্তনীয় নয়। ঠিক যেমন কোনো যাত্রী গাড়ী বদল করতে পারে, সেইরকম একখণ্ড ক্রোমোজোম অন্য কোনো ক্রোমোজোম খণ্ডের সংগে স্থান পরিবর্তন করতে পারে। কোষ-বিভাজনের সময়ে এই ধরনের ক্রোমোজোম বিনিময় (crossing over) ঘটতে পারে। ফলে পরস্পর সংযুক্ত বিশেষত্বগুলি পৃথক হয়ে আবার নতুন ধরনের সংযুক্তিতে আবদ্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ, উজ্জ্বল রক্তবর্ণ চক্ষু এবং কুঞ্চিত ডানা বিশিষ্ট এক ধরনের ফলের মক্ষিকা আছে।

যখন এগুলির, শ্বেত চক্ষু ও হ্রস্ব ডানা বিশিষ্ট মক্ষিকার সঙ্গে প্রজনন করা হয়, তখন সাধারণতঃ দু'ধরনের সন্ততি পাওয়া যাবে—(ক) উজ্জ্বল রক্তবর্ণ চক্ষু ও কুঞ্চিত ডানা বিশিষ্ট, অথবা (খ) শ্বেত চক্ষু ও হ্রস্ব ডানা বিশিষ্ট। কিন্তু ক্রোমোজোম বিনিময়ের ফলে, কখনো কখনো প্রজননে—শ্বেতচক্ষু-কুঞ্চিত ডানার মক্ষিকা অথবা, উজ্জ্বল রক্তবর্ণ চক্ষু ও হ্রস্ব ডানার মক্ষিকা পাওয়া যায়। এই নতুন ধরনের মক্ষিকাগুলি পরবর্তী জনিগুলিতেও বজায় থাকবে, যদি না আর একবার ক্রোমোজোম বিনিময় সংঘটিত হয়।

একটি ক্রোমোজোম কল্পনা করা যাক্, যার একপ্রান্তে আছে রক্তচক্ষুর জীন্ এবং অপরপ্রান্তে আছে কুঞ্চিত ডানার জীন। ধরা যাক্, ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্যের মধ্যখানে পরস্পর সংলগ্ন আরও দু'টি জীন্ আছে, সে দু'টি পৃথক দু'টি বিশেষত্ব



ক্রোমোজোমগুলির মধ্যে বিনিময় (crossing over)

নিয়ন্ত্রণ করে। এইরূপ ক্ষেত্রে অবধারিত যে, বহু বিন্দু বিশিষ্ট ক্রোমোজোম কোনো এক বিশেষ বিন্দুতে যদি ছিন্ন হয় তাহলে পরস্পর সংলগ্ন জীন্ দুটি অপেক্ষা ভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত জীন্ দুটির পৃথক হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। ক্রোমোজোম বিনিময়ের ফলে কোনোও নির্দিষ্ট সংযুক্ত বিশেষত্বদ্বয়ের পৃথক্-ভবনের পৌনঃপুন্যের হার লক্ষ্য করে মর্গান এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট জীন্ দুটির আপেক্ষিক অবস্থান নির্ধারণ করতে সক্ষম হলেন এবং এই উপায়ে ফলের মক্ষিকার জীনগুলির অবস্থিতিজ্ঞাপক ক্রোমোজোমের তিনি "মানচিত্র" রচনা করেন।

ফলের মক্ষিকার উপর সুপ্রজনন বিদ্যার গবেষণা কার্যের জন্য, ১৯৩৩ সালে, মর্গান ভেষজ তত্ত্ব ও শারীর বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

মাঝে মাঝে গণনযোগ্য পৌনঃপুন্যে—জীনে হঠাৎ পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিব্যক্তির ফলে নতুন এবং অপ্রত্যাশিত দৈহিক বিশেষত্বের প্রকাশ হয়—

যেমন কৃষিজীবি রাইটের হ্রস্বপদ মেষের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। প্রকৃতিতে পরিব্যক্তি অতি বিরল ঘটনা। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে, মর্গানের গবেষণাকারী দলের অন্যতম সুপ্রজনন-বিদ্যাবিদ্ হারমান্ জোসেফ্ মূলার ফলের মক্ষিকায় কৃত্রিম উপায়ে পরিব্যক্তির হার বাড়াবার উপায় আবিষ্কার করেন, যার ফলে এইসব পরিবর্তনের বংশগতি পর্যালোচনা সহজতর হ'ল। তিনি লক্ষ্য করেন, রঞ্জন রশ্মি (x-rays) দ্বারা এই অঘটন ঘটান যায়; সম্ভবতঃ এর ফলে জীন্‌গুলির ক্ষতি হয়। মূলারের আবিষ্কার, যার ফলে পরিব্যক্তির পর্যালোচনা সম্ভব হয়ে ওঠে, তার জন্য ১৯৪৬ সালে তাঁকে ভেষজতত্ত্ব ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দান করা হয়।

মূলারের গবেষণার ফলে মানব প্রজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু অস্বস্তিকর আশংকা দেখা দিয়েছে। অভিব্যক্তির অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ চালকশক্তিরূপে পরিব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন, কারণ এর ফলে সময় সময় উন্নততর প্রজাতির সৃষ্টি হয়, যার পারিপার্শ্বিক অভিযোজন ক্ষমতা উন্নততর; কিন্তু তা সত্ত্বেও মঙ্গলময় পরিব্যক্তি ব্যতিক্রম মাত্র। অধিকাংশ পরিব্যক্তিই—অন্ততঃ শতকরা ৯৯ ভাগ ক্ষতিকারক, এমন কি কোনো কোনোটি মারাত্মকও। যেগুলি অতি অল্প মাত্রায় ক্ষতিকারক সেগুলিও কালক্রমে লয়প্রাপ্ত হয়; পরিব্যক্তি পীড়িত প্রাণী স্বাভাবিক প্রাণীর মতো সুস্থ নয় এবং তাদের তুলনায় স্বল্পতর সন্তান-সন্ততির জন্ম দেয়। কিন্তু মধ্যবর্তী কালে, পরিব্যক্তি কয়েক জনি ধরে অসুস্থতা ও ক্লেশভোগের সৃষ্টি করে। উপরন্তু, ক্রমাগতই নতুন পরিব্যক্তির ক্রমানুসারে সৃষ্ট হয়ে চলে এবং প্রত্যেক প্রজাতি দোষগ্রস্ত জীন্‌সমূহের একটি নিয়মিত দায় ভার বহন করে।

মূলার এবং অন্যান্য সুপ্রজনন-বিদ্যাবিদ্‌রা মনুষ্য প্রজাতি বাহিত পরিব্যক্তির ক্রমবর্ধমান ভার সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তান্বিত ছিলেন। আধুনিক ঘটনায় এই ভার ক্রমবর্ধমান ভাবে যুক্ত হয়ে চলেছে বলে মনে হয়। প্রথমতঃ ভেষজবিদ্যার অগ্রগতি এবং সামাজিক যত্ন ক্ষতিকারক পরিব্যক্তি-পীড়িত মানুষের কিছুটা ক্ষতিপূরণ করেছে, অন্ততঃ জনন ক্ষমতা সম্বন্ধে ত বটেই। ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তিদের জন্য বর্তমানে চশমা মেলে এবং যাঁরা মধুমেহ (diabetes) রোগে কষ্ট পান (এ রোগটি বংশানুক্রমিক) তাঁদের জীবনরক্ষার জন্য আছে ইন্‌সুলিন্ (insulin) এবং এই রকম আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এইভাবে তাদের ক্রটিযুক্ত জীন্ পরবর্তী পুরুষে সঞ্চারিত হয়। এর বিকল্প

ব্যবস্থা—পীড়িত ব্যক্তিদের তরুণ অবস্থায় মরতে দেওয়া অথবা জনন ক্ষমতা নষ্ট করা অথবা কারারুদ্ধ করে রাখা—অবশ্য অচিন্ত্যনীয়; কেবলমাত্র যখন পীড়া এমন সাংঘাতিক হয় যে, কোনো ব্যক্তি জড়বুদ্ধি অথবা উন্মাদ হত্যাকারীতে (homicidal paranoia) পর্যবসিত হয় তখনই তার ব্যতিক্রম ঘটে। নিঃসন্দেহে মানুষ তার মানবিক প্রবণতা সত্ত্বেও এখনও নেতিমূলক পরিব্যক্ত জীনের ভার বহনে সক্ষম।

কিন্তু দ্বিতীয় আধুনিক বিপর্যয় অর্থাৎ অনাবশ্যক বিকীরণের প্রয়োগ তথা উপরোক্ত ভারবৃদ্ধির সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ সামান্যই। সুপ্রজনন বিদ্যা এ কথা অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণ করেছে যে, বিকীরণের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনার সামান্যতম বৃদ্ধির অর্থ জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যক্তির হার সেই অনুপাতে বৃদ্ধি এবং ১৮৯৫ সাল থেকে মানবজাতি যে ধরনের এবং যত তীব্র বিকীরণের অধীন হয়েছে পুর্ববর্তী পুরুষে তা অজানা ছিল। সৌর বিকীরণ, ভূমির স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা এবং মহাজাগতিক রশ্মির (Cosmic ray) অস্তিত্ব আমাদের মধ্যে সর্বদাই বর্তমান। বর্তমানে আমরা আবার ভেষজে ও দন্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে যথেচ্ছ রঞ্জনরশ্মি ব্যবহার করি, তেজস্ক্রিয় বস্তু প্রয়োগ করি, ভয়াবহ তেজস্ক্রিয় মাত্রায় কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (isotope) তৈরী করি এবং এমন কি পারমাণবিক বোমাও বিস্ফোরিত করি। এ সব কিছুর ফলেই পারিপার্শ্বিকের তেজস্ক্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অবশ্য এ কথা কেউই বলবেন না যে, কেন্দ্রীণ-পদার্থবিদ্যার (nuclear physics) গবেষণাকার্য বন্ধ করা হোক অথবা ডাক্তার কিংবা দন্ত চিকিৎসক কর্তৃক রঞ্জনরশ্মি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হোক। কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে এ সুপারিশ করা হয়েছে যে, এই বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং বিকীরণের সংস্পর্শ স্বল্পতম হওয়া উচিত, যেমন—রঞ্জন-রশ্মির সতর্ক ও সুচিন্তিত ব্যবহার এবং ব্যবহার কালে জনন-যন্ত্রগুলি আবশ্যিকভাবে আচ্ছাদন করা কর্তব্য। আরো একটা সতর্কতামূলক সুপারিশ করা হয়েছে যে. প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য রঞ্জন-রশ্মি সংস্পর্শের সমগ্র পুঞ্জীভবনের হিসাব রাখা, যাতে যুক্তিসঙ্গত সীমা লংঘনে সে বিপদগ্রস্ত কি না সে সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

অবশ্য উদ্ভিদ এবং পতঙ্গাদির উপর পরিচালিত পরীক্ষা-প্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলি মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে কি না সে বিষয়ে সুপ্রজনন-বিদ্যাবিদ্‌রা

নিশ্চিত ছিলেন না। যাই হোক না কেন, মানুষ উদ্ভিদ নয়, ফলের মাছিও নয়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষত্বের প্রত্যক্ষ পর্যালোচনায় জানা গেল যে, মানব-প্রজনন বিদ্যাও একই নিয়মগুলি অনুসরণ করে। এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পরিজ্ঞাত উদাহরণ হচ্ছে রক্তশ্রেণীর বংশগতি।

রক্ত সঞ্চালন (blood transfusion) একটি অতি পুরাতন প্রথা এবং প্রাচীনকালে চিকিৎসকেরা মাঝে মাঝে রক্ত মোক্ষণে দুর্বল ব্যক্তির দেহে, এমন কি প্রাণী-রক্ত সঞ্চালনেরও চেষ্টা করতেন। কিন্তু মানব-রক্ত সঞ্চালনও সময় সময় কুফল প্রসব করত, যার জন্য কোনো কোনো সময় আইন করে রক্ত-সঞ্চালন কার্য নিষেধ করা হয়েছিল। অবশেষে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ান্ রোগ-বিদ্যাবিদ্ কার্ল ল্যাণ্ডস্টিনার আবিষ্কার করেন যে, মানবরক্ত কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণী ভুক্ত, যার কোনো কোনোটি একে অপরের পরিপন্থী। তিনি লক্ষ্য করেন, কোনো ব্যক্তির রক্ত অপর ব্যক্তির রক্তমস্তুর (blood serum ; লোহিত কণিকা—যে বস্তু রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে, তা অপসারণ করার পর রক্তের যে জলীয় অংশ পড়ে থাকে) সঙ্গে মেশালে কখনো কখনো প্রথম ব্যক্তির রক্ত একসঙ্গে পিণ্ডাকৃতি ধারণ করে। স্পষ্টতই রক্তসঞ্চালনে এরূপ ব্যাপার ঘটা অশুভ এবং এর ফলে মুখ্য দেহযন্ত্র সমূহে রক্ত সংবহন বন্ধ হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটা সম্ভব। ল্যাণ্ডস্টিনার আরো লক্ষ্য করেন যে, কতকগুলি শ্রেণীর রক্ত মিশ্রণে রক্তের এইরূপ ক্ষতিকারক পিণ্ডাকৃতি ধারণ ঘটে না।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে, ল্যাণ্ডস্টিনার মনুষ্যরক্তের চার রকম শ্রেণী নির্ধারণের কথা ঘোষণা করতে সক্ষম হলেন। সেগুলির তিনি নামকরণ করেন A, B, AB এবং O। যে কোনো ব্যক্তির রক্তের শ্রেণী এই চারটির যে কোনো একটি মাত্র। অবশ্যই, একই শ্রেণীর রক্ত এক ব্যক্তির দেহ থেকে সেই শ্রেণীর রক্ত বিশিষ্ট অন্য ব্যক্তির দেহে সঞ্চালিত করা নিরাপদ। অধিকন্তু O শ্রেণীর রক্ত অন্য যে কোনো তিনটি শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তির দেহে নিরাপদে সঞ্চালিত করা যায় এবং AB শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট রোগীর দেহে A এবং B এই দুই শ্রেণীর রক্তই দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু AB শ্রেণীর রক্ত, A অথবা B শ্রেণীর রক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির দেহে সঞ্চালিত করলে, অথবা A ও B শ্রেণীর রক্ত মিশ্রিত করলে, অথবা O শ্রেণীর রক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির দেহে অন্য কোনো শ্রেণীর রক্ত সঞ্চালিত করলে লোহিত কোষের জমাট (agglutination) বাঁধার সম্ভাবনা।

বর্তমানে, রক্তমস্তর প্রতিক্রিয়া সম্ভাবনায় রোগীকে সাধারণতঃ তার নিজ শ্রেণীর রক্তই প্রদান করা হয়।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাণ্ডস্টিনার (যিনি ততদিনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন) ভেষজতত্ত্ব ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

সুপ্রজনন-বিদ্যাবিদ্‌রা প্রমাণ করেছেন যে, রক্তশ্রেণীসমূহের (এবং তৎপরে আবিষ্কৃত অন্যান্য শ্রেণীগুলিও, যার মধ্যে Rh প্রকরণ অন্যতম) সুনির্দিষ্টভাবে মেণ্ডেলীয় নিয়মে বংশানুস্মৃতি হয়। অনুমিত হয় A, B এবং O শ্রেণীর রক্তের জন্য তিনটি জীন্ এ্যালীল্‌স্ বর্তমান। যদি পিতামাতা উভয়েরই রক্তের শ্রেণী হয় O, তবে সন্তানদের সকলেরই রক্ত হবে O শ্রেণীর। যদি মাতা বা পিতা একজনের রক্ত হয় O শ্রেণীর এবং অপরের A শ্রেণীর, তবে সন্তানদের রক্ত হবে A শ্রেণীর, কারণ O শ্রেণীর তুলনায় A শ্রেণীর জীন্ প্রকট (dominant)। অনুরূপভাবে B এ্যালীল্, O এ্যালীলের তুলনায় প্রকট। A এ্যালীল্ এবং B এ্যালীল্ কিন্তু পরস্পরের তুলনায় কোনোটাই প্রকট নয়। কোনো ব্যক্তির যদি এই উভয় শ্রেণীর এ্যালীল দুটি থাকে তবে তার রক্তের শ্রেণী হবে AB।

রক্ত শ্রেণীবিভাগে মেণ্ডেলীয় নিয়মাবলী এমন সুনির্দিষ্টভাবে পালিত হয় যে, পিতৃত্ব নির্ধারণের ব্যাপারে এই নিয়ম কাজে লাগান যেতে পারে (এবং বাস্তবেও কাজে লাগান হয়)। যদি O শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট মায়ের B শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট সন্তান হয় তবে সেই সন্তানের পিতার রক্ত নিশ্চয়ই B শ্রেণীর—অন্যথা, সন্তানে B এ্যালীলের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। যদি সেই স্ত্রীলোকের স্বামীর রক্ত A অথবা O শ্রেণীর হয়, তবে স্পষ্টতই সে ব্যভিচারিণী (অথবা হাসপাতালে সন্তান বদল হয়েছে)। B শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট সন্তানের O শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট জননী, যদি A অথবা O শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট কোনো পুরুষকে তার সন্তানের পিতৃত্বের দায়ে অভিযুক্ত করে তবে হয় সে মিথ্যাবাদিনী, নয় সে ভ্রান্ত। অবশ্য রক্তশ্রেণীর দ্বারা নেতিবাচক প্রমাণই পাওয়া যায়, ইতিবাচক প্রমাণ কখনোই নয়। যদি উপরোক্ত উদাহরণের স্ত্রীলোকটির স্বামী অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিটি, B শ্রেণীর রক্তের অধিকারী হয় তা'হলে কিছুই প্রমাণ হয় না। যে কোনো B শ্রেণীর অথবা AB শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তিই, উপরোক্ত ক্ষেত্রে পিতা হতে পারে।

মনুষ্য বংশগতিতে মেণ্ডেলীয় নিয়মাবলীর প্রযোজ্যতা লিংগ-সংযুক্ত বিশেষত্বগুলির (sex-linked traits) অস্তিত্বের দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে। বর্ণান্ধতা (colour blindness) এবং হিমোফিলিয়া (hemophilia ; রক্ত জমাট না বাঁধার বংশগত রোগ) একমাত্র পুরুষদেরই হতে দেখা গিয়েছে এবং এগুলির বংশগতি মক্ষিকার লিংগ-সংযুক্ত বিশেষত্বগুলির বংশগতির অনুরূপ।

মনুষ্য সুপ্রজননবিদ্যা এক অতি জটিল বিষয়, অদূর ভবিষ্যতে যার সম্পূর্ণ বা সুষ্ঠু সমাধান বোধ হয় সম্ভব নয়। কারণ, (ক) মানুষের প্রজনন, মক্ষিকার মতো স্বল্প সময়ে বহু সংখ্যায় হয় না (খ) মানুষের প্রজনন, পরীক্ষার উদ্দেশ্যে গবেষণাগারের অধীনস্থ করা সম্ভব নয়, (গ) মানুষের বংশগতির বিশেষত্ব এবং ক্রোমোজোম সংখ্যা মক্ষিকার তুলনায় অনেক বেশি, (ঘ) মানুষের যে সমস্ত বিশেষত্ব সম্বন্ধে আমরা সর্বাপেক্ষা অধিক কৌতূহলী—যেমন সৃজনশীল প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা এবং নৈতিক শক্তি—এগুলি সমস্তই অতি জটিল, বহু জীনের সমষ্টিগত ক্রিয়া ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ফল। এই সকল কারণগুলির জন্যই সুপ্রজনন-বিদ্যাবিদ্‌রা -ফলের মাছির প্রজনন যে আস্থার সঙ্গে পর্যালোচনা করেন, মানুষের প্রজনন ক্ষেত্রে তা করতে সক্ষম নন।

ঠিক কি উপায়ে দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জীন্ সেই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়? কোন্ প্রক্রিয়ায় এগুলি মটর উদ্ভিদে হল্‌দে বীজের, ফলের মক্ষিকায় কুঞ্চিত ডানার এবং মানুষের নীল চক্ষুর জন্ম দেয়?

জীববিদ্যাবিদ্‌রা এখন নিশ্চিত হয়েছেন যে, উৎসেচকগুলির (enzymes) মাধ্যমে জীন্‌গুলি তাদের প্রভাব কার্যকরী করে। এ বিষয়ে সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ হচ্ছে চোখ, চুল এবং চামড়ার রঙ। চক্ষুর তারকা, চুল অথবা চর্মে উপস্থিত মেলানিন্ (melanin ; কালোর গ্রীক শব্দ হতে গৃহীত) রংগকের (pigment) পরিমাণের উপর নির্ভর করে ঐ সকল বস্তুর রঙ (নীল অথবা বাদামী, হল্‌দে অথবা কালো, গোলাপী অথবা বাদামী অথবা উভয়ের সংমিশ্রিত রঙ) কেমন হবে। টাইরোসিন্ (tyrosin) নামক এ্যামিনো এ্যাসিড (amino acid) হতে কয়েকটি পর্যায়ে (যেগুলি বর্তমানে নিরূপিত হয়েছে) মেলানিন রংগক উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ায়, বেশ কিছু সংখ্যক উৎসেচক অংশ গ্রহণ করে এবং উৎসেচকগুলির পরিমাণের উপর উৎপন্ন মেলানিনের পরিমাণ নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, প্রথম দুটি পর্যায়ে যে

উৎসেচকটি প্রভাবকের (catalyst) কাজ করে, তার নাম 'টাইরোসিনেজ' (tyrosinase)। সম্ভবতঃ এটি একটি বিশেষ জীন্, কোষগুলির দ্বারা টাইরোসিনেজের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। এই উপায়েই সেটি চর্ম, চুল এবং চক্ষুর রঙ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যেহেতু জীন্ পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয়, সন্তানেরা স্বভাবতঃই রঙের ব্যাপারে মাতাপিতার অনুরূপ হবে। যদি পরিব্যক্তির ফলে একটি দোষ যুক্ত জীনের জন্ম, হয় যেটি টাইরোসিনেস্ উৎপাদনে সক্ষম নয়, তাহলে মেলানিন্ উৎপাদন ব্যাহত হবে এবং সেই বিশেষ ব্যক্তি হবে 'ধবলগ্রস্থ' (albino)। এইভাবে একটিমাত্র উৎসেচকের অনুপস্থিতি (এবং স্বভাবতঃই একটিমাত্র জীনের অভাব) দৈহিক বিশেষত্বের বড় রকম পরিবর্তন আনার পক্ষে যথেষ্ট।

যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, জীবের বিশেষত্বগুলি উৎসেচকের পরিগঠনের উপর নির্ভরশীল—যেগুলি আবার জীন্ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তবে পরবর্তী প্রশ্ন হবে—জীন্গুলির কাজের ধারা কিরূপ? দুর্ভাগ্যক্রমে, এই ব্যাপারের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের পক্ষে ফলের মক্ষিকাও খুবই জটিল জীব। কিন্তু ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন জীববিদ্যাবিদ্ জর্জ ডব্লিউ বিড্ল্ এবং এডওয়ার্ড এল্ ট্যাটাম্ আবিষ্কার করলেন যে, এক সরল জীব এই ব্যাপার পর্যালোচনার পক্ষে চমৎকার ভাবে কার্যকরী এবং তাঁরা তার সাহায্যে পরীক্ষা শুরু করলেন। সেই জীবটি হচ্ছে গোলাপী রঙের সাধারণ পাউরুটিজাত ছত্রাক (বৈজ্ঞানিক নাম, নিউ-রোস্পোরা ক্রাসা, Neurospora Crassa)।

খাদ্যের ব্যাপারে নিউরোস্পোরার দাবী বেশি নয়। শর্করা এবং নাইট্রোজেন, গন্ধক সরবরাহকারী যৌগিক ও বিভিন্ন খনিজ সমন্বিতপদার্থসমূহে এটি উত্তম জন্মায়। শর্করা ব্যতিরেকে, 'বায়োটিন' (biotin) নামে একটি ভাইটামিনই একমাত্র জৈব পদার্থের জোগান প্রয়োজন।

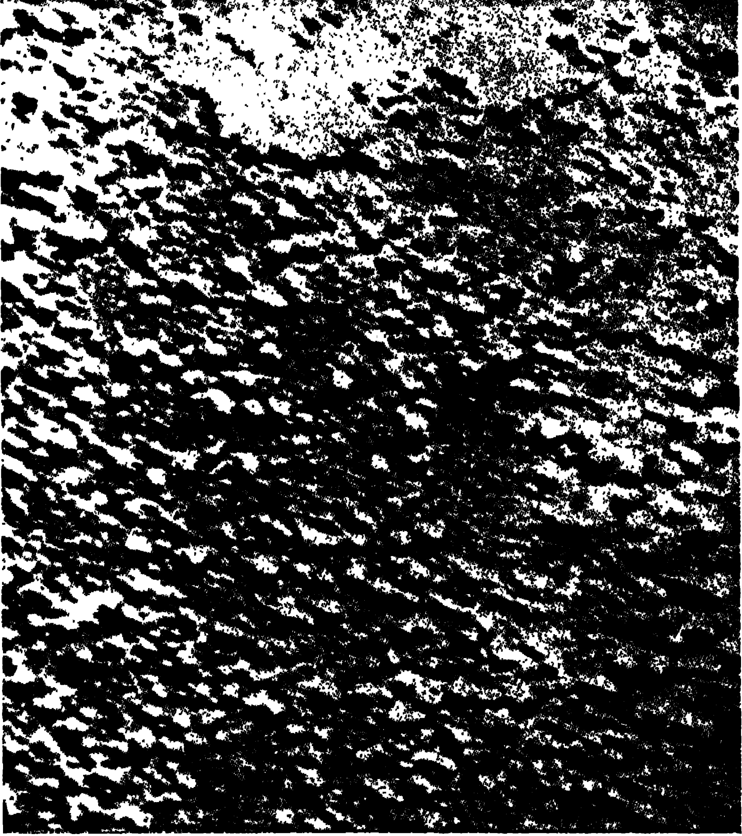
এই ছত্রাকটি তার জীবন চক্রের এক বিশেষ পর্যায়ে আটটি স্পোরের (spores) জন্ম দেয়, প্রজননমূলক পরিগঠনে সেগুলি অভিন্ন। প্রত্যেকটি স্পোরে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সাত। উচ্চতর জীবের যৌন-কোষের মতোই এর ক্রোমোজোমগুলিও এককভাবে সঞ্চারিত হয়, জোড়ায় জোড়ায় হয় না। ফলে যদি একটি ক্রোমোজোমে পরিবর্তন ঘটে, স্বাভাবিক সহযোগীটির অনুপস্থিতি হেতু পরিবর্তনের ফলাফল লক্ষ্য করা সম্ভব হয়। সুতরাং বিড্ল্ ও ট্যাট্ম্ নিউরোস্পোরা ছত্রাকে রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে পরিব্যক্তির সূচনা করে—

স্পোরগুলির ব্যবহার লক্ষ্য করে নির্দিষ্ট ফলাফল পর্যালোচনা করতে সক্ষম হলেন।

যদি একমাত্রায় বিকিরণ লাভের পরও স্পোরগুলি সচরাচর প্রয়োজনীয় পোষক রসে (nutrients) বৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয় তবে স্পষ্টতঃই অন্ততঃ জীবটির বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিগত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, কোনোরূপ পরিব্যক্তির উৎপত্তি হয়নি। সচরাচর ব্যবহৃত পোষকরসে স্পোরগুলির বৃদ্ধি ব্যাহত হলে গবেষণাকারীগণ ভাইটামিন্, এ্যামিনো এ্যাসিড এবং অন্যান্য সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় বস্তু সমন্বিত উপাদানের সাহায্যে স্পোরগুলি জীবিত না মৃত তা নির্ণয়ের ব্যবস্থা করতেন। যদি এই উপাদানে কোষগুলির বৃদ্ধি লাভ অব্যাহত থাকত তবে সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হত যে, রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগের ফলে পরিব্যক্তির সূচনা হয়েছে এবং নিউরোস্পোরার পুষ্টিগত প্রয়োজনীয়তারও বদল হয়েছে। আপাত-দৃষ্টিতে এই অবস্থায় নিউরোস্পোরার খাদ্যবস্তুতে অন্ততঃ একটি নতুন বস্তুর প্রয়োজন। সেই বস্তুটি যে কি, তা নির্ণয়ের জন্য গবেষকগণ স্পোরগুলিতে বিভিন্ন পোষকরস সরবরাহ করতেন, যার প্রত্যেকটিতে এক একটি খাদ্যবস্তুর অভাব থাকত। হয়ত সমস্ত এ্যামিনো এ্যাসিড, নয়ত সবগুলি ভাইটামিনই সেইসব পোষকরসের থেকে সরিয়ে নেয়া হত। না হয়, একটি কি দুটি এ্যামিনো এ্যাসিড অথবা একটি কি দুটি ভাইটামিন বাদ দেওয়া হত। এইভাবে এক একটি খাদ্যবস্তু বাদ দিয়ে তাঁরা পরিব্যক্তি সমন্বিত বাড়তি প্রয়োজনীয় খাদ্য-বস্তুটি নির্ধারণ করতে সক্ষম হতেন, যেটি পরিব্যক্তির পূর্বে স্পোরের খাদ্যে অবশ্য-প্রয়োজনীয় ছিল না।

কখনো এরূপ ঘটত যে, পরিব্যক্ত স্পোরের খাদ্যবস্তুতে আরজিনিন্ (arginine) নামক এ্যামিনো এ্যাসিডের প্রয়োজন হত। সুস্থ 'প্রকৃতিজাত প্রজাতি'গুলির (wild strain) পক্ষে শর্করা এবং এ্যামোনিয়া ঘটিত লবণের সহায়তায় আরজিনিন্ উৎপাদন সম্ভব। পরে প্রজনন ঘটিত পরিবর্তনের ফলে সেগুলির আরজিনিন্ উৎপাদন ক্ষমতা ব্যাহত হওয়ায় খাদ্যবস্তুতে এই বিশেষ এ্যামিনো এ্যাসিডটি যোগ না করলে সেগুলির পক্ষে প্রোটিন উৎপাদন এবং তার ফলস্বরূপ বৃদ্ধিলাভ সম্ভব হত না।

এইরূপ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পরিষ্কার উপায় হচ্ছে—এ কথা অনুমান করা যে, রঞ্জনরশ্মি আরজিনিন্ উৎপাদনকারী উৎসেচকটির নিয়ন্ত্রণকারী জীন্‌টিকে বিপর্যস্ত করেছে। স্বাভাবিক জীন্‌টির অনুপস্থিতিতে নিউরোস্পোরা



ডি-এন-এ প্রোটীন কমপ্লেক্স—ইলেক্‌ট্রোন মাইক্রোস্কোপ দ্বারা গৃহীত চিত্র। স্ফেরিকাল (Spherical) একটি সমুদ্র জন্তুর জীবণু হইতে পৃথকীকৃত করা হইয়াছে এবং ৭৭,৫০০ গুণ বিবর্ধন করা হইয়াছে—বিশ্বাস যে, ইহাতে প্রোটীন সমেত ডি-এন-এ বর্তমান।



স্ট্যানলি মিলারের ইতিহাস প্রসিদ্ধ গবেষণা-পরীক্ষাগারে অ্যামিনো এসিড জন্মানো হইতেছে।

উৎসেচক উৎপাদনে সক্ষম নয়। আর উৎসেচকের অভাবে আরজিনিনেরও অভাব হয়।

বিডল্ ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ বিপাক-ক্রিয়ার (metabolism) সঙ্গে জীনের সম্পর্ক নির্ধারণের পর্যালোচনায় এই সকল-তথ্যের ব্যবহার করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আরজিনিন্ উৎপাদনে একাধিক জীনের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার উপায় আছে। ব্যাপারটা সহজবোধ্য করার জন্য, ধরা যাক্ দুটি জীন্—জীন্ ক এবং জীন্ খ –দুটি বিভিন্ন উৎসেচক উৎপাদনের জন্য দায়ী, এবং আরজিনিন্ সংশ্লেষণে দুটিরই প্রয়োজন আছে। সেক্ষেত্রে জীন্ ক এবং জীন্ খ এই দুটির যে কোনো একটিতে পরিব্যক্তির ফলে নিউরোস্পোরার এ্যামিনো এ্যাসিড উৎপাদনের ক্ষমতা ব্যাহত হবে। ধরা যাক্, আমরা দুদল নিউরোস্পোরার উপর বিকীরণ প্রয়োগ করলাম, যার ফলে প্রত্যেক দলে একটি করে আরজিনিন্‌হীন প্রজাতির সৃষ্টি হল। (যদি আমাদের ভাগ্য ভালো হয়, তবে একটি প্রজাতিতে জীন্ ক-টি হবে ত্রুটিযুক্ত এবং জীন্ খ-টি হবে স্বাভাবিক, অপরটিতে জীন্ ক স্বাভাবিক, জীন্ খ দোষযুক্ত)। এরকম একটা কিছু ঘটেছে কি না তা নির্ধারণ করার জন্য দুটি প্রজাতিতে তাদের জীবন চক্রের যৌনমিলনক্ষণে মিলিত করা গেল। যদি দুটি প্রজাতিতে সত্যই উপরোক্ত ধরনের পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে এই সম্মিলনের ফলে কতকগুলি স্পোরের সৃষ্টি হতে পারে, যেগুলির ক এবং খ উভয় জীনেই স্বাভাবিক। অন্য কথায় আরজিনিন্ উৎপাদনে অক্ষম এমন দুইটি প্রজাতির মিলনের ফলে এমন কিছু স্পোরের উৎপত্তি হবে, যেগুলি আরজিনিন্ উৎপাদনে সক্ষম। গবেষণা-কালে ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছিল।

নিউরোস্পারার বিপাক ক্রিয়ার এর চেয়ে সূক্ষ্মতর পর্যবেক্ষণও সম্ভব হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ, সাধারণ খাদ্য বস্তুতে আরজিনিন্ উৎপাদনে অক্ষম এমন তিনটি বিভিন্ন প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। শুধু আরজিনিন্ সরবরাহেই একটি প্রজাতির বৃদ্ধিলাভ সম্ভব ছিল। দ্বিতীয়টির বৃদ্ধিলাভ সম্ভব ছিল হয় আরজিনিন্, না হয় প্রায় একই ধরনের আর একটি যৌগিক পদার্থ সাইট্রুলিনের (Citrulline) সরবরাহে। তৃতীয়টি আরজিনিন্, সাইট্রুলিন্ অথবা আর একটি একই ধরনের যৌগিক বস্তু অরনিথিনের (Ornithine) উপস্থিতিতে বৃদ্ধিলাভ করতে সক্ষম ছিল।

এর থেকে কি সিদ্ধান্ত হবে? আমাদের অনুমান যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে

আরজিনিন্ উৎপাদনে এই তিনটি বস্তু তিনটি পর্যায়। প্রত্যেকটির একটি করে উৎসেচকের প্রয়োজন। প্রথমে অতি সরল কোনো যৌগিক বস্তু থেকে একটি উৎসেচকের সাহায্যে অরনিথিন উৎপাদিত হয়, তারপর আর একটি উৎসেচক অরনিথিনকে সাইট্রুলিনে পরিবর্তিত করে এবং সর্বশেষে তৃতীয় একটি উৎসেচক সাইট্রুলিন্‌কে আরজিনিনে পরিবর্তিত করে। (বস্তুতঃ রাসায়নিক বিশ্লেষণেও দেখা যায় যে, তিনটির প্রত্যেকটি পর পর একে অপরের চেয়ে রাসায়নিক সংগঠনে সামান্য জটিলতর)। এখন যদি নিউরোস্পোরার কোনো প্রজাতির অরনিথিন্ উৎপাদনকারী উৎসেচক না থাকে, অন্য উৎসেচকগুলি থাকে তবে কেবলমাত্র অরনিথিন্ সরবরাহেই সেটি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে, কারণ তার থেকেই স্পোরগুলি সাইট্রুলিন্ এবং শেষ পর্যায়ে অপরিহার্য আরজিনিন্ উৎপাদনে সক্ষম হয়। অবশ্য সেটি সাইট্রুলিনেও বৃদ্ধি লাভ করতে পারে, যার সাহায্যে সেটি আরজিনিন্ উৎপাদনে সক্ষম এবং শুধুমাত্র আরজিনিনেও এইগুলির বৃদ্ধি সম্ভব। অনুরূপভাবে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, দ্বিতীয় প্রজাতিটির ক্ষেত্রে যে উৎসেচকটি অরনিথিন্‌কে সাইট্রুলিনে পরিবর্তিত করে সেটি অনুপস্থিত। সুতরাং, ঐটির ক্ষেত্রে সরাসরি সাইট্রুলিন্ সরবরাহ যা আরজিনিনে পরিবর্তিত হতে পারে, অথবা শুধুই আরজিনিন্ সরবরাহ প্রয়োজন। সবশেষে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, যে প্রজাতিটি শুধুমাত্র আরজিনিনেই বৃদ্ধিলাভ করতে পারে সেটির ক্ষেত্রে যে উৎসেচকটি (এবং জীন্) সাইট্রুলিন্‌কে আরজিনিনে পরিবর্তিত করে তারই অভাব।

বিড্‌ল্ এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ যে সকল বিভিন্ন পরিব্যক্ত প্রজাতি স্বতন্ত্র করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেগুলির আচরণ বিশ্লেষণের ফলে তাঁরা 'রাসায়নিক সুপ্রজনন বিদ্যার' পত্তন করেন। তাঁরা জীব কর্তৃক উৎপাদিত বহু প্রয়োজনীয় যৌগিক পদার্থের সাংশ্লেষিক পর্যায়গুলি নির্ধারণ করেন। যে তত্ত্বটি 'একটি জীন্—একটি উৎসেচক তত্ত্ব' নামে পরিচিত সেটির প্রস্তাবক হচ্ছেন বিড্‌ল্—যার অর্থ, একটি জীন্ একটি মাত্র উৎসেচক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। তাঁদের এই পথ-প্রদর্শনকারী গবেষণার জন্য বিড্‌ল্ ও ট্যাটাম্ ১৯৫৮ সালে ভেষজতত্ত্ব ও শারীর-বিদ্যায় যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

বিড্‌লের আবিষ্কারের ফলে প্রাণরসায়নবিদ্‌রা সোৎসাহে প্রোটিনগুলির জীন্ নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনগুলির প্রমাণ অন্বেষণ শুরু করলেন। বিশেষ করে এই

অন্বেষা চলল মানব পরিব্যক্তির ক্ষেত্রে। অপ্রত্যাশিতভাবে একটি প্রমাণ, একপ্রকার রোগের পর্যালোচনায় পাওয়া গেল—যার নাম অর্ধচন্দ্রাকৃতি কোষ-জনীন রক্তশূন্যতা (sickle-cell anemia)।

১৯১০ সালে, শিকাগোর এক চিকিৎসক জেমস্ বি হেরিক প্রথম এই রোগের উল্লেখ করেন। একজন চিকিৎসাধীন নিগ্রো কিশোরের রক্ত অনুবীক্ষণে পর্যবেক্ষণ করে তিনি দেখতে পেলেন যে, তার লোহিত কণিকাগুলি (যেগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় গোলাকার), অদ্ভুত বঙ্কিম আকৃতির, অনেক-গুলিরই আকৃতি অর্ধচন্দ্রের মতো। অন্যান্য চিকিৎসকেরাও প্রায়শঃই নিগ্রো রোগীর ক্ষেত্রে ক্রমে একই বিচিত্র ঘটনা লক্ষ্য করলেন। অবশেষে পর্যবেক্ষণ-কারীরা স্থির করলেন যে, অর্ধচন্দ্রাকৃতি কোষজনীন রক্তশূন্যতা রোগটি বংশগত। বংশগতির ব্যাপারে ঐটি মেণ্ডেলীয় নিয়মগুলি মেনে চলে। আপাতদৃষ্টিতে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কোষের একটি জীন্ রয়েছে, যেটি পিতামাতা উভয়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে সন্তানে দ্বিগুণিত হলে, তার বিকৃত লোহিতকণিকাগুলি উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই কণিকাগুলি যথাযথভাবে অক্সিজেন বহনে অক্ষম এবং অত্যন্ত স্বল্পায়ু হওয়ায় রক্তে লোহিত-কণিকার অপ্রতুলতা ঘটে। যারা বংশগতিতে দুটি জীন্ লাভ করে, শিশুকালেই এই রোগে তাদের মৃত্যু হয়। অপরপক্ষে, পিতা বা মাতা একজনের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্ধচন্দ্রাকৃতি কোষের একটি মাত্র জীন্‌বিশিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে, এই রোগের প্রকাশ ঘটে না। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তি অত্যধিক মাত্রায় অক্সিজেন হতে বঞ্চিত হয়, যেমন হতে পারে অত্যধিক উচ্চতায়, তখনই লোহিত-কণিকাগুলি অর্ধচন্দ্রাকৃতি লাভ করে। এই সকল ব্যক্তিকে বলা হয় "অর্ধচন্দ্রাকৃতি কোষ প্রলক্ষণ বিশিষ্ট" (sickle-cell trait) কিন্তু রোগযুক্ত নয়।

দেখা গিয়েছে যে, আমেরিকার নিগ্রোদের শতকরা প্রায় ৯ জন এই রোগ প্রলক্ষণ বিশিষ্ট এবং শতকরা ০·২৫ জন রোগযুক্ত। মধ্য আফ্রিকার কোনো কোনো জনপদে মোট নিগ্রো জনসাধারণের প্রায় এক চতুর্থাংশ, এই রোগ প্রলক্ষণ বিশিষ্ট। আপাতদৃষ্টিতে আফ্রিকায় পরিব্যক্তির ফলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কোষের জীনের উদ্ভব এবং তদবধি আফ্রিকা দেশীয় ব্যক্তিরাই উত্তরাধিকার সূত্রে ঐটি লাভ করে। কিন্তু যখন রোগটির ফলে মৃত্যুই হয়, তবে দোষযুক্ত জীন্‌টির বিলোপসাধন ঘটেনি কেন? ১৯৫০ সালে, আফ্রিকায় পর্যবেক্ষণের ফলে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। দেখা গিয়েছে যে, অর্ধচন্দ্রাকৃতি কোষ প্রলক্ষণ

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সুস্থ ব্যক্তি অপেক্ষা ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক ক্ষমতা বেশি। যে ভাবেই হোক, অর্ধচন্দ্রাকৃতি কোষগুলি ম্যালেরিয়ার পরজীবি জীবাণুগুলিকে আশ্রয়দান করে না। হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে, ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে এই রোগ প্রলক্ষণ বিশিষ্ট শিশুদের, নীরোগ শিশুদের অপেক্ষা সন্তান উৎপাদনের বয়স অবধি আয়ু লাভের সম্ভাবনা শতকরা ২৫ ভাগ বেশি। সুতরাং অর্ধচন্দ্রাকৃতি কোষের জীনের একমাত্রায় উপস্থিতি (কিন্তু রক্তশূন্যতা রোগসৃষ্টিকারী দুই মাত্রায় নয়) লাভজনক। দুই বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাবে— ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ক্ষমতা হেতু এক মাত্রার জীনের স্থায়িত্বলাভ এবং মারক হিসাবে দুই মাত্রার জীনের লয় প্রাপ্তিতে—এক রকমের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ফলে জনসাধারণের একটি নির্দিষ্ট অংশে জীন্‌টি লালিত হয়।

যে-সব অঞ্চলে ম্যালেরিয়া নিদারুণ সমস্যা নয়, সে-সব অঞ্চলে জীন্‌টি ধ্বংসোন্মুখ। আমেরিকায় নিগ্রোদের মধ্যে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কোষের জীনের উপস্থিতির হার সূচনায় শতকরা ২৫ ছিল বলে অনুমিত হয়। যদি ধরে নেওয়াও যায় যে, অ-নিগ্রো শ্রেণীর সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে সূচনায় এই হার ছিল শতকরা ১৫ ভাগ তা'হলে, বর্তমানে নির্ধারিত শত করা ৯ ভাগ হারের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই জীন্‌টি ক্রমশঃই ধ্বংসোন্মুখ। সম্ভবতঃ এই ব্যাপার চলতেই থাকবে। আফ্রিকা যদি ম্যালেরিয়া মুক্ত হয়, তাহলে অনুমিত হয় যে, জীন্‌টি সেখানেও ধ্বংসোন্মুখ হবে।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালটেখে (যেখানে বিড্‌ল্ এবং তাঁর সহকর্মীগণ গবেষণা করছিলেন) গবেষণা করে লিনাস্ পাউলিং এবং তাঁর সহকর্মীরা যখন প্রমাণ করেন যে, এই রোগের জীনটি লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনকে প্রভাবান্বিত করে, তখন হঠাৎই অর্ধচন্দ্রাকৃতি কোষের জীনের প্রাণরাসায়নিক তাৎপর্যটি বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অর্ধচন্দ্রাকৃতি কোষের দুই মাত্রার জীন-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন উৎপাদনে অসমর্থ। পাউলিং এই ব্যাপারটি যে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেন তাকে বলা হয় 'ইলেকট্রো-ফোরেসিস্' (Electrophoresis); বিভিন্ন প্রোটিনের অণুগুলি বিভিন্ন পরিমাণের বিদ্যুতাধান সমন্বিত হওয়ায়, এই পদ্ধতিতে বিদ্যুত প্রবাহের সাহায্যে প্রোটিনগুলি আলাদা করা হয়। সুইডেনবাসী রসায়নবিদ্ আর্নে ভিল্‌হেল্‌ম্ কউরিন্ টিসেলিয়াস্ এই ইলেকট্রোফোরেটিক প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন। ১৯৪৮ সালে, এই মূল্যবান অবদানের জন্য তাঁকে রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

পাউলিং ইলেকট্রোফোরেটিক বিশ্লেষণে লক্ষ্য করেন যে, অর্ধচন্দ্রাকৃতি কোষ-জনীন রক্তশূন্য রোগীদের এক ধরনের অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন আছে (যার নাম 'হিমোগ্লোবিন-S' (Haemoglobin-S) এবং সেগুলি স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন থেকে স্বতন্ত্র করা সম্ভব। স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনগুলির নাম দেওয়া হল 'হিমোগ্লোবিন-A' (পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির (adult) সূচকরূপে-A শব্দটি প্রযুক্ত এবং ভ্রূণের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে পার্থক্য বজায় রাখার জন্য সেগুলিকে বলা হয় 'হিমোগ্লোবিন F' (ভ্রূণের ইংরেজী fetus-এর আদ্যাক্ষর নিয়ে)।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের পর, প্রাণরসায়নবিদরা অর্ধচন্দ্রাকৃতি কোষের হিমোগ্লোবিন ছাড়াও আরও নানা ধরনের ও অস্বাভাবিক ধরনের হিমোগ্লোবিন আবিষ্কার করেছেন এবং ইংরেজী বর্ণমালার 'C' থেকে 'M' অবধি বর্ণ দিয়ে সেগুলির নামকরণ করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে হিমোগ্লোবিন উৎপাদনের জন্য দায়ী জীনটি পরিব্যক্তির ফলে বহু দোষযুক্ত এ্যালীলের সৃষ্টি করেছে, যেগুলি সাধারণ প্রতিবেশে কর্মরত অণুগুলির তুলনায় হীনতর হলেও হয়ত বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কার্যকর হয়। উদাহণস্বরূপ বলা যায় যে, যেমন 'হিমোগ্লোবিন-S' এক মাত্রায় ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ক্ষমতা গড়ে তোলে, সেইরকম হিমোগ্লোবিন-C-এর একমাত্রায় উপস্থিতি প্রান্তীয় মাত্রার (marginal quantities) লৌহে দেহ ধারণ ক্ষমতাকে উন্নততর করে।

যেহেতু অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনগুলির বিদ্যুতাধান বিভিন্ন, সেই হেতু এ কথা নিশ্চিত যে, সেগুলির পেপটাইড (peptide) শৃংখলে এ্যামিনো এ্যাসিডগুলির শ্রেণীবদ্ধতা বিভিন্ন ধরনের, কারণ অণুগুলির বিদ্যুতাধান প্রকৃতি নির্ভর করে এ্যামিনো এ্যাসিডের পরিগঠনের উপর। এই পার্থক্য নিশ্চয়ই খুবই সামান্য, কারণ অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনগুলিও স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের মতোই একরকম কাজ চালিয়ে নেয়। অবশ্য প্রায় ৬০০ এ্যামিনো এ্যাসিড সম্বলিত বিরাট অণুতে এই পার্থক্য নির্ধারণ করার আশা খুব কমই ছিল। তা সত্ত্বেও বৃটিশ প্রাণরসায়নবিদ্ ভারনন এম্ ইনগ্রাম্ এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনগুলির রসায়নের সমস্যাটির সমাধান করেন।

তাঁরা প্রথমে হিমোগ্লোবিন-A, হিমোগ্লোবিন-S, এবং হিমোগ্লোবিন-C একটি প্রোটিন বিভাজক উৎসেচকের সাহায্যে বিভিন্ন আকৃতির পেপটাইডে বিভাজিত করেন। তারপর তাঁরা প্রত্যেকটি হিমোগ্লোবিনের কণিকাগুলি 'পেপার ইলেট্রোফোরেসিসের (Paper Electrophoresis) সাহায্যে স্বতন্ত্র

করেন। এই পদ্ধতিতে দ্রবণের বদলে ভিজা ফিল্টার কাগজে বিদ্যুতপ্রবাহের দ্বারা অণুগুলিকে চালিত করা হয়। (এ পদ্ধতিকে আমরা এক ধরনের বিদ্যুতসমন্বিত কাগজী বর্ণরেখচিত্র,—electrified paper chromatography—বলতে পারি)। যখন গবেষণাকারীগণ তিনটি হিমোগ্লোবিনের প্রত্যেকটি নিয়ে এই পদ্ধতিতে গবেষণা চালালেন, তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে, তিনটির ক্ষেত্রে একমাত্র পার্থক্য দেখা :গেল একটিমাত্র পেপটাইডের বিভিন্ন স্থানেতে অবস্থানে।

তাঁরা এই পেপটাইডকে বিভাজিত করে তার বিশ্লেষণে অগ্রসর হলেন। অবশেষে তাঁরা জানতে পারলেন যে, সেটি নয়টি এ্যামিনো এ্যাসিডে গঠিত এবং ঐ তিনটি হিমোগ্লোবিনে ঐ নয়টি এ্যামিনো এ্যাসিডের অবস্থান, একটি স্থান ছাড়া সর্বত্রই ঠিক একই রকম। প্রতিটি হিমোগ্লোবিনে অবস্থান নিম্নরূপ :

হিমোগ্লোবিন-A : হিস্-ভ্যাল্-লিউ-লিউ-থ্রি-প্রো-গ্লু-গ্লু-লাইস্

হিমোগ্লোবিন-S : হিস্-ভ্যাল্-লিউ-লিউ-থ্রি-প্রো-ভ্যাল্-গ্লু-লাইস্

হিমোগ্লোবিন-C : হিস্-ভ্যাল্-লিউ লিউ-থ্রি-প্রো-লাইস্-গ্লু-লাইস্

যতদূর দেখা গিয়েছে, এই তিনটি হিমোগ্লোবিনে একমাত্র পার্থক্য তাদের পেপটাইড শৃংখলের সপ্তম পর্যায়ের—একটি মাত্র এ্যামিনো এ্যাসিডের ক্ষেত্রে; হিমোগ্লোবিন-'A'-তে সেটি গ্লুটামিক্ এ্যাসিড্, হিমোগ্লোবিন-'S'-এ ভ্যালিন্, হিমোগ্লোবিন-'C'-তে লাইসিন্। যেহেতু গ্লুটামিক্ এ্যাসিডের বিদ্যুতাধান ঋণাত্মক, লাইসিনের বিদ্যুতাধান ধনাত্মক এবং ভ্যালিনের কোনো বিদ্যুতাধান নেই, সেই হেতু ইলেক্ট্রোফোরেসিসে যে এই তিনটি এ্যামিনো এ্যাসিডের ব্যবহারে বিভিন্নতা হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাদের বিদ্যুতাধানের প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের।

কিন্তু, অণুর ক্ষেত্রে এই সামান্য পার্থক্যের জন্য লোহিত-কণিকায় কেন এত গুরুতর পার্থক্য হবে? কারণ, স্বাভাবিক লোহিত কণিকা এক-তৃতীয়াংশ হিমোগ্লোবিন 'A' দ্বারা গঠিত। 'হিমোগ্লোবিন 'A'র পরমাণুগুলি এমন ঘননিবদ্ধ যে তাদের স্বচ্ছন্দ নড়াচড়ার অতি সামান্য জায়গাই অবশিষ্ট থাকে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সেগুলি দ্রবণে প্রায় অধঃক্ষিপ্ত হবার পর্যায়ে থাকে। প্রোটিনটি অধঃক্ষিপ্ত হবে কি না অংশতঃ নির্ভর করে বিদ্যুতাধানের প্রকৃতির উপর। যদি সমস্ত প্রোটিনগুলির বিদ্যুতাধান সমষ্টি সমান হয় তাহলে তারা পরস্পরের বিকর্ষণের জন্য অধঃক্ষিপ্ত হবার সুযোগ পায় না। বিদ্যুৎশক্তি

(অর্থাৎ বিকর্ষণ) যত প্রবল হবে প্রোটিনগুলির অধঃক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা তত কম। এখন হিমোগ্লোবিন 'S'-এ অণুগুলির মধ্যে বিকর্ষণ হিমোগ্লোবিন 'A'-র তুলনায় সামান্য কম হওয়ায়, তুলনামূলক ভাবে, হিমোগ্লোবিন 'S'-এর দ্রবণীয়তা কম এবং অধঃক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা বেশি। যখন একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি কোষের জীন্ একটি সুস্থ জীনের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয় তখন শেষোক্ত জীনটি যথেষ্ট পরিমাণ হিমোগ্লেবিন-'A' উৎপন্ন করায়, হিমোগ্লোবিন-'S'ও দ্রবণে অবস্থান করতে সক্ষম হয়, যদিও তার স্থিতিশীলতা খুবই কম। কিন্তু যদি দুইটি জীন্ই পরিব্যক্তিজাত অর্ধচন্দ্রাকৃতি কোষের হয় তাহলে তারা শুধুই হিমোগ্লোবিন 'S' উৎপন্ন করবে। এই অণুগুলির দ্রবণে অবস্থিতি সম্ভব নয়। এইগুলি কেলাসিত (crystalised) অবস্থায় অধঃক্ষিপ্ত হবে, যার ফলে লোহিতকণিকার বিকৃতি হবে এবং সেটি দুর্বল হয়ে পড়বে।

এই তত্ত্বে এ কথা পরিষ্কার হবে যে, প্রায় ৬০০টি এ্যামিনো এ্যাসিড সমন্বিত অণুতে একটি মাত্র এ্যামিনো এ্যাসিডের পরিবর্তনে কেন মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করে, যার পরিণামে অল্পবয়সে মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত।

মানুষের ক্ষেত্রে ধবলগ্রস্থতা (albinism) বা অর্ধচন্দ্রাকৃতি কোষজনীন রক্তশূন্যতাই একমাত্র দোষ নয়, যার উৎপত্তি একটি জীনের পরিব্যক্তিতে অথবা একটিমাত্র উৎসেচকের অভাবে। 'ফিনাইলকিটোনিউরিয়া' (phenylketonuria) এমনই একটি বংশানুসৃত ত্রুটিযুক্ত বিপাকক্রিয়া, যার ফলে মানসিক জড়তার উৎপত্তি হয়। এ্যামিনো এ্যাসিড ফিনাইলঅ্যালানাইন্‌কে (phenylalanine) টাইরোসিনে (tyrosine) পরিবর্তিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচকটির অভাবেই এই রোগ দেখা দেয়। এ ছাড়াও আছে গ্যালাক্‌টোসেমিয়া (galactosemia), যার ফলে চোখে ছানি পড়ে এবং মস্তিষ্ক ও যকৃৎ জখম হয়। এটির উৎপত্তির কারণও একটি উৎসেচকের অভাব, যেটি গ্যালাক্‌টোজ ফস্‌ফেট্‌কে (galactose phosphate) গ্লুকোজ ফস্‌ফেটে (glucose phosphate) পরিবর্তিত করার জন্য প্রয়োজন। আর একটি দোষ আছে যার উৎপত্তি একটি বা দুটি উৎসেচকের অভাব, যেগুলি বিভাজন ক্রিয়ায় গ্লাইকোজেন (glycogen) থেকে গ্লুকোজে পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং ফলে যকৃৎ ও অন্যান্য স্থানে অস্বাভাবিক গ্লাইকোজেন জমে অকাল মৃত্যুর পথে মানুষকে ঠেলে দেয়।

এই রোগগুলি সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট অনুসেচক উৎপাদনকারী জীন্‌টির প্রচ্ছন্ন (recessive) এ্যালীল্‌ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যখন একজোড়া জীন একটিমাত্র ক্রটিযুক্ত তখন স্বাভাবিক জীন্‌টি কাজ চালিয়ে নিতে সক্ষম এবং সেই ব্যক্তি সাধারণতঃ স্বাভাবিক জীবন যাপনে সক্ষম হয় (যেমন অর্ধ চন্দ্রকোষ প্রলক্ষণ বিশিষ্ট ব্যক্তি)। সাধারণতঃ দুর্ভাগ্যের স্থচনা হয় তখনই, যখন পিতামাতা উভয়েরই একই রকম ক্রটিযুক্ত জীন্‌ থাকে এবং আরও দুরদৃষ্টক্রমে নিষিক্ত ডিম্বাণুতে সে দুটি জোটবদ্ধ হয়। ভাগ্যের জুয়া খেলায় তাদের সন্তানের হার হয়। সম্ভবতঃ আমরা সবাই কিছু না কিছু অস্বাভাবিক, ক্রটিযুক্ত এবং এমন কি বিপজ্জনক জীন বহন করি, যেগুলি সাধারণতঃ সুস্থ জীন্‌গুলি দ্বারা আবরিত থাকে। মানব সুপ্রজনন-বিদ্যাবিদরা কেন যে বিকিরণ অথবা অন্য কোনো কারণে এই ভার বৃদ্ধিতে আশংকিত, তার কারণ এখন পাঠকের কাছে নিশ্চয়ই স্পষ্ট।

নিউক্লিক এসিডসমূহ

বংশগতির ক্ষেত্রে সত্যকারের উল্লেখযোগ্য কিন্তু উপরোক্ত চমকপ্রদ বিরল ব্যতিক্রমগুলি নয়, বরং উল্লেখযোগ্য এই যে, সাধারণতঃ বংশগতি নিখুঁত ও সঠিকভাবে একই বস্তুর পুনরাবৃত্তি করে। পুরুষানুক্রমে, হাজার হাজার বছর ধরে জীন্‌গুলি ঠিক একইভাবে জননকার্য চালিয়ে যায় এবং ঠিক একই ধরনের উৎসেচকগুলি উৎপাদন করে ; এর আকস্মিক ব্যতিক্রম অতি অল্প মাত্রই হয়ে থাকে। এইগুলি কদাচিৎ অকৃতকার্য হয় এবং যদি হয়, বড় জোর বিরাট প্রোটিন অণুতে একটিমাত্র ভুল এ্যামিনো এ্যাসিডের অনুপ্রবেশ ঘটায়। এই রকম বিস্ময়কর নিষ্ঠার সঙ্গে এগুলি বারংবার নিজেদের প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে কিভাবে সক্ষম হয় ?

একটি জীন্‌ দুইটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। সম্ভবতঃ বস্তুটির অর্ধেক অংশ প্রোটিন, অপরার্ধ নয়। এই অপ্রোটিন অংশে আমরা এখন আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করব।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, সুইজারল্যাণ্ডবাসী প্রাণরসায়নবিদ্‌ ফ্রিডরিখ মাইশার, পেপসিনের সাহায্যে কোষের প্রোটিন বিভাজন কালে আবিষ্কার করেন যে, পেপসিন কোষ-কেন্দ্রকটি বিভাজনে সক্ষম নয়। কেন্দ্রকটি কিছু সংকুচিত

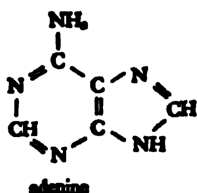
হয়, কিন্তু অটুট থাকে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে মাইশার পরে আবিষ্কার করেন যে, কোষকেন্দ্রকটি প্রধানতঃ ফস্‌ফরস সমন্বিত একটি বস্তুদ্বারা গঠিত, যেটির রাসায়নিক গুণাগুণ আদৌ প্রোটিনের মতো নয়। তিনি বস্তুটির নামকরণ করেন "নিউক্লিন্" (nuclein)। যেহেতু বস্তুটি তীব্র অম্লগুণ সম্পন্ন (acidic), পরবর্তীকালের এটির পুনর্নামকরণ হল "নিউক্লিক এ্যাসিড" (nuelic acid)।

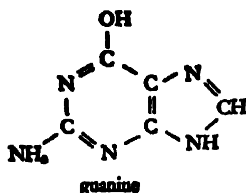
মাইশার এই নতুন বস্তুটির অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন এবং কালক্রমে আবিষ্কার করেন যে, শুক্রকোষগুলিতে—(যে-গুলিতে কোষ-কেন্দ্রকের বাইরে অতি সামান্য বস্তুই বিদ্যমান, বিশেষ করে নিউক্লিক এ্যাসিডসমূহ প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। ইতিমধ্যে জার্মান রসায়নবিদ্ ফেলিক্স হোপ-সেইলার, (যাঁর গবেষণাগারে মাইশার তাঁর প্রথম আবিষ্কারটি করেন) ইস্টের (খামিরের) কোষ থেকে নিউক্লিক এ্যাসিড পৃথক করেন। এটিকে মাইশার আবিষ্কৃত বস্তু থেকে পৃথক গুণসম্পন্ন বলে মনে হওয়ায় মাইশারের আবিষ্কৃত বস্তুটির নামকরণ করা হয় "থাইমাস নিউক্লিক এ্যাসিড" (thymus nucleic acid) (কারণ প্রাণীর থাইমাস গ্ল্যাণ্ড (thymus gland) থেকে বস্তুটি সহজেই পাওয়া যায়) এবং স্বভাবতঃই হোপ সেইলারের আবিষ্কৃত বস্তুটির নামকরণ করা হয় "ইস্ট নিউক্লিক এ্যাসিড।" যেহেতু প্রথম আমলে 'থাইমাস্ নিউক্লিক এ্যাসিড' প্রাণীর কোষ থেকে আহৃত হত এবং 'ইস্ট নিউক্লিক এ্যাসিড' আহৃত হত উদ্ভিদকোষ থেকে, সেই হেতু কিছুকাল এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, প্রাণী এবং উদ্ভিদের সাধারণ রাসায়নিক পার্থক্য এই দু'টির মাধ্যমে সম্ভব।

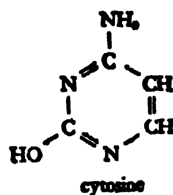
জার্মান প্রাণরসায়নবিদ্ এ্যালব্রেথট কোসেল্ সর্বপ্রথম নিউক্লিক এ্যাসিড অণুর গঠন সম্বন্ধে ধারাবাহিক অনুসন্ধান চালান। অতি সাবধানে আর্দ্র বিশ্লেষের (hydrolysis) সাহায্যে, তিনি এ থেকে কতকগুলি নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগিক পদার্থ পৃথক করেন, যেগুলির তিনি নাম দেন "এ্যাডিনিন্" (adenine), "গুয়ানিন্" (guanine), "সাইটোসিন্" (cytosine) এবং "থাইমিন্" (thymine)। বর্তমানে জানা গেছে যে, এগুলির সংকেত (formula) পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

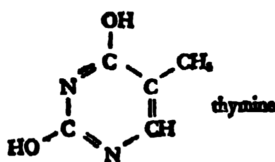
প্রথম দুইটি যৌগের ক্ষেত্রে, যুগ্মচক্র গঠনকে বলা হয় "পিউরিন্ চক্র" (purine ring) এবং শেষের দুইটির ক্ষেত্রে, একক চক্রকে বলা হয়

"পিরিমিডিন্ চক্র" (pyrimidine ring)। সুতরাং এ্যাডিনিন্ ও গুয়ানিন্‌কে পিউরিন্‌বর্গ এবং সাইটোসিন্ ও থাইমিন্‌কে পিরিমিডিন্‌বর্গ বলে উল্লেখ করা হয়।





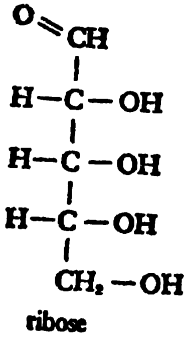




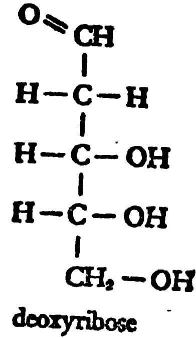
এই গবেষণাগুলির জন্য (যার ফলে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আবিষ্কারসমূহের সূত্রপাত), ১৯১০ সালে কোসেল্ ভেষজতত্ত্ব ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে, রুশ বংশজ মার্কিন প্রাণরসায়নবিদ ফিবাস্ এ্যারন্ থিওডোর লেভিন্ এই অনুসন্ধানের কার্যে আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, নিউক্লিক এ্যাসিডগুলি পাঁচটি কার্বন বিশিষ্ট শর্করার (sugar) অণু নিয়ে গঠিত। (সেই সময় এ ফলাফল ছিল অপ্রত্যাশিত। কারণ, সুপরিচিত সব শর্করাগুলিই, যেমন গ্লুকোজ—ছ'টি কার্বন নিয়ে গঠিত)। লেভিন এর পরেই প্রমাণ করেন যে, দুই ধরনের নিউক্লিক এ্যাসিডের পার্থক্য এই পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট শর্করার পার্থক্যেই নিহিত। ইস্ট নিউক্লিক এ্যাসিড 'রিবোজ' (ribose) দ্বারা গঠিত, আর থাইমাস্ নিউক্লিক এ্যাসিডের শর্করা প্রায় রিবোজের মতোই, কেবল তাতে অক্সিজেন পরমাণু অনুপস্থিত। এই শেষোক্ত

শর্করাটির নামকরণ করা হয় 'ডি-অক্সিরিবোজ' (অক্সিজেনহীন রিবোজ) (deoxyribose)। ঐ দুটির সংকেত এইরূপ :



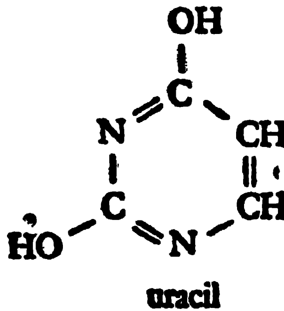
রিবোজ্



ডিঅক্সি-রিবোজ

ফলে দুই ধরনের নিউক্লিক এ্যাসিডের নামকরণ হল "রিবোনিউক্লিক এ্যাসিড ("ribonucleic acid" RNA—আর. এন্. এ) এবং ডি-অক্সিরিবোনিউক্লিক এ্যাসিড (deoxyribonucleic acid, DNA.—ডি. এন্. এ)।

শর্করার পার্থক্য ছাড়াও একটি নিউক্লিক এ্যাসিড দুটির পার্থক্যে পিরিমিডিনঘটিত পার্থক্যও বর্তমান। আর. এন্. এ'তে থাইমিনের বদলে ইউরেসিল্ (uracil) বর্তমান। ইউরেসিল্, থাইমিনের মতোই, পার্থক্যটি সংকেতে পরিষ্কার বোঝা যাবে :



ইউরেসিল্

১৯৩৪ সাল নাগাদ, লেভিন প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, নিউক্লিক এ্যাসিডগুলিকে নানা ভগ্নাংশে বিভাজন সম্ভব, যে ভগ্নাংশগুলিতে পিউরিন্

অথবা একটি পিরিমিডিন্, একটি রিবোজ অথবা একটি ডিঅক্সিরিবোজ শর্করা, এবং একটি ফস্ফেটযুক্ত যৌগিক পদার্থ বর্তমান থাকে। এই সমবায়কে বলা হয়—'নিউক্লিওটাইড' (nucleotide)। লেভিন প্রস্তাব করেন যে, প্রোটিন অণুগুলি যেমন এ্যামিনো এ্যাসিডের সমবায়ে গঠিত—নিউক্লিক এ্যাসিডগুলিও তেমনই নিউক্লিওটাইডের সমবায়ে গঠিত। মাত্রিক পরিশীলনসমূহের ফলে তাঁর ধারণা হল যে, একটি নিউক্লিক এ্যাসিড অণুতে মাত্র চারটি নিউক্লিওটাইড উপস্থিত থাকে—একটি এ্যাডেনিন্, একটি গুয়ানিন্, একটি সাইটোসিন্ এবং আর একটি হয় থাইমিন্ (ডি. এন্. এ.) অথবা ইউরেসিল্ (আর. এন্. এ)। পরে অবশ্য জানা গেল যে, লেভিন যে বস্তু পৃথক করেছিলেন তা নিউক্লিক এ্যাসিড অণু নয়, তার ভগ্নাংশমাত্র এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ প্রাণরসায়নবিদ্‌রা লক্ষ্য করেন যে, নিউক্লিক এ্যাসিডের আণবিক ভর অত্যন্ত বেশি এবং প্রায় ষাট লক্ষের মতো। মনে হয়, আণবিক আয়তনের দিক থেকে নিউক্লিক এ্যাসিডগুলি প্রোটিন অণুর সঙ্গে তুলনীয়।

কোষ-রঞ্জনী পদ্ধতি প্রয়োগে গবেষণাকারীগণ কোষে অবস্থিত নিউক্লিক এ্যাসিডের অবস্থান নির্ধারণ শুরু করলেন। জার্মান রসায়নবিদ্ রবার্ট ফাউলজেন্ একটি লাল রঞ্জক (যেটি ডি. এন্. এ-কে রঞ্জিত করে, আর. এন্. এ-কে নয়) ব্যবহার করে লক্ষ্য করেন যে, কোষকেন্দ্রকে এবং বিশেষ করে ক্রোমোজোমেই ডি. এন্. এর অবস্থান। এই বস্তুটি তিনি শুধু প্রাণী কোষেই নয়, উদ্ভিদ কোষেও নির্দেশ করেন। অধিকন্তু তিনি আর. এন্. এটিকেও রঞ্জিত করে প্রমাণ করেন যে, এই বস্তুটিও প্রাণী এবং উদ্ভিদ—উভয় কোষেই বর্তমান। সংক্ষেপে বলতে গেলে নিউক্লিক এ্যাসিড সর্বব্যাপী বস্তু, যা সমস্ত জীবিত কোষেই বর্তমান।

সুইডিশ্ প্রাণরসায়ণবিদ্ টোরবজোয়ার্ণ ক্যাস্পারসন্ প্রমাণ করতে অগ্রসর হলেন যে, ডি. এন্. এর অস্তিত্ব কেবলমাত্র ক্রোমোজোমে এবং আর. এন্. এ মুখ্যতঃ "সাইটোপ্লাজ্‌মে" (Cytoplasm) বর্তমান। সাইটোপ্লাজম্ বস্তুটি কোষ কেন্দ্রকের বাইরে কোষস্থ বস্তু। দুটির একটি নিউক্লিক এ্যাসিডকে অপসারিত করে (অর্থাৎ উৎসেচকের সাহায্যে সেটিকে দ্রবণীয় ভগ্নাংশে পরিণত করে পরে সেগুলি ধৌত করে সেগুলিকে কোষ থেকে দূরীকরণ) অপরটির উপর মনোযোগ অর্পণ করে তিনি একাজ সমাধা করেন। অতিবেগুনী

আলোকের (ultraviolet light) সাহায্যে তিনি কোষের আলোকচিত্র গ্রহণ করতেন ; এবং যেহেতু নিউক্লিক এ্যাসিড কোষস্থ অন্য পদার্থগুলির তুলনায় অনেক বেশি অতিবেগুনী রঙ শোষণ করে, সেই হেতু ডি. এন্. এ অথবা আর এন্. এ দুটির যেটি কোষে বর্তমান থাকত সেটি পরিষ্কার দেখা যেত। ক্রোমোজোমের মধ্যেই কেবল ডি. এন্. এর অস্তিত্ব ধরা পড়ত। সাইটোপ্লাজমে (Cytoplasm) "মিট্রোকোন্‌ড্রিয়া" (mitrochondria) নামক কণিকাসমূহেই প্রধানতঃ আর. এন্. এর অস্তিত্ব দেখা যেত। কোষ কেন্দ্রকে অবস্থিত "নিউক্লিওলাস" (nucleolus) নামক বস্তুতেও কিছু আর. এন্. এর উপস্থিতি দেখা যেত। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রক্‌ফেলার ইনষ্টিটিউটের প্রাণ-রসায়নবিদ্ এ. ই. মির্‌স্কি প্রমাণ করেন যে, ক্রোমোজোমেও অল্প পরিমাণ আর. এন্. এ বর্তমান।

ক্যাসপারসনের চিত্রে ক্রোমোজেমে স্থানিক ফলক আকারে (localized bands) ডি. এন্. এর অস্তিত্ব দেখা যায়। এও কি সম্ভব যে, ডি. এন্. এ-ই জীন্—আজ পর্যন্ত যার অস্তিত্ব অস্পষ্ট এবং অবয়বহীন ?

সারা ১৯৪০ সাল ধরে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার সঙ্গে প্রাণরসায়নবিদ্‌রা এই সম্ভাবনাকে যাচাই করতে লাগলেন। জীবের কোষে বর্তমান ডি. এন্ এর পারমাণ যে কঠোর রূপে নির্দিষ্ট, এটা খুবই তাৎপর্যপুর্ণ বলে তাঁদের মনে হ'ল। মাত্র শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুতেই তার ব্যতিক্রম। সেখানে ডি. এন্. এর পরিমাণ ঠিক অর্ধেক। কিন্তু সেটা প্রত্যাশিত, কারণ সেগুলিতে স্বাভাবিক কোষের তুলনায় ক্রোমোজমের জোগান অর্ধেক। বিভিন্ন স্থানের ক্রোমোজোমে আর. এন্. এ এবং প্রোটিনের পরিমাণের বিভিন্নতা হতে পারে কিন্তু ডি. এন্. এর পারমাণ নির্দিষ্ট। নিশ্চয়ই এই ব্যাপার ডি. এন্. এ এবং জীনের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগের ইঙ্গিত করে।

অবশ্য এই ধারণার বিরুদ্ধে তর্ক করার অনেকগুলি যুক্তি আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ক্রোমোজোমে প্রোটিনের অস্তিত্বের কারণ কি ? নানা ধরনের প্রোটিন নিউক্লিক এ্যাসিডের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যে বস্তুটির সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় "নিউক্লিও প্রোটিন" (nucleo-protein)। প্রোটিনের জটিলতা এবং দেহের অন্যান্য অংশে সেগুলির বিভিন্ন বিশেষ নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রাখলে একথা মনে করা কি অসংগত যে, অণুতে প্রোটিনই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ ? অনুমিত হতে পারে যে, নিউক্লিক এ্যাসিড

প্রোটিনের সহ-অবস্থিত বস্তুমাত্র—বড় জোর হিমোগ্লোবিনে অবস্থিত 'হেমে'র (heme) মতো অণুর একটি সক্রিয় অংশ।

কিন্তু স্বতন্ত্রীকৃত নিউক্লিও প্রোটিনে যে প্রোটিনগুলি (প্রোটামিন —Protamine এবং হিস্টোন—histone) সাধারণতঃ পাওয়া যায়, দেখা গেল প্রোটিন হিসাবে সেগুলি খুবই সরল। ইতিমধ্যে ডি. এন্. এর স্বরূপ বিশ্লেষণে ক্রমশঃই দেখা গেল, বস্তুটির জটিল থেকে জটিলতর রূপ। প্রবাদ অনুসরণে লেজ এবার কুকুরকে নাড়তে শুরু করল।

এই সময়ে রকফেলার ইন্স্টিটিউটের তিনজন প্রাণরসায়নবিদ্ সুপ্রজনন বিদ্যায় ডি. এন্ এ-র উল্লেখযোগ্য ভূমিকার প্রমাণ উপস্থিত করেন। সেটি হল, নিউমোনিয়ার সুপরিচিত বিজাণু নিউমোকোক্কাসের মাধ্যমে। জীবাণু-তত্ত্ববিদ্‌রা ল্যাবরেটরিতে উৎপন্ন নিউমোকোক্কাসের দুইটি বিভিন্ন প্রজাতির দীর্ঘদিন পর্যালোচনা করেছেন—যার একটিতে জটিল কার্বোহাইড্রেটে তৈরী মসৃণ আবরণ রয়েছে, অপরটির এই মসৃণ আবরণ না থাকায় চেহারা কর্কশ। আপাতদৃষ্টিতে কর্কশ চেহারার প্রজাতিটির কোনো একটি উৎসেচকের অভাব থাকায় সেটি কার্বোহাইড্রেট আবরণী নির্মাণে সক্ষম হয়। কিন্তু একজন ইংরেজ জীবাণুতত্ত্ববিদ্ ফ্রেড্ গ্রিফিথ আবিষ্কার করেন যে, মসৃণ আবরণী যুক্ত জীবাণুগুলি নিহত অবস্থায় কর্কশ চেহারার জীবিত প্রজাতির সঙ্গে মিশিয়ে ইঁদুরে প্রবিষ্ট করালে সংক্রমিত ইঁদুরের কলাগুলিতে পরিণামে যে জীবিত নিউমোকোক্কাসের জীবাণু-সমুহ দেখা যায়, সেগুলি মসৃণ আবরণীর প্রজাতি। কি করে এই ব্যাপার সম্ভব? মৃত নিউমোকোক্কাস জীবাণুসমূহ নিশ্চয় প্রাণ লাভ করেনি। এমন কিছু একটা ঘটেছে যার ফলে কর্কশ চেহারার নিউমোকোক্কাস জীবাণুসমূহ এখন মসৃণ আবরণী সৃষ্টিতে সক্ষম। সেই একটা কিছু কি? স্পষ্টতঃই সেটা এমন একটা কিছু, যা মসৃণ আবরণীযুক্ত মৃত জীবাণুগুলির অবদান।

১৯৪৪ সালে রকফেলার ইন্স্টিটিউটের তিনজন প্রাণরসায়নবিদ্ ওল্‌ওয়াল্ড টি. আভেরী, কলিন্ এম ম্যাক্‌লিওড্ এবং ম্যাক্‌লিন ম্যাক্‌কার্টি এই পরিবর্তন সাধনকারী বস্তুটি আবিষ্কার করেন। সে বস্তুটি ডি. এন্. এ। যখন তাঁরা মসৃণ আবরণীর প্রজাতি থেকে বিশুদ্ধ ডি. এন্. এ স্বতন্ত্র করে তা কর্কশ চেহারার প্রজাতির নিউমোকোক্কাসগুলিতে প্রবিষ্ট করালেন, তখন দেখা গেল শুধুমাত্র সেই বস্তুটিই কর্কশ চেহারার প্রজাতিকে মসৃণ আবরণীর প্রজাতিতে পরিণত করার পক্ষে যথেষ্ট।

গবেষণাকারীগণ অন্যান্য জীবাণুগুলি এবং সেগুলির বিভিন্ন গুণাগুণ সংক্রান্ত পরিবর্তন সাধনকারী বস্তুটি স্বতন্ত্র করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আবিষ্কার করেন যে, সেগুলি বিভিন্ন ধরনের ডি. এন্. এ। এই ব্যাপারের একমাত্র যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত এই যে, ডি. এন্. এ জীনের মতো কাজ করতে পারে। বস্তুতঃ বিভিন্ন ধরনের গবেষণায়, বিশেষ করে বিষাণু (virus) সংক্রান্ত গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে ডি. এন্. এ সংশ্লিষ্ট প্রোটিন সুপ্রজনন বিদ্যার দৃষ্টি-কোণ থেকে বাহুল্যমাত্র ; ডি. এন্. এ. একাই বংশগতি নিয়ন্ত্রণে সক্ষম।

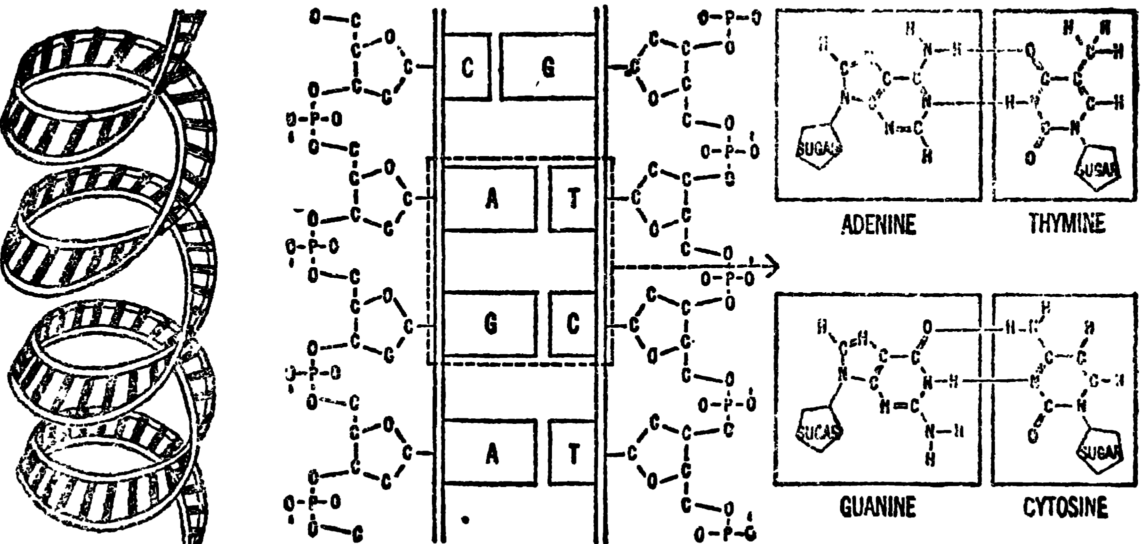
যদি ডি. এন্. এ-ই বংশগতির চাবিকাঠি হয় তা হলে বস্তুটির পরিগঠন নিশ্চয়ই জটিল হবে, কারণ, নির্দিষ্ট উৎসেচগুলির সংশ্লেষণের প্রয়োজনে বস্তুটিকে সাংকেতিক নির্দেশ দানের জন্য বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট ধাঁচের হতে হবে। যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, এইগুলি চার ধরনের নিউক্লিওটাইডে গঠিত তবে সেগুলি নিশ্চয়ই নিয়মানুগত সংগঠনের হবে না, যেমন—১, ২, ৩, ৪, ১, ২, ৩, ৪, ১, ২, ৩, ৪,……প্রভৃতি। এই রকমের অণু এতই সরল যে সেগুলির দ্বারা উৎসেচকগুলির উৎপাদনের প্রতিরূপ বহন করা সম্ভব নয় এবং বস্তুতঃই ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান প্রাণরসায়নবিদ্ এরউইন্ শারগাফ্ এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ নিউক্লিক এ্যাসিডের সংগঠন, যা ভাবা গিয়েছিল তার চেয়েও বেশি জটিল, তার নির্দিষ্ট প্রমাণ আবিষ্কার করেন। তাঁদের বিশ্লেষণে প্রমাণিত হল যে, বিভিন্ন পিউরিন্ ও পিরিমিডিন্‌গুলি সমপরিমাণে অবস্থান করে না, বিভিন্ন নিউক্লিক এ্যাসিডে সেগুলির উপস্থিতির হার বিভিন্ন এবং সাইটোসিন্ থাইমিন্ বা ইউরেসিল্ ব্যতীত অন্যান্য পাইরিমিডিনের উপস্থিতিও অণুতে বর্তমান।

যেভাবে প্রোটিন-রসায়নবিদ্‌গণ প্রোটিন অণুতে এ্যামিনো এ্যাসিডগুলির অবস্থিতির পারম্পর্য নির্ধারণ করেন, অনেকটা সেই প্রক্রিয়ায় ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে দু'জন বৃটেনবাসী প্রাণরসায়নবিদ্ আর মারথাম্ এবং জে. ডি. স্মিথ নিউক্লিক এ্যাসিড অণুর কয়েকটি অংশে নিউক্লিওটাইড্‌গুলির অবস্থানের পারম্পর্য নির্ধারণ করতে সক্ষম হন। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, এই পারম্পর্যে কোনো সুশৃঙ্খলা নেই। পেপটাইড কাঠামোয় এ্যামিনো এ্যাসিডগুলি যেমন বিশৃঙ্খলভাবে বিস্তৃত থাকে নিউক্লিওটাইড কাঠামোয় পিউরিন ও পিরিমিডিনগুলি তেমনই বিশৃঙ্খলভাবে বিস্তৃত থাকে।

তা সত্ত্বেও ক্রমশঃই একটা নিয়মের প্রকাশ ঘটতে লাগল। নিউক্লিক এ্যাসিডগুলি কর্তৃক রঞ্জন-রশ্মির (X-rays) বিচ্ছুরণ (scattering) অপবর্তনের ধাঁচে (diffraction pattern) হয়, যা অণুর সংগঠনে সুসমতার অস্তিত্বের একটা সুন্দর লক্ষণ। বৃটেনবাসী প্রাণরসায়নবিদ্ এম্. এইচ. এফ. উইলকিন্স এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ হিসাব করে দেখলেন যে, উপরোক্ত সুসমতা যে ব্যবধানে পুনরাবৃত্ত হয় সে ব্যবধান নিউক্লিউটাইডগুলির পারস্পরিক ব্যবধানের থেকেও বেশি। এ ব্যাপারের যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত এই যে, নিউক্লিক এ্যাসিডের অণুর গঠন আকর্ষী গঠনের মতো (form of a helix) এবং রঞ্জনরশ্মি রচিত সুষম অংশগুলি ঐ আকর্ষীর এক একটি কুণ্ডলীর ব্যবধানে পুনরাবৃত্ত।

১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন জীববিদ্যাবিদ্ জে. ডি. ওয়াট্সন্ এবং এফ্. এইচ. সি. ক্রিক্ সমস্ত তথ্যগুলি একীভূত করে নিউক্লিক এ্যাসিড অণুর একটি আদর্শ (model) তৈরী করলেন। তাঁরা বস্তুটিকে একজোড়া পাকানো তারের (double helix) মতো কল্পনা করলেন, দুটি নিউক্লিওটাইড্ শৃঙ্খল যেন একই উল্লম্ব অক্ষে দু' রেলিং বিশিষ্ট ঘোরানো-সিঁড়ি। এই সমান্তরাল শৃঙ্খলদ্বয়ে পিউরিন্ ও পিরিমিডিন্গুলি কিভাবে সাজানো থাকে ? বস্তুটিতে সুষ্ঠু ও সুষম মাপে অবস্থিত হতে হলে, পাকানো তারের একটিতে দ্বিবলয় বিশিষ্ট একটি পিউরিন্ নিশ্চয়ই একটি একবলয় বিশিষ্ট পিরিমিডিনের মুখোমুখী অবস্থান করবে (সংশ্লিষ্ট চিত্র দ্রষ্টব্য)। পিউরিন এবং পিরিমিডিনগুলি হাইড্রোজেন যোজকে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ এবং যার ফলে পাকানো তার দুটিও পরস্পরের গ্রন্থিবদ্ধ। ওয়াট্সন এবং ক্রিক প্রমাণ করেন যে, যদি একটি শৃঙ্খলে একটি এ্যাডিনিন্ (পিউরিন্), একটি থাইমিনের (পিরিমিডিন্) এবং অপরটিতে একই ভাবে একটি গুয়ানিন্, একটি সাইটোসিনের মুখোমুখী হয়, তা'হলে সহজেই হাইড্রোজেন্ যোজকগুলির (bonds) উৎপত্তি হবে। (বস্তুতঃ, রসায়নবিদ্গণ আবিষ্কার করেছেন যে, নিউক্লিক এ্যাসিড চূর্ণ করলে প্রাপ্ত এ্যাডিনিনের পরিমাণ থাইমিনের সমান, গুয়ানিন্ এবং সাইটোসিনও সমপরিমাণে উপস্থিত থাকে)।

ওয়াট্সন্-ক্রিক কর্তৃক প্রস্তাবিত নিউক্লিক এ্যাসিডের আদর্শ পাওলিং-কোরে কর্তৃক নির্ধারিত প্রায়-অনুরূপ পাকানো তারের মতো প্রোটিন পরিগঠনের সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্তমানে এই আদর্শকে মূলতঃ সঠিক বলেই সাধারণভাবে



নিউক্লিক এ্যাসিড অণুর আদর্শ: বাম পার্শ্বের চিত্রে জোড়া পাকানো তারের মতো নিউক্লিক এ্যাসিড; মধ্যস্থলে নিউক্লিক এ্যাসিডের একাংশ বিশদভাবে দেখান হয়েছে (হাইড্রোজেন পরমাণুর অবস্থানবাদ নিয়ে); দক্ষিণ পার্শ্বে নিউক্লিওটাইড সমবায় বিশদভাবে দেখান হয়েছে।

মেনে নেওয়া হয়েছে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে পাকানো একটি তারের আকৃতি বিশিষ্ট একটি নিউক্লিওটাইড্ শৃঙ্খলের ডি. এন্. এ—যা মার্কিন জীব-পদার্থবিদ্ রবার্ট আই. সিন্‌স্‌হাইমার এক ধরনের বিষাণুতে (virus) আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু ওয়াটসন্-ক্রিক মনে করেন, তাঁদের নির্ধারিত আদর্শের পরিবর্তন না করেও এই ব্যাপারের ব্যাখ্যা সম্ভব হবে।

কোষ বিভাজনে ঠিক কি উপায়ে ক্রোমোজোমটি সমভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয় বর্তমানে সে ব্যাপারের বিশদ ব্যাখ্যা সম্ভব। কল্পনা করা যাক—ক্রোমোজোমটি সূত্রবদ্ধ অনেকগুলি ডি. এন্. এ অণুর সমষ্টি। অণুগুলি বিভাজনের প্রাথমিক পর্যায়ে পাকানো তারের মতো নিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল দুটি পরস্পর বিশ্লিষ্ট হয়। ফলে "দু'রেলিং বিশিষ্ট ঘোরানো সিঁড়ির আকৃতির" অণুগুলি "এক রেলিং বিশিষ্ট ঘোরানো সিঁড়ির" আকৃতিতে পরিবর্তিত হয়। এখন, বিশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি শৃঙ্খলই অর্ধঅণু, যেটি আপনার হারানো পূরকটি সংশ্লেষণে সমর্থ। যেখানে থাইমিন্ থাকে সেখানে একটি এ্যাডিনিন্ যুক্ত হয়, তেমনই সাইটোসিনের সঙ্গে গুয়ানিন্ মিলিত হয়—এইভাবে সংশ্লেষণের কাজ চলে। পূরক তৈরীর প্রয়োজনীয় মাল-মশলা এবং উৎসেচকগুলি কোষের মধ্যেই হাতের কাছে থাকে। অর্ধঅণুটির কাজ হয় ছাঁচের মতো—পূরকের অংশগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়মে একত্রীভূত করা। শেষ পর্যায়ে উৎপাদিত অংশগুলি যথাযথ স্থানে সন্নিবেশিত হয় এবং উক্ত অবস্থান স্থায়ী বলে অংশগুলি আর স্থানচ্যুত হয় না।

সংক্ষেপে বললে প্রত্যেকটি অর্ধ-অণুই নিজের পূরকটির উৎপাদনকার্য পরিচালনা করে এবং হাইড্রোজেন যোজকে সেটির সঙ্গে মিলিত হয়। এইভাবে একজোড়া পাকানো তারের মতো সম্পূর্ণ ডি. এন্. এ অণুগুলির উৎপত্তি এবং পূর্বে যেখানে একটি মাত্র অণু ছিল সেখানে বিভাগের ফলে উৎপন্ন দুইটি অর্ধ-অণু দুইটি পূর্ণ অণুর সৃষ্টি কার্য সম্পন্ন করে। সারা ক্রোমোজোমে লম্বালম্বি ভাবে অবস্থিত ডি এন্. এ-গুলি এইভাবে দ্বিগুণিত হওয়ায় দুইটি ক্রোমোজোমের সৃষ্টি হয়, যে দুইটি উৎপন্নকারী ক্রোমোজোমের অনুরূপ এবং যথাযথ অনুকৃতি। সময় সময় অবশ্য কিছু অঘটন ঘটতে পারে ; কোনো পারমাণু-বিকোত্তর কণার (subatomic particles) সংঘাত তেজসমন্বিত বিকীরণ অথবা কোনো রাসায়নিক পদার্থের মধ্যবর্তিতার ফলে নতুন ক্রোমোজোমটির কোথাও না কোথাও একটি বিকৃতির সৃষ্টি হয়। ফলে পরিব্যক্তির (mutation) উদ্ভব।

এই ধরনের ক্রোমোজোম অনুকৃতি সৃষ্টির স্বপক্ষে বর্তমানে বহু প্রমাণ

পুঞ্জীভূত হচ্ছে। 'অনুসন্ধানী' (tracer) পর্যালোচনায়, ভারী নাইট্রোজোনের সাহায্যে ক্রোমোজোমকে চিহ্নিত করে কোষ বিভাজনের সময় চিহ্নিত বস্তুটির পরিণতি নিরীক্ষণ করে উপরোক্ত তত্ত্বের স্বপক্ষে প্রমাণ মিলেছে। তা'ছাড়া অণুকৃতি রচনায় অংশগ্রহণকারী কয়েকটি প্রয়োজনীয় উৎসেচকও সনাক্ত করা হয়েছে।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয়-বংশজ মার্কিন জীবরসায়নবিদ্ সেভেরো ওকোয়া এক ধরনের ব্যাক্টেরিয়া (Aztobacter vinelandii) থেকে একটি উৎসেচক পৃথক করেন, যেটি নিউক্লিওটাইড থেকে আর. এন্. এ উৎপাদনে অনুঘটকের (catalyse) কাজ করে বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ওকোয়ার প্রাক্তন ছাত্র আর্থার কোর্ণ-বার্গ আর একটি উৎসেচক আবিষ্কার করেন (Escherichia coli নামক ব্যাক্টেরিয়া থেকে), যেটি নিউক্লিওটাইড থেকে ডি. এন্. এ উৎপাদনে অনুঘটকের কাজ করতে সক্ষম। ওকোয়া নিউক্লিও-টাইড থেকে আর. এন্. এর মতো অণু এবং কোর্ণবার্গ ডি. এন্. এর্ মতো অণু সৃষ্টির কাজে অগ্রসর হলেন। (১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দু'জনে একত্রে ভেষজতত্ত্ব ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন)। কোর্ণবার্গ আরো প্রমাণ করেন যে, তাঁর আবিষ্কৃত উৎসেচকটিতে কিছু পরিমাণ স্বাভাবিক ডি. এন্. একে ছাঁচ হিসাবে যুক্ত করলে, সেটি স্বাভাবিক ডি. এন্. এরই অনুরূপ। এক ধরনের অণু সৃষ্টিতে সহজেই অনুঘটকের কাজ করতে পারে ওয়াট্‌সন্ ক্রিক্ প্রস্তাবিত অনুকৃতি গঠনবিধির স্বপক্ষে এই তথ্যই এখনও পর্যন্ত সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।

নিউক্লিক :এ্যাসিড কিভাবে একটি বিশেষ উৎসেচক অর্থাৎ প্রোটিন সংশ্লেষণ সম্পন্ন করে? একটি প্রোটিন সৃষ্টির জন্য কয়েক শত বা কয়েক সহস্র এ্যামিনো এ্যাসিড একক সমন্বিত অণুকে একটি সুনির্দিষ্ট ধাঁচে শৃঙ্খলিত হবার নির্দেশ দিতে হয়। প্রত্যেকটি অবস্থানের জন্য, ১৯টি বিভিন্ন এ্যামিনো এ্যাসিডের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট এ্যামিনো এ্যাসিড অবশ্যই নির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন। যদি ডি. এন. এ. অণুতে ১৯টি বিভিন্ন একক যথাক্রমে বর্তমান থাকত, তবে ব্যাপারটা সহজ হত। কিন্তু ডি. এন. এ. অণুটি মাত্র চারটি মূল বস্তু—চারটি নিউক্লিওটাইড দ্বারা গঠিত। এই ব্যাপারটা চিন্তা করেই জ্যোতির্বিদ জর্জ গ্যামো ইঙ্গিত করেন যে, নিউক্লিওটাইডগুলি বিভিন্ন সমবায়ে সংকেতের কাজ করে (ঠিক যেমন মর্স-সংকেতে (Morse Code) টরে-টক্কা

ধ্বনির বিভিন্ন সমবায়ে বর্ণমালা, সংখ্যা ইত্যাদি বোঝায়)। চারটি নিউক্লিও-টাইডের মধ্যে একত্রে তিনটি করে ধরলে মোট ২০টি বিভিন্ন সমবায় যে সম্ভব, সেদিকে গ্যামো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে গ্যামো (এবং ক্রিক নিজেও) এককালীন তিনটি নিউক্লিওটাইড একত্রে নিয়ে ১৯টি বিভিন্ন এ্যামিনো এ্যাসিডের সামঞ্জস্যে বিভিন্ন সংকেতগুলি গড়ে তোলেন। ডি. এন্. এ. শৃঙ্খলে প্রত্যেকে তিনটি নিউক্লিওটাইডের সমবায় একটি নির্দিষ্ট এ্যামিনো এ্যাসিডকে মনোনীত করে এবং এইভাবে সেই বিশেষ ডি. এন্. এর নিউক্লিওটাইড গুচ্ছগুলির অনুবৃত্তি প্রোটিন শৃঙ্খলে এ্যামিনো এ্যাসিডগুলির অবস্থান নির্দেশনার ধাচ হিসাবে কাজ করে।

মার্কিন জীবরসায়নবিদ্ ম্যাহলোন, বি. হোগ্‌ল্যাণ্ড আর. এন্. একে এই তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করায় অগ্রসর হন। তিনি ইঙ্গিত দেন যে, ডি. এন্. এটি অনুরূপ আর. এন্. এ উৎপাদনে ছাঁচের কাজ করে এবং উৎপাদিত আর. এন্. এ-টিই প্রোটিন নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধান করে। যে কোষগুলি প্রোটিন উৎপাদনে বিশেষ প্রক্রিয়া, সেগুলিতে আর. এন্. এ'র প্রাচুর্য লক্ষ্য করে, বহু প্রাণরসায়নবিদ্ এই তত্ত্বের সমর্থনে তার বিবরণ দান করেছেন।

হোগ্‌ল্যাণ্ড এবং তাঁর সহযোগীবৃন্দ আবিষ্কার করেন যে, কোষের সাইটো-জমে কিছু আর. এন্. এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রবণীয় অংশরূপেও বিরাজমান। এই ক্ষুদ্র অণুগুলির এ্যামিনো এ্যাসিডগুলিকে যুক্ত করার প্রবল প্রবণতা দেখা যায়। হোগ্‌ল্যাণ্ড এইগুলির নাম দেন "স্থানান্তরিত আর এন্. এ (transfer RNA) এবং তাঁর ধারণা অনুযায়ী এইগুলি প্রত্যেকটি এমনভাবে গঠিত যে, এক একটি নির্দিষ্ট এ্যামিনো এ্যাসিড মাত্র এগুলিতে যুক্ত হয়—অন্য এ্যামিনো এ্যাসিড হয় না। এই স্থানান্তরিত আর এন্. এ অণুগুলি এ্যামিনো এ্যাসিড অণুগুলি সমেত নিউক্লিক এ্যাসিড ছাঁচে (সম্ভবতঃ মিটোকোন্‌ড্রিয়ায় অবস্থিত একটি বৃহৎ আর. এন্. এ অণুতে) মিলিত হয়, যেটি এ্যামিনো এ্যাসিড সমেত এইগুলিকে যথা বিশেষ সজ্জায় সাজিয়ে দেয়। এ্যামিনো এ্যাসিডগুলি পরস্পরের সমবায়ে প্রোটিন উৎপন্ন করার পর স্থানান্তরিত আর. এন্. এ অণু-গুলির সংস্রব ত্যাগ করে। এইগুলিও ছাঁচ থেকে বিচ্যুত হয়ে পরে নতুন করে উক্ত পুনর্নির্মাণের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে।

জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কোষকেন্দ্রের ও সাইটোপ্লাজম্ ডি. এন্. এ ও আর. এন্. এ. নিউক্লিক এ্যাসিড ও প্রোটিনের এই ভাঙ্গাগড়ার

চেয়ে অধিকতর উত্তেজনাময় এবং আকর্ষণীয় অন্য কোনোও তত্ত্ব আজও উপস্থাপিত হয়নি।

প্রাণের উৎপত্তি

প্রাণের উৎসের আমাদের যত কাছে উপস্থিতি সম্ভব, নিউক্লিক এ্যাসিড অণুতে আমরা উৎসের তত কাছেই উপস্থিত হই। এটি অবশ্যই প্রাণের আদিম বস্তু। ডি. এন্. এ. ব্যতিরেকে জীবের জনন সম্ভব নয় এবং আমাদের বিদিত প্রাণের শুরুও সম্ভব হত না। জীবিত বস্তুর সব কিছুই উৎসেচকগুলি এবং অন্যান্য বস্তুগুলি যেগুলির উৎপাদনে উৎসেচকগুলি অনুঘটকের কাজ করে—বিশ্লেষণে ডি. এন্. এ'র উপর নির্ভরশীল বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে সব কিছুর শুরু কিভাবে হয়েছিল ?

যেহেতু প্রাণোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে প্রশ্নটি পৃথিবী বা বিশ্বোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধীয় প্রশ্নের চেয়েও আরও কঠোরভাবে ধর্ম বিশ্বাস নিয়ন্ত্রিত ছিল, সেহেতু বৈজ্ঞানিকগণ উপরোক্ত প্রশ্নটি উত্থাপনে বহুকাল ইতস্ততঃ করেছেন। এখনও প্রশ্নটি দ্বিধাগ্রস্তভাবে সবিনয়ে আলোচিত হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু কাল আগে প্রকাশিত রুশ প্রাণরসায়নবিদ এ. আই. ওপারিন্ লিখিত পুস্তক "প্রাণের উৎপত্তি" (The Origine of Life) বিষয়টিকে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করেছে। ১৯২৪ সালে পুস্তকটি সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৩৬ সালে তার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকটিতেই সর্বপ্রথম বিশদভাবে সম্পূর্ণ জড়বাদের দৃষ্টিতে প্রাণোৎপত্তির সমস্যাগুলি আলোচিত হয়েছিল। এই ব্যাপারে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ, যে ধর্মীয় অনুশাসনে পশ্চিমী জগত আবদ্ধ রাশিয়া তার অধীন নয়।

মানুষের আদিম কৃষ্টি বিকাশের প্রায় সবক্ষেত্রেই পুরাণে ঈশ্বর অথবা দানব কর্তৃক প্রথম মানব সৃষ্টির (কখনও কখনও অন্য নানা জীবও) কাহিনী গড়ে উঠেছিল। যাই হোক, প্রাণের সৃষ্টির সবক্ষেত্রেই দেবতাদের একচেটিয়া বলে মনে করা হয়নি। অন্ততঃ নিম্নস্তরের প্রাণগুলি অতিপ্রাকৃত হস্তক্ষেপ ব্যাতিরেকেই জড়বস্তু থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপত্তি লাভ করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, পচনশীল মাংস থেকে কীট পতঙ্গাদির,

কাদা থেকে ব্যাঙের এবং পচা গম থেকে ইঁদুরের উৎপত্তি হতে পারে। বাস্তব পর্যবেক্ষণের ফলেই এই ধারণাগুলির উৎপত্তি। কারণ, অত্যন্ত সুপরিজ্ঞাত উদাহরণ হচ্ছে, পচনশীল মাংসে হঠাৎ প্রকৃতই কৃমি কীটের আবির্ভাব ঘটে। এ কথা মনে করা অত্যন্তই স্বাভাবিক ছিল যে, পচনশীল মাংসই কৃমি কীটের উৎপত্তির কারণ।

এ্যারিস্টোটল্ "স্বতঃস্ফুর্ত জননে" বিশ্বাস করতেন। টমাস এ্যাকুইনাসের মতো মধ্য-যুগীয় আরও অনেক ধর্মতাত্ত্বিকরাও এই ব্যাপার বিশ্বাস করতেন। তেমনই বিশ্বাস করতেন উইলিয়াম হার্ভে এবং আইজাক নিউটনও। অন্ততঃ নিজের চোখকে ত আর অবিশ্বাস করা চলে না।

ইতালীয় চিকিৎসক ফ্রান্সিস্কো রেডি সর্বপ্রথম এই প্রচলিত বিশ্বাসকে পরীক্ষাধীন করলেন। পচনশীল মাংস থেকে সত্যই কৃমিকীট জন্মায় কিনা, ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত করলেন। তিনি এক সারি পাত্রের প্রত্যেকটির মধ্যে কয়েক টুকরো করে মাংস খণ্ড রাখলেন, এর পরে কয়েকটি পাত্র সূক্ষ্ম বস্ত্র খণ্ড (Gauge) দ্বারা বদ্ধ করলেন এবং কয়েকটি খোলা রাখলেন। শুধুমাত্র সেই খোলা পাত্রগুলিতে কৃমিকীটের জন্ম হল, যেগুলিতে মক্ষিকাদের প্রবেশ অবাধ ছিল। রেডি সিদ্ধান্ত করেন যে, মক্ষিকা প্রসূত অণুবীক্ষণিক ক্ষুদ্র ডিম থেকেই কৃমিকীটের উৎপত্তি। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, মক্ষিকা বা তাদের ডিমের অনুপস্থিতিতে মাংসে কৃমিকীটের উৎপত্তি সম্ভব নয়—তা সে যত দীর্ঘদিনেরই গলিত পচনশীল মাংস হোক না কেন।

রেডির অনুসরণকারী গবেষকগণও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন এবং মৃত বস্তু থেকে দৃশ্যমান জীবোৎপত্তির বিশ্বাস বিনাশপ্রাপ্ত হল। কিন্তু রেডির মৃত্যুর কিছুকাল পরে যখন জীবাণু আবিষ্কৃত হল, বহু বিজ্ঞানীই সিদ্ধান্ত করলেন যে, অন্ততঃ এই ধরনের জীবনের উৎপত্তি নিশ্চয়ই মৃত বস্তু থেকে। এমন কি বস্ত্রাবৃত পাত্রেও মাংস খণ্ডগুলি শীঘ্রই জীবাণুতে পুর্ণ হয়ে যেত। রেডির গবেষণার পরও দুই শতাব্দী ধরে এই বিশ্বাস জাগ্রত রইল যে, জীবাণুসমূহের স্বতঃস্ফুর্ত জনন সম্ভব।

আর একজন ইতালীয় প্রকৃতিবিদ্ ল্যাজারো স্প্যালান্জানী প্রথম এই ধারণার উপর গভীরভাবে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মণ্ড (broth) ভর্তি দুই সারি পাত্র রাখলেন। এক সারির পাত্রগুলি বায়ু চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রইল। অপর সারির পাত্রগুলি তিনি মণ্ড সমেত ফুটিয়ে নিলেন,

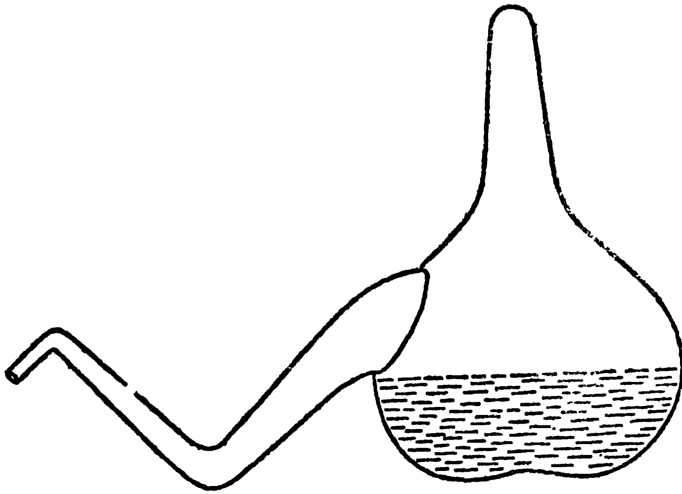
যাতে তার মধ্যে কোনোও জীবাণুর অস্তিত্ব না থাকে এবং তারপর সেগুলির মুখ ভালো করে বন্ধ করে দিলেন, যাতে বাতাসে ভাসমান জীবাণুসমূহ তার মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। প্রথম সারির পাত্রগুলি শীঘ্রই জীবাণুতে ভর্তি হয়ে গেল, কিন্তু যে পাত্রগুলি মণ্ড সমেত ফোটান হয়েছিল এবং মুখবন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি জীবাণু শূন্য রইল। এই পরীক্ষায় স্প্যালান্‌জানী নিশ্চিত হলেন যে, জড় পদার্থ থেকে আণুবীক্ষণিক জীবের উৎপত্তিও সম্ভব নয়।

স্বতঃস্ফুর্ত জনন-তত্ত্বের সমর্থকেরা কিন্তু নিশ্চিত হলেন না। তাঁরা বললেন, ফোটানর ফলে প্রাণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় কোনো কিছু (Vital principle) নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলেই স্প্যালান্‌জানীর ফোটান মুখবন্ধ পাত্রে জীবাণু সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে পাস্তুরই শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটার চূড়ান্ত নিস্পত্তি করেন। তিনি এক ধরনের ফ্লাস্ক তৈরী করেন, যার হাঁসের গলার মতো নলটি অনুভূমিক S আকৃতির। এই নলের খোলা মুখটি দিয়ে ফ্লাস্কে বাতাস প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু ধূলিকণা ও জীবাণুর পক্ষে বক্র নলটি ছাঁকনির কাজ করায় সেগুলি ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় না। পাস্তুর ফ্লাস্কে মণ্ড পুরে যতক্ষণ না বাষ্পের সৃষ্টি হল ততক্ষণ ফোটালেন (মণ্ডে এবং ফ্লাস্কের নলে কোনো জীবাণুর অস্তিত্ব থাকলে সে গুলিকে ধ্বংস করার জন্য) তারপর ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করে রইলেন। মণ্ডটি জীবাণুশূন্য রইল। বাতাসে প্রাণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় কিছু নেই। পাস্তুরের পরীক্ষায় দৃশ্যতঃ স্বতঃস্ফূর্ত জননতত্ত্ব চির-সমাধি লাভ করল।

এইসব ব্যাপারের ফলে বৈজ্ঞানিকেরা বিব্রত বোধ করলেন। স্বতঃস্ফূর্ত জনন বা দৈব সহায়তায় যদি নাই হয়ে থাকে তা'হলে বাস্তবিকই প্রাণোৎপত্তির রহস্যটা কি?

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কিছু সংখ্যক তাত্ত্বিক অন্যভাবে চরমপন্থী হলেন, তাঁদের মতে প্রাণ অনাদি অনন্ত। সবচেয়ে জনপ্রিয় মতের প্রবক্তা হচ্ছেন —ভান্তি আরহেনিয়াস (যে রসায়নবিদ্ আয়নতত্ত্ব—concept of ionization আবিষ্কার করেন) ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি পুস্তক প্রকাশ করেন, যার নাম "সৃজনশীল পৃথিবী" (Worlds in the Making)। এই পুস্তকে কল্পনা করা হয়েছে যে, প্রাণ অনাদি যা মহাশূন্যে সর্বদা পরিবাহিত হয়ে নতুন নতুন গ্রহে

বিকাশ লাভ করে। স্পোরের (spore) আকৃতিতে এগুলি যথেচ্ছ ভ্রমণে গ্রহের বায়ুমণ্ডল হতে বহির্গত হয় এবং পরে সূর্যালোকের চাপে মহাশূন্যে পরিবাহিত হয়। স্পোরগুলি আন্তর্তারকামণ্ডলীয় মহাশূন্যে (interstellar space) আলোকের চাপে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ পথে—হয় বিনাশপ্রাপ্ত হয়, না হয় কোনোও গ্রহে উপস্থিত হয়। যদি সে গ্রহে প্রাণের পূর্ব অস্তিত্ব থাকে তাহলে স্পোরগুলি সক্রিয় হয়ে সেগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় অথবা যদি গ্রহটি বাসযোগ্য হয়েও প্রাণহীন অবস্থায় থাকে তবে সেখানে প্রাণ সঞ্চার করে।



স্বতঃস্ফূর্ত-জনন সংক্রান্ত গবেষণায় ব্যবহৃত পাস্তুরের ফ্লাস্ক

প্রথম দৃষ্টিতে তত্ত্বটিকে চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়। ব্যাকটিরিয়ার স্পোরগুলি শক্ত আবরণীযুক্ত হওয়ায় শৈত্য এবং শুষ্কতা উভয়ই প্রতিরোধে সক্ষম এবং বায়ুশূন্য মহাশূন্যে এইগুলির বহুদিন জীবিত থাকাও সম্ভব। এইগুলির আকৃতিও এমন যে, মহাকর্ষের প্রভাবে সূর্যাভিমুখী হওয়া অপেক্ষা বিকীরণের চাপে বিপরীতমুখী হওয়ার শৈত্য এবং শুষ্কতা উভয়ই প্রতিরোধে সক্ষম এবং বায়ুশূন্য মহাশূন্যে এইগুলির বহুদিন জীবিত থাকাও সম্ভব। এইগুলির আকৃতিও এমন যে, মহাকর্ষের প্রভাবে সূর্যাভিমুখী হওয়া অপেক্ষা বিকীরণের চাপে বিপরীতমুখী হওয়ার পক্ষে এগুলি অধিকতর উপযোগী। কিন্তু অতিবেগুনী আলোর আক্রমণে আরহেনিয়াসের তত্ত্ব ভূলুন্ঠিত হল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে গবেষণা

কারীগণ প্রমাণ করেন যে, ব্যাক্‌টিরিয়ার স্পোরগুলি অতিবেগুনী আলোকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং আন্তগ্র্রহমণ্ডলীয় মহাশূন্তে (interplanetary space) সূর্যের অতিবেগুনী আলোর প্রাখর্য অত্যধিক। তা'ছাড়াও আছে অন্যান্য ক্ষতিকারক বিকিরণ, যেমন—মহাজাগতিক রশ্মি, সৌর রঞ্জন-রশ্মি এবং আহিত কণিকার ক্ষেত্র, যেমন—পৃথিবী পরিবেষ্টনকারী ভ্যান এ্যালেন বলয় (Van Allen belt)। হতে পারে এমন স্পোর আছে, যা বিকীরণ সংরোধক, কিন্তু প্রোটিন ও নিউক্লিক এ্যাসিড দ্বারা গঠিত যে সকল স্পোর আমাদের জ্ঞানগোচর সেগুলি নিশ্চয়ই সে পর্যায়ে পড়ে না।

আবার পৃথিবীতে প্রাণোৎপত্তির রহস্য নির্ধারণ সমস্যায় ফিরে আসা যাক্ এবং স্বতঃস্ফূর্ত জনন তত্ত্বটি পুনর্বিচার করা যাক। কোটি কোটি বছর আগে পার্থিব আবেষ্টনে কি স্বতঃস্ফূর্ত জননে প্রাণোৎপত্তি সম্ভব ছিল?

পৃথিবীর আদিম অবস্থায় বায়ুমণ্ডল নিশ্চয়ই বর্তমানের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। বায়ুমণ্ডলে নিশ্চিতই তখন মুক্ত অক্সিজেনের কোনোই চিহ্ন ছিল না। কিন্তু যে সকল পদার্থে সূর্য গঠিত পৃথিবীর উৎপত্তিও যদি সেইসব পদার্থে হয়ে থাকে তা'হলে সম্ভবতঃ অন্যান্য মৌল পদার্থের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় হাইড্রোজেন প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল, কারণ ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুসমূহের দশভাগের নয় ভাগ হাইড্রোজেন। সম্ভবতঃ, বায়ুমণ্ডলে ছিল হাইড্রোজেন মিশ্রিত গ্যাস—যেমন জলীয় বাষ্প (H_2O), এ্যামোনিয়া (NH_3) এবং মিথেন (CH_4) প্রভৃতি।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "গ্রহসমূহ" (The Planets) নামক পুস্তকে উরে বলেছেন যে, পৃথিবী ক্রমে ঠাণ্ডা হলে জলীয় বাষ্প জমে সমুদ্রগুলির সৃষ্টি হল এবং যে বায়ুমণ্ডল অবশিষ্ট রইল তা মুখ্যতঃ এ্যামোনিয়া ও মিথেন যোগে গঠিত। বর্ণালী বিশ্লেষণ বিষয়ক তথ্যগুলি (spectroscopic data) থেকে জানতে পারি যে, সৌরজগতের বাইরের দিকের গ্রহগুলির বায়ুমণ্ডলে এ্যামোনিয়া ও মিথেনের অস্তিত্ব রয়েছে।

কিছু বৈজ্ঞানিক এই মতবাদের বিরোধী। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার ডব্লিউ ডব্লিউ রুবে'র মতে পৃথিবীর আদিম অবস্থায় বায়ুমণ্ডল কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেনে গঠিত ছিল। মঙ্গল ও শুক্র গ্রহে বর্তমানে এই ধরনের বায়ুমণ্ডলই দেখা যায় এবং উল্কাপিণ্ডগুলিতে আবদ্ধ গ্যাসগুলিও মুখ্যতঃ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন। কিন্তু এই দুটো তত্ত্ব বোধহয় পুরোপুরি

অসমঞ্জস নয়। হয়তো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আদিতে জলীয় বাষ্প এ্যামোনিয়া এবং মিথেন দ্বারা গঠিত ছিল, পরে তা পরিবর্তিত হয়ে কার্বনডাই-অক্সাইড্ ও নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত হয়। জলীয় বাষ্প উর্ধ্ব-বায়ুমণ্ডলে পৌঁছে সূর্যের অতিবেগুনী আলোয় অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে বিশ্লিষ্ট হয়। হাইড্রোজেন মহাশূন্যে পলাতক হয় এবং মুক্ত অক্সিজেন পড়ে থাকে। এই মুক্ত অক্সিজেন পরে সম্ভবতঃ মিথেনের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় জল এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও এ্যামোনিয়ার সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় জল এবং নাইট্রোজেন সৃষ্টি করে :



$$2O_2+CH_4 \rightarrow CO_2+2H_2O$$



$$3O_2+4NH_3 \rightarrow 2N_2+6H_2O$$

জল সমুদ্রে মিশে যায় এবং বায়ুমণ্ডলে পড়ে থাকে কার্বনডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন। এইভাবে উরে কল্পিত বায়ুমণ্ডল ধীরে ধীরে রুবে কল্পিত বায়ুমণ্ডলে পরিবর্তিত হয়।

এ্যামোনিয়া ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড জলে দ্রবণীয়। সুতরাং বায়ুমণ্ডলে যখন উপরোক্ত ধরনে পরিবর্তন হচ্ছিল তখন সমুদ্রের জল ছিল উষ্ণ এবং দ্রবীভূত এ্যামোনিয়া এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাষ্পে পরিপূর্ণ। ওজনের (Ozone) স্বল্পতা হেতু বায়ুমণ্ডলের আবরণ ক্ষমতা কম থাকায় সমুদ্র পৃষ্ঠে সম্ভবতঃ সৌর-বিকিরিত অতিবেগুনী আলোর তেজ ছিল বর্তমানের তুলনায় প্রখরতর এবং পৃথিবীতে তখনও তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রাচুর্য ছিল। এই অবস্থায় কি জৈব পদার্থের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল ?

সূর্যের প্রখর অতিবেগুনী আলো এবং তখনও পর্যন্ত পৃথিবীর সক্রিয় তেজস্ক্রিয়তা প্রয়োজনীয় শক্তি জুগিয়েছিল। এ্যামোনিয়া, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং সমুদ্রে দ্রবীভূত অন্যান্য যৌগিক পদার্থ সমূহ উৎস পদার্থরূপে কাজ করেছিল।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন প্রাণ-রসায়নবিদ্‌গণ পরীক্ষা শুরু করেন। ক্যালিফোর্নিয়ার মেলভিন ক্যালভিন্ (সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার গবেষক) জল, হাইড্রোজেন এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মিশ্রণের মধ্যে উচ্চশক্তির বিকিরণ প্রেরণ করেন। এই পরীক্ষায় শক্তিগ্রাহী রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং সরল অণুগুলি জটিলতর অণুগুলিতে পরিবর্তিত হয় ব'লে তিনি লক্ষ্য করেন। কার্বন-ডাই অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন মিলিত হয়ে প্রথমে এক কার্বন বিশিষ্ট ফরমালডিহাইড্ (CH_2O)-এর সৃষ্টি করে, পরে দুই কার্বন

বিশিষ্ট এ্যাসেটিক্ এ্যাসিডের (CH_3COOH) সৃষ্টি হয়। ক্যালভিন্ যখন এ্যাসেটিক্ এ্যাসিড ও জলের দ্রবণে বিকিরণ প্রেরণ করেন তখন চারটি কার্বন বিশিষ্ট সাক্‌সিনিক্ এ্যাসিড ($HOOCCH_2CH_2COOH$) পাওয়া গেল।

উরের গবেষণাগারে স্নাতক ছাত্র স্টানলী এল্. মিলার ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি জল এবং উরে কল্পিত আদি বায়ুমণ্ডল অর্থাৎ এ্যামোনিয়া, মিথেন এবং হাইড্রোজেনের মিশ্রণ তড়িৎ প্রবাহের অধীনে সংবাহিত করলেন (সূর্যের অতিবেগুনী বিকিরণের পরিবর্ত হিসাবে)। সপ্তাহের শেষে তিনি দ্রবণটি কাগজী বর্ণরেখচিত্রের (Paper Chromatography) সাহায্যে বিশ্লেষণ করে ক্যালভিন্ পরিলক্ষিত সরল বস্তুগুলি ছাড়াও গ্লাইসিন্ (glycine) ও অ্যালানিন (alanine) নামে দুইটি সরল এ্যামিনো এ্যাসিড এবং আরও দুই একটি জটিলতর এ্যামিনো এ্যাসিডের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন।

এইসব পরীক্ষার ফলে এই বিশ্বাস গভীর হল যে, পৃথিবীর আদিতে উষ্ণ সমুদ্র এবং অক্সিজেনহীন বায়ুমণ্ডলে সৌর এবং তেজস্ক্রিয় শক্তির প্রভাবে জটিল থেকে জটিলতর জৈব অণুগুলির সৃষ্টি হয়েছিল।

এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই সকল পরীক্ষায় প্রথমজাত যৌগিক পদার্থগুলির মধ্যে দুইটি—এ্যাসেটিক এ্যাসিড ও গ্লাইসিনের সাহায্যেই জীব পরফাইরিন চক্র (porphyrin ring) গঠন করে। মৃত সমুদ্রে এই দুটির সংমিশ্রণেই পরফাইরিন চক্রের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। এইরূপ ঘটনা নিশ্চিতই প্রাণোৎপত্তির সুদৃঢ় ধাপ ; কারণ, অতি প্রয়োজনীয় উৎসেচকগুলির কতকগুলিতে পরফাইরিন বর্ণগুলিরই সক্রিয় অংশ। তাছাড়া সালোক সংশ্লেষ (photosynthesis) পরিচালনার মুখ্য যৌগিক পদার্থ ক্লোরোফিলও (Chlorophyll) এক ধরনের পরফাইরিন।

এ ছাড়াও জীব ফরমিক এ্যাসিড বর্গের পদার্থ কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং গ্লাইসিনের থেকে পিউরিন্ এবং পিরিমিডিন্‌গুলি গঠন করে। সেগুলিও সমুদ্রে সংশ্লেষিত হয়ে থাকতে পারে।

প্রাণের অস্তিত্বশূন্য সমুদ্রে যে কোনো যৌগিক পদার্থ উৎপাদিত হলে তার বিনাশের সম্ভাবনা না থাকায় তা ক্রমশঃই সঞ্চিত হতে থাকবে। ছোট বা বড় কোনো জীবেরই অস্তিত্ব ছিল না, যা এগুলিকে আহার্য হিসাবে ব্যবহার করবে অথবা এগুলির ক্ষয়ের কারণ হবে। তা'ছাড়া বায়ুমণ্ডলের আদিম অবস্থায়

অণুগুলিকে জারণ (Oxidise) বা বিভাজনের জন্য মুক্ত অক্সিজেনের অস্তিত্ব ছিল না। একমাত্র যে অতিবেগুনী আলো এবং তেজস্ক্রিয় শক্তি এই জটিল অণুগুলিকে গড়ে তুলেছিল, সেই দুটিই এ'গুলির বিভাজনের সম্ভাব্য বস্তু ছিল। কিন্তু সমুদ্র স্রোত তাড়িত সেই অণুগুলির অধিকাংশ হয়ত নিরাপদ দূরত্বে গভীর সাগরের মাঝখানে উপস্থিত হয়েছিল, যেখানে সমুদ্র পৃষ্ঠের অতি-বেগুনী আলোর বিকিরণ বা তলদেশের তেজস্ক্রিয় বিকীরণ অনুপস্থিত।

এ কথা কল্পনা করার কোনোও যুক্তিসঙ্গত বাধা নেই যে, কালক্রমে জটিলতর এ্যামিনো এ্যাসিডগুলির এবং সরল শর্করাগুলির উত্তরোত্তর ঘনসমাবেশ ঘটেছিল। এ্যামিনো এ্যাসিডগুলি মিলিত হয়ে পেপটাইডের সৃষ্টি হয়েছিল; পিউরিন্, পিরিমিডিন্, শর্করা এবং ফস্ফরাস সমন্বিত যৌগিক পদার্থগুলির সমবায়ে নিউক্লিওটাইডগুলির উৎপত্তি হয়েছিল এবং ক্রমে যুগযুগান্ত ধরে প্রোটিন ও নিউক্লিক এ্যাসিডগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। অবশেষে এসেছিল চূড়ান্ত পর্যায়— আকস্মিক কোনো মিলনের ফলে সৃষ্ট হয়েছিল নিউক্লিক এ্যাসিড অণু—যা নিজের অনুকৃতি সৃষ্টিতে সক্ষম। সেই মুহূর্তটিতেই প্রাণের শুরু।

এইভাবে প্রাণের অভিব্যক্তির পূর্বে ঘটেছিল "রাসায়নিক অভিব্যক্তি।" জীবিত অণু—আপন অনুকৃতি সৃষ্টিতে সক্ষম জটিল নিউক্লিও-প্রোটিনের এই আকস্মিক উৎপত্তির তত্ত্ব যদি একান্তই অবাস্তব বলে মনে হয়, তবে মনে রাখতে হবে যে, বহু যুগ ধরে ধাপে ধাপে এর উৎপত্তি হয়েছে। কঠিন বস্তু হিসাবে পৃথিবীর বয়স নিশ্চিতভাবেই চারশো কোটি বছর। আমাদের জ্ঞাত সবচেয়ে পুরনো জীবাশ্মের (fossil) বয়স ৫০ কোটি বছরের বেশি নয়। যদি ধরে নেওয়া যায় জীবাশ্মের মতো জটিল প্রাণ সৃষ্টি হতে অন্ততঃ তার তিন গুণ সময়ও লেগেছে (বেশি করেই ধরা হল) তাহলে পৃথিবীতে প্রাণের শুরু দুশো কোটি বছর আগে। সে ক্ষেত্রে আরও দুশো কোটি বছর অবশিষ্ট রইল প্রাথমিক রাসায়নিক অভিব্যক্তির জন্য। দুশো কোটি বছরে অনেক কিছুই ঘটতে পারে।

মনে হয় একটি মাত্র জীবিত অণুই প্রাণ সৃষ্টির এবং সারা জগতের জীবিত বস্তুর সৃষ্টি কার্য শুরুর পক্ষে যথেষ্ট, ঠিক যেমন একটিমাত্র নিষিক্ত কোষ বিরাট ও জটিল জীব সৃষ্টি করে। তৎকালীন সমুদ্র যা কার্যতঃ ছিল জৈব বস্তুর দ্রবণ, সেখানে প্রথম জীবিত অণুটি অল্প সময়ের মধ্যেই আপন অনুকৃতিতে কোটি

কোটি অণুর সৃষ্টি করেছিল। কচিৎ কোনো পরিব্যক্তির ফলে সামান্য পরিবর্তিত ধরনের অণুর সৃষ্টি হ'ত এবং তার মধ্যে যেগুলি অন্যগুলি অপেক্ষা কোনো ব্যাপারে অধিকতর শ্রেষ্ঠ ছিল, সেগুলি প্রতিবেশীগুলির বিনাশসাধন করে নিজেদের বংশবৃদ্ধি করত এবং এইভাবে পুরণো ধরনের কিছু অণু নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। যদি কোনো একদল অণু উষ্ণ জলে অধিকতর উপযোগী এবং অন্য একদল শীতল জলের উপযোগী হত তবে উভয়েই মাত্র নিজ নিজ উপযোগীতম পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বৃদ্ধিলাভ করত। এইভাবে জৈব অভিব্যক্তির (Organic evolution) গতির সূচনা হয়েছিল।

যদি আদিতে পরস্পর নিরপেক্ষভাবে একাধিক অণুর সৃষ্টি হয়েও থাকে, তাহলেও সম্ভবতঃ সবচেয়ে ক্রিয়াশীল অণুটি প্রজননে অন্যান্য অণুগুলিকে পরাজিত করে এবং যেভাবেই হোক বর্তমান জীবসমূহ সকলেই সম্ভবতঃ মাত্র একটি আদিম অণু হতে জাত। বর্তমানে জীবিত প্রাণীসমূহে বিরাট বৈষম্য সত্ত্বেও সকলেই মৌল বিষয়ে অভিন্ন। প্রত্যেক প্রাণীর কোষই একই ধরনের বিপাক ক্রিয়ার অধীন। তাছাড়া এই ব্যাপারটা সম্ভবতঃ তাৎপর্যপুর্ণ যে, সমস্ত জীবিত প্রাণীর প্রোটিনই বামাবর্তী এ্যামিনো এ্যাসিডগুলি দ্বারা (L-amino acids) গঠিত—দক্ষিণাবর্তী এ্যামিনো এ্যাসিড (D-amino acid) দ্বারা নয়। সম্ভবতঃ, যে আদিম অণু থেকে প্রাণের উৎপত্তি সেটি দৈব সংঘটনে L-এ্যামিনো এ্যাসিডগুলি দ্বারা গঠিত হয়েছিল এবং যেহেতু D-অ্যাসিডের অণু L-অ্যাসিডের অণুর সঙ্গে কোনো সুদৃঢ় শৃংখলে মিলিত হতে পারে না, সেই হেতু দৈবে যার শুরু, আপন অনুকৃতি সৃষ্টির মাধ্যমে আজ তা সর্বজনীন রূপে পরিণত।

শক্তিগ্রাহী প্রাণক্রিয়াগুলি চালু রাখার জন্য সকল রকম প্রাণের প্রধান প্রয়োজন, শক্তি। বর্তমানে প্রাণীরা প্রধানতঃ শক্তি উৎপাদক বিক্রিয়ায়—যথা কার্বোহাইড্রেট ও চর্বি (Fats) জাতীয় খাদ্যকে জারিত (Oxidised) করে, মুক্ত শক্তি ব্যবহার করে। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় মুক্ত অক্সিজেনের অস্তিত্ব ছিল না, সুতরাং অন্যান্য উপায়ে কাজ চালাতে হত। সেইসব উপায়ের কিছু কিছু বর্তমানেও প্রচলিত আছে, যেগুলি আদি যুগে শক্তির প্রধান উৎস ছিল। পেশী দ্বারা গ্লুকোজকে ল্যাক্‌টিক এ্যাসিডে (lactic acid) বা খামির (yeast) সাহায্যে গ্লুকোজকে সুরাসারে (alcohol) পরিবর্তিত করতে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না। কতকগুলি ব্যাক্‌টিরিয়া আছে যা গন্ধক বা লৌহ ঘটিত যোগগুলির অজৈব পরিবর্তনে প্রভাবন কার্যের দ্বারা উৎপাদিত শক্তি ব্যবহার

করে। এই প্রাণীগুলি অক্সিজেন শূন্য স্থানে জীবন-যাপন করে এবং এমনকি কতকগুলি ব্যাক্টিরিয়ার পক্ষে মুক্ত অক্সিজেন মারাত্মক। সেগুলিকে বলা হয় "অবায়ুজীবী" জীব (anaerobic—গ্রীক শব্দগত অর্থ বায়ুহীন জীবন-যাপন)।

যতদিন পর্যন্ত আদিযুগের জীবন্ত অণুগুলি জৈব পদার্থগুলি বিভাজিত করে শক্তি সঞ্চয় করত ততদিন সেগুলির সংখ্যা নির্দিষ্ট হতে বাধ্য ছিল। সূর্যের অতিবেগুনী আলো এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহের বিকীরণের ফলে সমুদ্রে জৈব অণুগুলির উৎপাদনের হার সম্ভবতঃ অতি মন্থর ছিল। সুতরাং দীর্ঘকাল ধরে সমুদ্রে জীবিত অণুর ঘনসমাবেশ নিশ্চিতই অল্প ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে উৎপাদিত প্রাণ পদার্থ সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নিজেদের জৈব পদার্থ সমূহের বহুল উৎপাদন শুরু করল, তখনই পরিস্থিতির পরিবর্তন হল। অতিবেগুনী আলোকের তুলনায় এই প্রক্রিয়ায় জৈব অণুগুলির উৎপাদন বহুগুণে ত্বরান্বিত হল। তাছাড়া প্রাণপদার্থ ক্রমতরল সমুদ্র দ্রবণে আকস্মিক প্রাপ্ত খাদ্যে নির্ভর করার বদলে সর্বত্র বিরাজমান জল এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সাহায্যে আপন প্রয়োজনীয় খাদ্য সংশ্লেষিত করতে পারত।

অভিব্যক্তির এই পর্যায়ে জীব একটি আবরণীর মধ্যে সংশ্লেষিত খাদ্য মজুদ করতে শুরু করল এবং এইভাবে কোষের উৎপত্তি হল। কোষগুলি ক্রমেই সমুদ্রের জৈব অণুগুলি ব্যবহার ক'রে নিঃশেষ করতে লাগল। সেগুলি বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে পরিবর্তে অক্সিজেন বিমুক্ত করতে শুরু করল। এই প্রক্রিয়া আণবিক অক্সিজেন ব্যবহারে সক্ষম উৎসেচকগুলি উৎপাদনের সুযোগ করে দিল। যে কোষগুলি এই ধরনের উৎসেচকগুলি উৎপাদন করত সেগুলির শক্তি আয়ত্ব করার ক্ষমতা অধিক হওয়ায় শীঘ্রই উৎসেচকগুলি উৎপাদনে অক্ষম কোষগুলিকে কার্যতঃ লুপ্ত করে দিল।

বর্তমানেও কোষ কেন্দ্রকে মুক্ত অক্সিজেন ব্যবহারকারী উৎসেচকগুলির অভাব। ফলে কেন্দ্রকের অন্তর্গত সমস্ত পদ্ধতিই অবায়ুজীবী। সম্ভবতঃ কোষ কেন্দ্রক নিজেই প্রাথমিক সরল অণুর বংশধর, যা অক্সিজেনহীন বায়ুমণ্ডলে বৃদ্ধি লাভ করেছিল। কেন্দ্রকের চতুষ্পার্শ্বস্থ সাইটোপ্লাজম্ অক্সিজেন ব্যবহারকারী উৎসেচকে সমৃদ্ধ, যা সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে পরিবর্তিত বায়ুমণ্ডলের অভিযোজনে গড়ে উঠেছিল।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অক্সিজেন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার পর উর্ধ্বস্থ বায়ুমণ্ডলে

ওজোনের আবির্ভাব হল, যা ভূপৃষ্ঠে পতিত সূর্যের অতিবেগুনী আলোর অধিকাংশই নিরোধ করে। তাছাড়া ইতিমধ্যে পৃথিবীর তেজস্ক্রিয়তাও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু জৈব পদার্থগুলি উৎপাদনে এই শক্তিগুলির আর প্রয়োজন ছিল না। সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া সে ভার গ্রহণ করেছিল এবং বিভাজক বিকীরণগুলি হ্রাস পাওয়ায় বৃহত্তর, জটিলতর এবং সূক্ষ্ম ধরনের জীবনের অভিব্যক্তি সম্ভব হয়েছিল।

সালোক-সংশ্লেষকারী কোষগুলির সংখ্যা ও জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন ধরনের কোষের উদ্ভব হল, যেগুলিতে সালোক-সংশ্লেষকারী যন্ত্রটির অভাব থাকায় খাদ্যের জন্য উদ্ভিদ কোষের উপর নির্ভরশীল। এই ভাবেই প্রাণীজগতের উদ্ভব। কালক্রমে জীবের গঠনে জটিলতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে আমরা যে সকল জীবাশ্মের (উদ্ভিদ এবং প্রাণীর) অধিকারী সেগুলির সৃষ্টি শুরু হল।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর প্রতিবেশ নতুন প্রাণ সৃষ্টির দৃষ্টিকোণ হতে মূলতঃ পরিবর্তিত হল। একমাত্র রাসায়নিক অভিব্যক্তির দ্বারা প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশ আর সম্ভব ছিল না। তার একটি কারণ হচ্ছে, যে ধরনের শক্তি প্রাথমিক যুগে প্রাণোৎপত্তির কারণ ছিল—যথা, অতিবেগুনী আলোক এবং তেজস্ক্রিয় শক্তি সেগুলি কার্যতঃ বিলুপ্ত হয়েছিল। অপর কারণ এই যে, সুপ্রতিষ্ঠিত ধরনের প্রাণগুলি স্বতঃ উৎপাদিত জৈবঅণুগুলি সত্বর ব্যবহারে সক্ষম। এই দুইটি কারণেই আপাত দৃষ্টিতে জড় বস্তু থেকে নতুন ও সুনির্ভরশীল ধরনের জীবোৎপত্তির কোনোও সম্ভাবনা নেই (অবশ্য যদি ভবিষ্যতে মানুষ প্রাণ রহস্য আবিষ্কার করে তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়)। বর্তমানে স্বতঃস্ফূর্ত জনন এতই অবাস্তব যে, কার্যতঃ তা অসম্ভব বলা চলতে পারে।

অন্য গ্রহে জীবন

যদি আমরা এই মতবাদ স্বীকার করে নিই যে, প্রাণের উদ্ভব কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক নিয়মের ফল, তবে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, সম্ভবতঃ পৃথিবীতেই শুধুমাত্র প্রাণ আবদ্ধ নয়। ব্রহ্মাণ্ডের অন্য অংশে প্রাণের বিকাশ কতখানি সম্ভব ?

ব্রহ্মাণ্ডে তারকার সংখ্যা অন্ততঃ ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,

বলে হিসাব পাওয়া গিয়েছে। যদি এই সমস্ত তারকার উৎপত্তিই, সৌর জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের যা বিশ্বাস, সেই মতো হয়ে থাকে (অর্থাৎ বিরাট ধূলিকণার মেঘ এবং গ্যাসের ঘনীভবন হেতু) তবে সম্ভবতঃ কোনো তারকাই নিঃসঙ্গ নয়, বরং একাধিক সভ্য বিশিষ্ট একটি স্থানিক মণ্ডলের সেটি একটি অংশ। আমরা জানি যে, বহু তারকা যুগলের (double stars) অস্তিত্ব রয়েছে, যে দুটি একই কেন্দ্রের চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান এবং হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে, প্রতি তিনটি তারকার মধ্যে একটি তারকা দুইটি বা ততোধিক সভ্য বিশিষ্ট কোনো মণ্ডলের অন্তর্গত। এই সব মণ্ডলের যে বাসযোগ্য গ্রহ থাকবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে—যা আমরা পরে আলোচনা করব। কিন্তু তা সত্বেও দুই তৃতীয়াংশ তারকা অবশিষ্ট থাকে, যেগুলির চতুর্দিকে বাসযোগ্য গ্রহের প্রদক্ষিণ সম্ভব।

দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও পর্যন্ত সৌর জগতের বাইরে নিকটতম তারকারও কোনো গ্রহ সরাসরি আবিষ্কার করার উপায় আমাদের জানা নেই। মাত্র কিছুদিন আগে জ্যোতির্বিদগণ গ্রহের অস্তিত্ব নির্ণয়ে যে প্রমাণ আবিষ্কারের কাছাকাছি আসতে পেরেছেন তা হল এই যে, ৬১ সিগ্‌নি (61 Cygni) নক্ষত্রমণ্ডলীর একটি তারকার দোদুল্যমান গতি—যা ক্ষুদ্র কোনো সঙ্গীর অস্তিত্বের ইঙ্গিত করে। তারকাটির গতির চাঞ্চল্যের পরিমাণ হিসাব করে সঙ্গীটির ভর (mass) বৃহস্পতি (Jupiter) গ্রহের প্রায় দশ গুণ স্থিরীকৃত হয়েছে। তারকার পক্ষে এই ভর অত্যন্ত কম, সুতরাং বস্তুটি নিশ্চয় একটি দৈত্য গ্রহ (Giant planet)।

বাসযোগ্য হওয়ার জন্য গ্রহের কি কি আবশ্যিক শর্ত পূরণ হওয়া প্রয়োজন? উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আমরা যাকে প্রাণ বলি সে রকম কিছুর লালন করা, বৃহস্পতির মতো গ্রহের পক্ষে যে অসম্ভব সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। প্রথমতঃ, আমাদের ধারণা মতো যে গ্রহে প্রাণের উৎপত্তি সম্ভব সেটিকে সূর্যের এত কাছে থাকতে হবে যে, জল অন্ততঃ অধিকাংশ সময় না জমে তরল অবস্থায় থাকবে, কিন্তু সূর্যের দূরত্ব এমন হবে যে, জল যেন স্ফুটনাংকের (boiling point) নিম্নে থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক তারকার চতুর্দিকে একটি নির্দিষ্ট বাসযোগ্য অঞ্চলে (habitable zone) গ্রহটির অবস্থিতি প্রয়োজন। তারকা যত বৃহৎ ও উজ্জ্বল হবে এই বাসযোগ্য অঞ্চল তত দূরবর্তী এবং প্রশস্ততর হবে। অনুজ্জ্বল

তারকার চতুর্দিকে বাসযোগ্য অঞ্চল এতই সংকীর্ণ যে, কোনো গ্রহের পক্ষে সারা কক্ষ পথে সেই অঞ্চলের মধ্যে থাকা প্রায় অসম্ভব।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, তারকাটির জীবনকাল দীর্ঘ হতে হবে—অন্ততঃ দশ হাজার কোটি বছর—প্রাণের উদ্ভবের পূর্বে রাসায়নিক অভিব্যক্তির জন্য যে সময় প্রয়োজন (যদি না প্রায় অসম্ভব কোনো দৈব আকস্মিকতায় জীবিত অণুর হঠাৎ সৃষ্টি হয়)। এই শর্তের ফলে অতিবৃহৎ ও উজ্জ্বল তারকাগুলি বাদ পড়ে যায়, কারণ সেগুলির জীবনকাল দশ হাজার কোটি বছরের কম।

তৃতীয়তঃ, সম্ভবতঃ বহু-তারকা-সমন্বিত মণ্ডলীকে আমাদের হিসাবের বাইরে রাখতে হবে, কারণ সেগুলির বাসযোগ্য অঞ্চলটির আকৃতি এতই জটিল (দুই বা ততোধিক সূর্যের বিকিকরণ অঞ্চলের বিভিন্নতার দরুন) যে, যে কোনো গ্রহের আপন কক্ষপথের কোনো এক অংশে সেই অঞ্চলের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে যে '৬১ সিগ্‌নি' নক্ষত্রের নিকট প্রথম সম্ভাব্য গ্রহ, (একটি দৈত্য গ্রহ), মানুষ আবিষ্কার করেছে, সেই নক্ষত্রটি বহু তারকা সমন্বিত মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত।

এই সকল শর্তের কথা মনে রেখে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ এস্, এস্, হুয়াংগ সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দুইটি মাত্র তারকাকে নির্দিষ্ট করেছেন, যে দুটির চতুর্দিকে বাসযোগ্য অঞ্চলে পৃথিবীর মতো গ্রহ প্রদক্ষিণ করতে পারে। এই তারকা দুটি হচ্ছে এপসাইলন এরিডানি (Epsilon Eridani এগারো আলোক-বর্ষ দূরে) এবং টাউ-সেটি (Tau Ceti—বারো আলোক-বর্ষ দূরে)। দুটিই সূর্য অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, সুতরাং তাদের চতুর্দিকে বাসযোগ্য অঞ্চলও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হলেও গ্রহের কক্ষের পক্ষে ক্ষুদ্র নয়।

হুয়াংগ হিসাব করে দেখেছেন যে, প্রতি ২০টি তারকার মধ্যে একটিতে এমন গ্রহের অস্তিত্ব বর্তমান, যেখানে আমাদের জ্ঞাত প্রাণের বিকাশ সম্ভব এবং অবশ্য ওপারিন, ক্যালভিন্, উরে এবং মিলারের মতো গবেষকগণের পরীক্ষাগত ধারণা এই যে, যে সকল গ্রহে প্রাণের উদ্ভব সম্ভব, সেখানে প্রাণের উদ্ভব হবেই। অতএব আমাদের ছায়াপথের অন্তর্গত জীবনের অস্তিত্ব সম্পন্ন গ্রহের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার কোটির মতো এবং ব্রহ্মাণ্ডে সে সংখ্যা হবে এর কয়েক কোটি গুণ বেশি।

যদি সত্য হয়, ব্যাপারটা যথেষ্ট রোমাঞ্চকর। আরো বেশি রোমাঞ্চকর

ব্যাপার এই যে, অন্ততঃ কয়েকটি গ্রহেও প্রাণের এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, যাকে আমরা বলি "বুদ্ধিমান" শ্রেণীর। যদি দশ লক্ষ গ্রহের মধ্যে একটিতেও সে রকম কিছু ঘটে থাকে তবে আমাদের ছায়াপথেই 'বুদ্ধিমান প্রাণ সমন্বিত' গ্রহের সংখ্যা ৫০০০ এবং ব্রহ্মাণ্ডে সেই সংখ্যা ৫০ মিলিয়ন বিলিয়ন।

কিছুকাল আগে পর্যন্তও এই সম্ভাবনার কথা শুধু বৈজ্ঞানিক কাল্পনিক কাহিনীগুলিতেই জল্পনা করা হত। এক সময় আমিও বৈজ্ঞানিক কাল্পনিক কাহিনী লিখেছি এবং সেগুলির পাঠক যদি আমার উপরের মন্তব্যটিকে অত্যুৎসাহের ফল বলে মনে করেন তবে তারা নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে, বর্তমানে বহু জ্যোতির্বিদই বহু গ্রহেই জীবন এবং এমন কি বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনায় বিশ্বাসী।

বস্তুতঃ যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীগণ এই সম্ভাবনাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং অন্যান্য গ্রহের সম্ভাব্য বেতার সংকেত শ্রবণের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তাকে বলা হয় "ওজমা পরিকল্পনা" (Project Ozma—শিশু পাঠ্য 'ওজ' পুস্তকগুলির একটি হতে নামটি গৃহীত)। মহাশূন্য হতে আগত বেতার তরঙ্গের কোনো নির্দিষ্ট ধাঁচের সন্ধানই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। যদি কোনো নির্দিষ্ট শৃংখলায় বেতার সংকেত পাওয়া যায়, যা বেতার তারকা অথবা মহাশূন্যের উত্তেজিত বস্তুপুঞ্জজাত অসম্বদ্ধ সংকেত হতে পৃথক তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সেই সংকেত বহিঃপার্থিব বুদ্ধিমান জীব কর্তৃক প্রেরিত। অবশ্য যদি এরকম সংকেত পাওয়া যায় তবু সুদূরের সেই বুদ্ধিমান জীবের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, সমস্যার ব্যাপার হবে। যেহেতু সর্বনিকটবর্তী সম্ভাব্য বাসযোগ্য গ্রহের দূরত্ব অন্ততঃ এগারো আলোকবর্ষ সেইহেতু সংকেতের আগমন হতে যেমন বহু বর্ষ লাগবে তেমনই প্রেরিত সংকেতের সেই গ্রহে উপস্থিতি বহু বর্ষের ব্যাপার।

অন্য জগতের বুদ্ধিমান জীব কোন্ তরঙ্গে বেতারবার্তা প্রেরণ করবে? জ্যোতির্বিদরা মহাশূন্য আবিষ্কারে একটি বিশ্বজনীন বেতার তরঙ্গের সঙ্গে পরিচিত—যাকে বলা হয় "হাইড্রোজেন সংগীত" (song of Hydrogen), ১৪২০ মেগাসাইকেলে প্রচারিত। যখন হাইড্রোজেন পরমাণুতে ইলেকট্রন একটি স্তর থেকে আর একটি স্তরে ঝাঁপ দেয় তখনই এই সংকেত উত্থিত হয়। মহাশূন্যে বুদ্ধিমান জীবদের পরস্পরের মধ্যে বার্তাবিনিময়ের প্রয়াসের জন্য এই বিশ্বজনীন বেতার তরঙ্গ নির্বাচনই যুক্তি সংগত।

এ সবই কি জল্পনা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়? ঠিক তা নয়। এ কথা বলা সংগত যে, বিজ্ঞানীগণ অতি ক্ষীণভাবে হলেও আমাদের সৌরজগতে সম্ভাব্য অন্য ধরনের প্রাণের অস্তিত্বের লক্ষণ ক্রমশঃই অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন।

চন্দ্র সমেত পৃথিবীর কক্ষপথ এবং শুক্র ও মঙ্গল, সূর্যের চতুর্দিকে বাসযোগ্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে বুধ খুবই গরম এবং মঙ্গলের বাইরে যাবতীয় গ্রহই অত্যন্ত শীতল।

সন্ধানসাধ্য বায়ু এবং জলের অভাব হেতু, আমরা নিশ্চিতভাবেই চন্দ্রকে বাদ দিতে পারি। চন্দ্রে গভীর ফাটল সমূহে, যেখানে জল ও বায়ুর সম্ভাব্য অস্তিত্ব আছে, সেখানে আদিম ধরনের প্রাণের ইতস্ততঃ অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু দূরকল্পনা করা হয়েছে। বৃটিশ জ্যোতিবিদ ডি এ. ফিরশফ্ "চাঁদের বিচিত্র জগৎ" (Strange World of the Moon) নামক পুস্তকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন যে, চন্দ্রের ভূপৃষ্ঠের নিম্নে জলের অস্তিত্ব থাকতে পারে এবং ধূলি সমাচ্ছন্ন চন্দ্রপৃষ্ঠে বিশোধিত (absorbed) গ্যাসগুলি অগভীর বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করায়, সেখানে এক ধরনের প্রাণের পোষণ সম্ভব। কিন্তু এ সবই দূরকল্পনা। তা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকগণ চাঁদে জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনিশ্চিত হওয়ায় সাময়িকভাবে চন্দ্রে প্রেরিতব্য রকেটগুলি জীবাণুশূন্য (sterilize) করার ঝামেলা ভোগ করে থাকেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের খবরের প্রকাশ যে, চন্দ্রপৃষ্ঠে আঘাতকারী 'লুনিক ২টি' (Lunik—II) প্রেরণের আগে জীবাণুশূন্য করা হয়েছিল। মানুষ চাঁদে পৌছে যাতে সেখানকার আদিম রূপ পর্যবেক্ষণ করতে পারে তার জন্য পার্থিব প্রাণ প্রেরণ পরিহারে বৈজ্ঞানিকদের চিন্তার অন্ত নেই।

প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে শুক্র গ্রহটি উৎকৃষ্টতর। ঐটির আয়তন ও ভর পৃথিবীর তুল্য এবং বায়ুমণ্ডলটি আমাদের বায়ুমণ্ডল অপেক্ষা গাঢ়তর। অনুমিত হয়, প্রধানতঃ নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড সহযোগেই গ্রহটির বায়ুমণ্ডল গঠিত। শুক্রে লক্ষণ যোগ্য মুক্ত অক্সিজেনের অস্তিত্ব নেই, কিন্তু জীবনের পক্ষে তা মারাত্মক বাধাস্বরূপ নয়। পুর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেনের অস্তিত্ব প্রকাশের পূর্বে বহু কাল ধরেই পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব ছিল (অবশ্য এ কথা নিশ্চিত যে, সে জীবন ছিল একেবারে আদিম ধরনের)।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত শুক্রের বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্পের চিহ্ন দেখা যায়নি এবং সেখানে প্রাণের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সেটি ছিল প্রধান আপত্তি। কিন্তু জলীয় বাষ্প ব্যতিরেকে গ্রহটির মেঘ-আবরণের কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পাওয়ায় বৈজ্ঞানিকগণ শুক্রে জলের অনস্তিত্বের ব্যাপারে বিব্রত বোধ করতেন। তারপর ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আর্থার ডিঃ লিট্‌ল্ কোম্পানীর চার্লস্ মুর বেলুনে ঊর্ধ্বে ১৫ মাইল উচ্চতায় পৃথিবীর অধিকাংশ বাধা প্রদানকারী বায়ুমণ্ডলের বাইরে স্ট্র্যাটোস্ফীয়ার (stratosphere) থেকে দূরবীক্ষণ সাহায্যে শুক্রের আলোক চিত্র গ্রহণ করেন। অবলোহিত বর্ণালীতে (infra red spectrum) প্রমাণিত হল যে, শুক্রের ঊর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ পৃথিবীর প্রায় সমান।

এর ফলে সম্ভাব্যতা বেড়ে গেল। অন্ততঃ, সম্ভাব্য জীবনের ক্ষেত্র হিসাবে শুক্র গ্রহটিকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য আপত্তির কারণ তবুও রয়ে গেছে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতি হেতু উদ্যানস্থ হট্‌হাউসের (hothouse) অনুরূপ তাপনিরোধক প্রক্রিয়ায় শুক্রগ্রহ পৃষ্ঠের তাপ, জলের স্ফুটনাংকের কিছু উপরে এবং শুক্র গ্রহাগত বেতার সংকেত অনুযায়ী শুক্রগ্রহের উপরিভাগের তাপ প্রায় ২৫০° সেণ্টিগ্রেড। যদি তাই হয়, তবে অন্ততঃ যে ধরনের প্রাণ সম্বন্ধে আমরা পরিচিত সেগুলির ক্ষেত্রে জীবপালিনী হিসাবে শুক্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

কিন্তু, যতদিন পর্যন্ত না কোনো যন্ত্রপাতি সমন্বিত মহাশূন্য বিহারী রকেট অথবা মানুষের অবতরণের দ্বারা শুক্র গ্রহের মেঘ আবরণী ছিন্ন হচ্ছে ততদিন সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রশ্নটির নিস্পত্তি হবে না। আমরা এই পর্যন্ত বলতে পারি যে, শুক্র গ্রহে প্রাণ-বিকাশের বিরুদ্ধ-শক্তি প্রচুর হলেও চূড়ান্ত নয়।

মঙ্গল গ্রহটি নিঃসন্দেহে সম্ভাবনার ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক। এই গ্রহটির কার্বন ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন সমন্বিত পাতলা বায়ুমণ্ডল আছে এবং পাতলা হিম-আবরণী (সম্ভবতঃ বেশি হলে এক ইঞ্চি পুরু) সৃষ্টির পক্ষে পর্যাপ্ত জলীয় বাষ্পের অস্তিত্বও আছে, যা ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে উঠে বা গলে যায়। (হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে, মঙ্গলের সমস্ত জলীয় বাষ্পটুকু ঈরি হ্রদকে প্রায় পূর্ণ করবে)। মঙ্গলের তাপ কম, কিন্তু প্রাণ ধারণের অনুপোযোগী নয়, অন্ততঃ কুমেরু অঞ্চলের তাপমাত্রা থেকে কোনো সময়েই কম

নয়। মধ্য গ্রীষ্মে কখনও কখনও মঙ্গলের নিরক্ষবৃত্ত অঞ্চলে তাপমাত্রা আরামপ্রদ উষ্ণতায় ৮০° ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়।

প্রায় শতাব্দীকাল ধরে মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা পৃথিবীতে আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় জ্যোতির্বিদ গিয়োভানি ভারজিনিও শিয়াপারেলি এই গ্রহপৃষ্ঠে সূক্ষ্ম সরলরেখাসমূহ আবিষ্কার করেন। তিনি এগুলির নাম দেন "ক্যানালি" (canali)। ইতালীয় ভাষায় শব্দটির অর্থ প্রণালী (channel)—যা ইংরেজী ভাষান্তরনের ভুলে হল খাল (canal), ফলে লোকে সিদ্ধান্ত করে নিল যে, এগুলি কৃত্রিমভাবে তৈরী জলনালী, যা সম্ভবতঃ হিম আবরণী থেকে খনন করে গ্রহের অন্যান্য অংশে জলসেচনের জন্য আনা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের উগ্র প্রবক্তা হলেন মার্কিন জ্যোতির্বিদ পার্সিভাল লোয়েল এবং শহরের রবিবাসরীয় কাগজগুলি (এবং বৈজ্ঞানিক কষ্ট কল্পনার কাহিনীগুলি) মঙ্গলগ্রহে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্বের "প্রমাণ" ঘোষণা করল।

বস্তুতঃ, দাগগুলি সত্যই আছে কি না সে সম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহ রয়েছে। আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও বহু জ্যোতির্বিদই দাগগুলি দেখতে পাননি। কেউ কেউ মাত্র চকিতের জন্য দেখেছেন। অনেকে মনে করেন, দৃষ্টি সীমায় অবস্থিত বস্তু জোর করে দেখবার চেষ্টায় যে দৃষ্টি বিভ্রম হয় এগুলি তারই ফল। যাই হোক, মঙ্গল গ্রহে যে উন্নত ধরনের জীবন সম্ভব তা কোনো জ্যোতির্বিদই বিশ্বাস করেন না।

তবু প্রমাণ দৃষ্টে মনে হয় মঙ্গলে কিছু একটা জন্মায়। প্রমাণটি হচ্ছে মঙ্গলের বিখ্যাত সবুজ আস্তরণী। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এগুলোও পরিবর্তন হয় ; গ্রীষ্ম উপভোগকারী গোলার্ধে এগুলির বৃদ্ধি এবং শৈত্য পীড়িত গোলার্ধে এগুলির সঙ্কোচন হয়। হিম আবরণী গলনের সঙ্গে সঙ্গে সবুজ আস্তরণীর বিস্তৃতি লাভ ঘটে বলে মনে হয়।

ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ ইন্‌জবর্গ স্মিদ্ (Ingeborg Schmidt) প্রশ্ন তুলেছেন, মঙ্গলের সবুজ আস্তরণী সত্যই সবুজ কি না। তাঁর মতে এই আপাতদৃষ্ট সবুজ রঙের উৎপত্তির কারণ, মঙ্গল গ্রহের অধিকাংশ অংশের নারঙ্গ-লোহিত রঙের বৈপরীত্যে দৃষ্টিবিভ্রম। তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী তথাকথিত "সবুজ" অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে ধূসর। কিন্তু সবুজই হোক আর ধূসরই হোক, তিনিও স্বীকার করেছেন যে, এই আস্তরণী কোনো ধরনের উদ্ভিদ বা অন্য আদিম ধরনের প্রাণ হওয়া সম্ভব।

গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, কিছুসংখ্যক পার্থিব জীবাণু যদিও মঙ্গলের তুলনায় পৃথিবীর প্রতিবেশে অধিকতর অভ্যস্ত, তবুও কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত মঙ্গলের অনুরূপ প্রতিবেশের তাপ ও বায়ুমণ্ডলে এগুলি বাস করতে ও বৃদ্ধিলাভ করতে সক্ষম। আরিজোনার অন্তর্গত লোয়েল মানমন্দিরে কর্মরত উইলিয়াম এম্. সিনটন্ ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গলগ্রহে সরল ধরনের উদ্ভিদের স্বপক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, মঙ্গলের সবুজ এলাকায় শোষিত সূর্যালোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য জৈব পদার্থসমূহ কর্তৃক শোষিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুরূপ। এরূপ প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মঙ্গল গ্রহের রঙের পরিবর্তন—জল এবং ভূপৃষ্ঠস্থ অজৈব পদার্থ সমূহের অন্তক্রিয়ার (interaction) ফল, কিন্তু সিনটন্ প্রমাণ করলেন যে, উক্ত গ্রহের সবুজ অঞ্চলের থেকে প্রতিফলিত আলোক কেবল মাত্র মৃত্তিকা বা শৈলের প্রতিফলন জনিত নয়।

এই সব সত্ত্বেও মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নেই, ঠিক যেমন নেই শুক্র গ্রহে প্রাণের অনস্তিত্বের নিশ্চয়তা। এই মাত্র বলা যেতে পারে যে, শুক্রে প্রাণের বিরুদ্ধশক্তি প্রবলতর এবং মঙ্গলে প্রাণপোষক শক্তি অধিকতর সক্রিয়।

স্বভাবতঃই মঙ্গল গ্রহে মানুষের প্রথম অবতরণের প্রত্যাশায় বৈজ্ঞানিকগণ উৎসুক। বিজ্ঞানের পক্ষে ব্যাপারটা হবে আমাদের সৌরজগতের মহাশূন্য পরিভ্রমণকারীগণের আবিষ্কারের সবচেয়ে উদ্দীপনাময় ঘটনা—চন্দ্রের প্রথম অবতরণের চেয়ে উদ্দীপনাময়। মেলভিন ক্যালভিনের মন্তব্য অনুযায়ী—মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের প্রমাণ ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে মানুষের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই পরিবর্তন আনবে।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালভিন্ একটি আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন, যা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। কতকগুলি উল্কাপিণ্ডের বিশ্লেষণ করে তিনি একটি বস্তুর সন্ধান পান যেটি পিরিমিডিনের অনুরূপ। উল্কাপিণ্ডগুলি সম্ভবতঃ বিস্ফোরিত গ্রহের অংশ এবং সম্ভবতঃ সেগুলিতে জীবের বাসযোগ্য অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সেটি কল্পনা মাত্র এবং উক্ত আবিষ্কারের প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়। পিরিমিডিন ধরনের বস্তুটি পূর্বেকার গ্রহ থেকে এসেছিল অথবা মহাশূন্যে অন্তহীন কাল ধরে পরিভ্রমণরত অবস্থায় উল্কাপিণ্ডে আটক থাকা কার্বন ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেনে সৌর

বিকিরণের ফলে বস্তুটির জন্ম ঘটেছিল—যাই হোক না কেন, ব্যাপারটি প্রকৃতিতে সত্যই সংঘটিত প্রথম রাসায়নিক অভিব্যক্তির প্রমাণ (যা গবেষণাগারে গবেষকের কৃত কাঁচের আধারেই কেবল উৎপন্ন নয়)। যতই দুর্বল হোক্, এটি ব্রহ্মাণ্ডে জীবনের বহু বিস্তৃতির একটি নির্ভরযোগ্য লক্ষণ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জীবাণু

ব্যাক্‌টিরিয়া

সপ্তদশ শতাব্দীর আগে ক্ষুদ্র পতঙ্গদেরই ক্ষুদ্রতম জীব হিসাবে জানা ছিল। একথা অবশ্য মেনে নেয়াই হয়েছিল যে, ক্ষুদ্রতর কোনো জীবের অস্তিত্ব নেই। আধিভৌতিক শক্তির প্রভাবে জীবিত প্রাণীকে অদৃশ্য করা যায় (এ বিষয়টি, সকল ধরনের সভ্যতাই কোনো না কোনো এক রকমে মেনে নিয়েছিল), কিন্তু এমন ক্ষুদ্র জীবের অস্তিত্ব কেউ কল্পনা করেনি, যা চোখে দেখা যায় না।

মানুষ যদি আগে এই ব্যাপারটা সন্দেহ করত তাহলে বিবর্ধন কৌশল-গুলির ব্যবহারে আরো আগেই সচেষ্ট হওয়া শুরু হত। এমন কি গ্রীক ও রোমানরাও জানত যে, একটি বিশেষ আকৃতির কাঁচের সাহায্যে সূর্য রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করা যায় এবং তার মধ্য দিয়ে দৃষ্ট বস্তু বিবর্ধিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, জলভর্তি ফাঁপা কাঁচের গোলককে উক্তরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। খ্রীষ্টের জন্মের ২১২ বৎসর পূর্বে সিরাকিউসে অবরোধকারী রোমান নৌবহরে আগুন লাগানর জন্য আর্কিমিডিস ঐ রকম ধরনের কোনো দাহক কাঁচ (burning glass) ব্যবহার করে থাকতে পারেন (যা তিনি করেছিলেন বলে কথিত আছে)। টলেমি দাহক কাঁচ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং আরবীয় লেখকেরা তাঁরই পর্যবেক্ষিত বিষয় আরও বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

ইংরেজ বিশপ, দার্শনিক এবং অত্যুৎসাহী সখের বিজ্ঞানবিদ রবার্ট গ্রসেটেস্ট ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রথম উপরোক্ত অস্ত্রের শান্তিকালীন ব্যবহারের কথা আলোচনা করেন। লেন্সগুলি (lens) [মসুর ডালের (lentils) আকৃতি বিশিষ্ট বলে এই রকম নামকরণ হয়েছে] যে সকল বস্তু ক্ষুদ্রতার জন্য দর্শনে অসুবিধার সৃষ্টি করে সেগুলির বিবর্ধনে যে ব্যবহার করা যেতে পারে সে বিষয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর ছাত্র রোজার বেকন এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ ক'রে ক্ষীণ-দৃষ্টির উন্নতিকল্পে চশমা আবিষ্কার করেন।

প্রথমে দূর বদ্ধদৃষ্টিরোগ (Far-sightedness) দূরীকরণে উত্তল লেন্সের (Convex lense) সৃষ্টি হয়। ১৪০০ সালের আগে নিকটবদ্ধ দৃষ্টিরোগের (Near sightedness) উন্নতিকল্পে অবতল লেন্সের (Concave lense) সৃষ্টি হয়নি। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে চশমার চাহিদা বেড়ে গেল এবং ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ চশমা তৈরি দক্ষ কারিগরী ব্যবসায়ের পর্যায়ে উন্নীত হ'ল। বিশেষ ক'রে হল্যাণ্ড এই শিল্পে বিশেষত্ব লাভ করল।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে দূর ও নিকটবদ্ধ দৃষ্টিযুক্ত রোগ সারানর জন্য বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন কর্তৃক 'যুগল-ফোকাস' (by-focal) লেন্সের আবিষ্কার হয়। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ জ্যোতির্বিদ জর্জ বিডেল এয়ারি কর্তৃক বিষমদৃকদৃষ্টি রোগের (astigmatism) প্রয়োজনীয় লেন্সের আবিষ্কার হয়। তিনি নিজে ঐ রোগে ভুগছিলেন এবং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে একজন ফরাসী চিকিৎসক স্পর্শ লেন্সের (contact lense) পরিকল্পনা করেন, যা হয়ত একদিন বহুল প্রচলিত চশমাকে অপ্রচলিত করে দেবে।

এইবার ডাচ-চশমা নির্মাণকারীদের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। গল্প প্রচলিত আছে যে, ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে হান্‌স্ লিপ্‌পারশে নামক চশমা নির্মাণকারীর শিক্ষাধীন এক ব্যক্তি অবসর বিনোদনের জন্য উপরি উপরি দুইটি লেন্সের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বস্তু নিরীক্ষণ করছিলেন। তিনি দেখে অবাক হলেন যে, লেন্স দুটি পরস্পরের থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখলে দূরের জিনিস খুব কাছে বলে মনে হয়। শিক্ষাধীন ব্যক্তিটি তৎক্ষণাৎ তাঁর মনিবকে ব্যাপারটা জানালেন এবং লিপ্‌পারশে দুটি লেন্সকে একটি নলের মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্বে বসিয়ে প্রথম দূরবীক্ষণ তৈরি করেন। স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ব্যাপৃত ডাচ সৈন্যদলের সেনাপতি যন্ত্রটির সামরিক উপযোগিতা উপলব্ধি করেন এবং ব্যাপারটা গোপন রাখবার চেষ্টা করেন।

তিনি অবশ্য গ্যালিলিওর কথা ভাবেননি। দূরবর্তী জিনিস দেখার যন্ত্র আবিষ্কারের গুজব শুনে গ্যালিলিও শুধুমাত্র লেন্স ব্যবহৃত হয় এই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে শীঘ্রই অন্তর্নিহিত নীতিটি আবিষ্কার করেন এবং নিজস্ব দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন ; লিপ্‌পারশের যন্ত্র তৈরি হবার ছ'মাসের মধ্যে গ্যালিলিওর যন্ত্র নির্মাণ শেষ হয়।

নিজের যন্ত্রের লেন্সগুলির স্থান পরিবর্তন করে গ্যালিলিও যন্ত্রটির দ্বারা নিকটস্থ বস্তুর বিবর্ধন কার্যেও সক্ষম হন, সুতরাং যন্ত্রটি ছিল কার্যতঃ "অণুবীক্ষণ"

যন্ত্র। পরবর্তী দশকগুলিতে বহু বৈজ্ঞানিকই অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন। একজন ইতালীয় প্রকৃতিবিদ্ ফ্রাসেস্কো স্টেল্লুটি এইরূপ একটি যন্ত্রের সাহায্যে পতঙ্গের শারীরস্থান পর্যালোচনা করেন, ম্যালপিঘি আবিষ্কার করেন কৈশিকতন্ত্র এবং হুক কর্কের কোষসমূহ আবিষ্কার করেন।

কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না ডেল্‌ফ্‌টের বণিক এ্যান্টন্ ভ্যান্ লীভেনহুক অণুবীক্ষণের ব্যবহার করেন ততদিন এই যন্ত্রটির গুরুত্ব সাধারণে উপলব্ধি করতে পারেনি। ভ্যান্ লীভেনহুক খেয়াল হিসাবে ঘষে ঘষে লেন্স তৈরি করতেন এবং তিনি তাঁর অণুবীক্ষণের জন্য নিখুঁত লেন্স তৈরির দিকে মন দিলেন। তিনি মাত্র একটি লেন্স ব্যবহার করতেন, কিন্তু তার সাহায্যেই তিনি ক্ষুদ্র বস্তুগুলিকে যে রকম পরিষ্কার দেখতে পেতেন, তাঁর সমসাময়িক আর কেউ তা পারেনি; কারণ মিশ্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যবহৃত লেন্সগুলি সে আমলের ভ্রান্ত পন্থায় নির্মিত হওয়ায় সেগুলি ত্রুটিহীন ছিল না। ভ্যান্ লীভেনহুকের লেন্স-গুলির ২০০ গুণ বিবর্ধনের ক্ষমতা ছিল।

ভ্যান্ লীভেনহুক নির্বিচারে সকল বস্তুই পর্যবেক্ষণ করতেন এবং লণ্ডনের রয়াল সোসাইটিতে লম্বা লম্বা চিঠি লিখে তিনি যা দেখেছেন সবই জানাতেন। বিজ্ঞানে গণতন্ত্রের জয় ঘোষণা করে সাধারণ একজন ব্যবসায়ী রয়াল সোসাইটির মতো "ভদ্রলোকের" সংস্থার ফেলো (fellow) নির্বাচিত হন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ইংল্যাণ্ডের রাণী এবং সমগ্র রাশিয়ার জার পিটার দি গ্রেট ডেল্‌ফ্‌টের এই নগণ্য অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

তাঁর নির্মিত লেন্সের সাহায্যে লীভেনহুক শুক্রকোষ, রক্তের লোহিত কোষ আবিষ্কার করেন এবং ব্যাঙাচির লেজে কৈশিকের মধ্যে রক্ত চলাচল বাস্তবে পর্যবেক্ষণ করেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, খালি চোখে অদৃশ্য জীবিত প্রাণীসমূহ তিনিই প্রথম অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখেন। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বদ্ধ জলে তিনি এই অতি ক্ষুদ্র প্রাণীদের (animalcules) দেখেন। তিনি ইষ্টের (খামির) কোষও পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাঁর লেন্সের বিবর্ধন শক্তির প্রান্ত সীমায় বীজাণু (germs) আবিষ্কার করেন, সেগুলিকে আমরা বর্তমানে বলি —ব্যাক্‌টিরিয়া।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি হ'ল খুব ধীরে ধীরে এবং জীবাণুর মতো ক্ষুদ্র বস্তুসমূহ স্বচ্ছন্দে পর্যবেক্ষণ করার মতো যন্ত্র তৈরি করতে প্রায় দেড় শতাব্দী লেগে গেল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ

আলোক-বিজ্ঞাবিদ জোসেফ জ্যাক্‌সন লিস্টার প্রথম "অবার্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্র" (achromatic microscope) আবিষ্কার করেন, যার ফলে চক্রাকার রঙগুলি লুপ্ত হয়ে দৃষ্ট বস্তুর প্রতিবিম্ব আরও পরিষ্কার হয়। লিস্টার আবিষ্কার করেন যে, লোহিত কণিকাগুলি যুগ্মাবতল বলয়াকৃতি বস্তু (biconcave disks) —ছোট ছোট একজাতীয় বাদামের (doughnuts) মতো, যাতে ছিদ্রের পরিবর্তে টোল পড়ে রয়েছে।

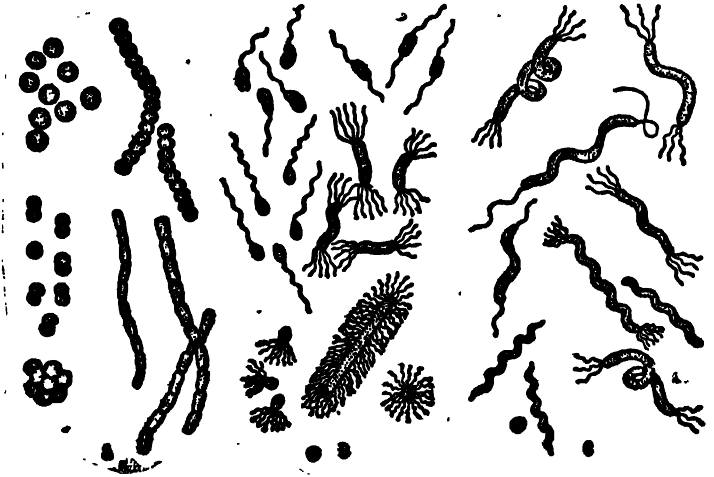
ক্রমশঃ আণুবীক্ষণিক জগতের প্রাণীগুলির নামকরণ শুরু হ'ল। ভ্যান লীভেনহুক দৃষ্ট "ক্ষুদ্র-প্রাণীগুলি" বস্তুতঃই প্রাণী, যা ক্ষুদ্র বস্তুসমূহ আহার্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং ক্ষুদ্র চাবুকের মতো, (flagellae) চুলের মতো সিলিয়া (cilia) অথবা বর্ধমান প্রোটোপ্লাজম্ স্রোতের (pseudopods) সাহায্যে চলাফেরা করে। এই প্রাণীগুলির নাম দেওয়া হ'ল প্রোটোজোয়া (protozoa—গ্রীক শব্দগত অর্থ 'প্রথম প্রাণী') এবং জার্মান প্রাণীতত্ত্ববিদ্ কার্ল থিওডোর আর্নস্ট সাইবোল্ড এগুলিকে এককোষী প্রাণী হিসাবে চিহ্নিত করেন।

বীজাণুগুলি (germs) অন্য জিনিস; প্রোটোজোয়ার চেয়েও এগুলি ক্ষুদ্রতর এবং সরলতর। যদিও কিছু সংখ্যক বীজাণু চলাচলে সক্ষম, অধিকাংশগুলিই নিশ্চল থাকে, শুধুমাত্র বৃদ্ধিলাভ ও বংশবৃদ্ধি করে। কেবলমাত্র ক্লোরোফিলের অভাব ছাড়া সেগুলির সঙ্গে প্রাণীর ধর্মের আর কোনোও সাদৃশ্য নেই। সেই কারণে সেগুলি সাধারণতঃ ক্লোরোফিলহীন, জৈববস্তুভোজী উদ্ভিদ ছত্রাকের সঙ্গে শ্রেণীভুক্ত করা হ'ত। বর্তমানে অধিকাংশ জীববিজ্ঞাবিদই ঐগুলি উদ্ভিদ বা প্রাণী—কোনো শ্রেণীভুক্তই না করে, এগুলিকে একটি বিশিষ্ট শ্রেণী হিসাবে গণ্য করেন। এইগুলির বীজাণু (germ) নাম বিভ্রান্তিকর। কারণ, বীজ শব্দটির দ্বারা উদ্ভিদের বীজ (যথা গমের বীজ) অথবা যৌনকোষ (বীজকোষ) অথবা অঙ্গের ভ্রূণ অবস্থা (বীজস্তর—germ layer) এবং বস্তুতঃ প্রাণের সম্ভাবনা বিশিষ্ট যে কোনো ক্ষুদ্র বস্তুই বোঝায়।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, ডেনমার্কবাসী অণুবীক্ষণবিদ অটো ফ্রিডরিক মুলার এই সব ক্ষুদ্র প্রাণীদের যথেষ্ট সুস্পষ্টভাবে দেখতে সক্ষম হন; তিনি এইগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন—"ব্যাসিলি" (bacilii—'ক্ষুদ্র দণ্ডে'র ল্যাটিন শব্দ থেকে গৃহীত) এবং "স্পাইরিলি" (spirilli—পাকানো আকৃতির জন্য)। অবার্ন অণুবীক্ষণযন্ত্র (achromatic microscope) উদ্ভাবনের অস্ট্রিয়ান শল্যচিকিৎসক থিওডোর বিলরথ আরও ক্ষুদ্র ধরনের প্রাণী আবিষ্কার করেন, যেগুলির তিনি

নাম দেন 'কোক্কাস' (Coccus—berrey ফলের গ্রীক শব্দ থেকে গৃহীত)। জার্মান উদ্ভিদবিদ্যাবিদ ফার্ডিনাণ্ড জুলিয়াস্ কোহ্‌ন শেষ পর্যন্ত স্বোদ্ভাবিত ব্যাকটিরিয়াম্—(Bacterium) শব্দটি ব্যবহার করেন (এটিও 'ক্ষুদ্র দণ্ডের', ল্যাটিন শব্দ থেকে গৃহীত)।

উদ্ভিদ, প্রাণী এবং ব্যাকটিরিয়া সকল ধরনের আণুবীক্ষণিক জীবনের জন্য 'জীবাণু' (microbe—ক্ষুদ্র জীবন) শব্দটি পাস্তুর জনপ্রিয় করে তোলেন। কিন্তু শীঘ্রই শব্দটি ব্যাকটিরিয়ার সমার্থক হয়ে উঠল—যেটি তখন কুখ্যাতি লাভ করে। বর্তমানে আণুবীক্ষণিক প্রাণের সাধারণ পরিভাষা হচ্ছে অণুজীব (micro organism ।



বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাকটিরিয়া : (ক) কোক্কাস্‌সমূহ (cocci) (খ) ব্যাসিলি এবং (গ) স্পাইরিলি। প্রত্যেকটি শ্রেণীর বিভিন্ন উপশ্রেণী আছে।

পাস্তুরই প্রথম নিশ্চিতভাবে রোগের সঙ্গে অণুজীবগুলির সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন এবং আশ্চর্যের কথা এবং বিচিত্র এই যে, একটি ফরাসী শিল্পকে বাঁচাবার চেষ্টাতেই উপরোক্ত ব্যাপার সম্ভব হয়েছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী রেশমশিল্প এক ধরনের রেশম কীটজাত রোগে ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছিল। ইতিপূর্বে সুরা প্রস্তুতকারীদের বিপদ থেকে উদ্ধার করার ফলে পাস্তুরকেই এই সমস্যাটি সমাধানে নিযুক্ত করা হ'ল। যেমন অসমঞ্জস-কেলাস (asymmetric crystals) এবং

ইষ্টের (yeast) কোষের পর্যালোচনা তিনি করেছিলেন, তেমনই, অণুবীক্ষণের প্রেরণাগত ব্যবহারের ফলে পাস্তরই রেশমকীট এবং তুঁতগাছের পাতা সংক্রমণ-কারী অণুজীব আবিষ্কার করেন। তিনি সমস্ত সংক্রামিত রেশমকীট এবং তুঁতগাছ নষ্ট করে ফেলার ও অসংক্রামিত রেশমকীট এবং তুঁতগাছের সাহায্যে নতুন করে শিল্প শুরুর সুপারিশ করেন। এই চূড়ান্ত উপায় অবলম্বন সুফলপ্রদ হয়েছিল।

পাস্তর এইসব গবেষণায় রেশমশিল্পের পুনরুজ্জীবনের চেয়েও বেশি কিছু করেছিলেন। তিনি এই সমস্ত গবেষণার ফলাফল থেকে যা সিদ্ধান্ত করেন তা 'রোগের বীজতত্ত্ব' (germ theory of disease) নামে খ্যাত ; এ তত্ত্ব অবিসংবাদিতরূপে চিকিৎসাবিদ্যার চিকিৎসা বৃহত্তম আবিষ্কারগুলির অন্যতম (এবং এ আবিষ্কার কোনো চিকিৎসক করেননি, করেছিলেন একজন রসায়নবিদ —এ কথা রসায়নবিদগণ গর্বের সঙ্গে প্রচার করেন)।

পাস্তরের আগে চিকিৎসকেরা বিশ্রাম, সুখাদ্য, পরিষ্কার বাতাস এবং পরিচ্ছন্ন প্রতিবেশের সুপারিশ ও গুটিকয়েক আকস্মিক পরিস্থিতিতে ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়া, তাঁদের রোগীদের জন্য আর বেশি কিছু করতে পারতেন না। তাঁরা ফোড়া কাটতে পারতেন, ভাঙ্গা হাড় জোড়া দিতেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে মানুষের সাধারণ জ্ঞানলব্ধ কয়েকটি বিশেষ নিরাময়কারী ওষুধ ব্যবহার করতেন ; যেমন সিন্‌কোনা গাছের বল্কল জাত কুইনিন্ (আদিতে ম্যালেরিয়া রোগ-মুক্তির জন্য পেরুভিয়াজাত ইণ্ডিয়ানগণ এই গাছের বল্কল চর্বণ করত) এবং ফক্সগ্লোভ (foxglove) নামক উদ্ভিদজাত ডিজিটালিস্ (হৃদপিণ্ডকে উত্তেজিত করার জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির পুর্বে অশিক্ষিত চিকিৎসক কর্তৃক ব্যবহৃত ওষুধ)। এইসব গুটিকয়েক চিকিৎসা (এবং বসন্ত রোগের টিকা যা পরে আলোচনা করা হবে) ছাড়া চিকিৎসকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত বহু ওষুধ এবং চিকিৎসা পদ্ধতি মৃত্যুর হার কমানর বদলে বাড়িয়ে দিত।

উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তথাকথিত বহু সুসভ্য দেশও যে মাঝে মাঝে মহামারীতে আক্রান্ত হ'ত (যার কতগুলির গভীর প্রভাব ইতিহাসে লিপিবদ্ধ) তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পেলো-পোনেসিয়ার যুদ্ধের সময় এথেন্সের যে মহামারীতে পেরিক্‌ল্‌সের মৃত্যু হয় তাই শেষ পর্যন্ত গ্রীসের ধ্বংসের কারণ। মারকাস্ অরেলিয়াসের শাসনকালে রোমসাম্রাজ্যে যে মহামারীর আক্রমণ হয় সম্ভবতঃ তারই ফলে রোমসাম্রাজ্যের ধ্বংসের শুরু। হিসাব করে দেখা গিয়েছে

যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে কৃষ্ণ-মৃত্যুর (Black death) আক্রমণে মধ্য যুগের ইউরোপের এক চতুর্থাংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; এই মহামারী এবং বারুদের ব্যবহার একত্র যুক্ত হ'লে মধ্যযুগের সামাজিক কাঠামো বিনষ্ট করে।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, অণুজীবের আক্রমণই মহামারীর সূচনা ও বিস্তারের কারণ --পাস্তুরের এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই মহামারীর আক্রমণ রুদ্ধ হয়নি। ভারতবর্ষে এখনও পর্যন্ত কলেরা স্থানীয় (endemic) রোগ এবং অন্যান্য অনুন্নত দেশসমূহে মহামারীর প্রাদুর্ভাব প্রবল। যুদ্ধকালে, রোগসমূহ প্রধান সমস্যা। সময় সময় নতুন ধরনের মারাত্মক জীবাণুর সৃষ্টি হয় যা সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়; বস্তুতঃ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনফ্লুয়েঞ্জার সর্বগ্রাসী আক্রমণে সারা জগতে যত লোকের মৃত্যু হয়েছে মানব ইতিহাসে মহামারীর আক্রমণে সেরূপ মৃত্যু সংখ্যা বিরল। তবুও পাস্তুরের আবিষ্কার এক মহা পরিবর্তনের সূচনা করল। ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুর হার ক্রমশঃই কমতে লাগল এবং প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ক্রমশঃই বাড়তে শুরু করল। পাস্তুর কর্তৃক সূচিত রোগের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং চিকিৎসার ফলে পৃথিবীর অধিকতর উন্নত দেশ সমূহের নরনারীগণ এখন গড়ে ৭০ বৎসর বাঁচবার আশা করতে পারে। কিন্তু পাস্তুরের আবিষ্কারের পূর্বে সবচেয়ে অনুকূল অবস্থায় এই হার ছিল মাত্র ৪০ এবং প্রতিকূল অবস্থায় মাত্র ২৫ বছর।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পাস্তুরের বীজতত্ত্ব (germ theory) আবিষ্কারের পূর্বেই ভিয়েনার চিকিৎসক ইগনাজ ফিলিপ সেমেলভিস্ প্রথম ব্যাকটিরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী সংগ্রাম করেন—যদিও তিনি জানতেন না যে, তাঁর সংগ্রাম কিসের বিরুদ্ধে। ভিয়েনা হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে তিনি কাজ করতেন, যেখানে শতকরা ১২ জন বা তার অধিক সংখ্যায় নবীন মায়েরা 'পিউয়েরপেরাল' (puerperal) জ্বরে (সহজ বাংলায় 'প্রসূতি-জ্বরে') মারা যেত। সেমেলভিস্ অস্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে, যে সব স্ত্রীলোক অজ্ঞ ধাত্রীর সাহায্যে বাড়ীতেই প্রসব করত তাদের ক্ষেত্রে এই প্রসূতি জ্বর প্রায় অনুপস্থিত ছিল। যখন সেই হাসপাতালেরই একজন ডাক্তার শব ব্যবচ্ছেদ কালে নিজের দেহে ক্ষতের সৃষ্টি করে মারা গেলেন তখন তাঁর দেহে প্রসূতি জ্বরের লক্ষণগুলি লক্ষ্য করে সেমেলভিসের আরো সন্দেহ জাগ্রত হ'ল। যে সব ডাক্তার এবং ছাত্রেরা শব

ব্যবচ্ছেদের ঘর থেকে প্রসবে সাহায্য করতে আসেন তাঁরাই কি এই রোগ বহন করে আনেন ? সেমেলভিস্ ক্লোরিন মিশ্রিত চুনের জলে হাত ধুতে ডাক্তারদের বাধ্য করতে লাগলেন। এক বছরের মধ্যে সেই বিভাগে মৃত্যুর হার শতকরা ১২ থেকে কমে শত করা ১·৫ হ'ল।

কিন্তু বয়স্ক চিকিৎসকেরা ক্রোধান্ধ হলেন। পরোক্ষ হত্যার অপবাদে ক্রুদ্ধ হয়ে এবং হাত ধোয়ায় অপমান বোধ করে তাঁরা সেমেলভিস্‌কে হাসপাতাল থেকে বিতাড়িত করলেন। (এই ব্যাপারে তাঁদের সুবিধা ছিল—কারণ সেমেলভিস্ হাঙ্গেরীবাসী এবং হাঙ্গেরী অষ্ট্রিয়ার শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল)। সেমেলভিস্ বুডাপেস্তে গেলেন, যেখানে প্রসূতি মৃত্যুর হার তিনি কমিয়ে আনলেন, কিন্তু ভিয়েনায় হাসপাতালগুলি পরবর্তী এক যুগেরও কিছু বেশি সময় পর্যন্ত আবার মৃত্যু পুরীতে পর্যবসিত হ'ল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সেমেলভিস্ ৪৭ বছর বয়সে আকস্মিক সংক্রমণে পিউয়েরপেরাল জ্বরেই প্রাণত্যাগ করেন। রোগ সংক্রমণের ব্যাপারে তাঁর ধারণার বৈজ্ঞানিক সমর্থন তিনি দেখে যেতে পারেন নি। ঐ বছরেই পাস্তর রোগগ্রস্ত রেশমকাটে জীবাণুর আবিষ্কার করেন এবং ইংরেজ শল্য চিকিৎসাবিদ্ জোসেফ লিস্টার (বিষমদৃক্—achromate লেন্সের আবিষ্কর্তার পুত্র) স্বতন্ত্রভাবে বীজাণুর বিরুদ্ধে রাসায়নিক আক্রমণ প্রচলন করেন।

লিস্টার চরম সক্রিয় বস্তু ফিনোল [Phenol—কারবলিক এ্যাসিড —Carbolic acid] ব্যবহার করেন। জটিল ভগ্নাস্থির রোগীর (Compound fracture) বন্ধনী বস্ত্রের (dressing) ক্ষেত্রে তিনি বস্তুটি প্রথম ব্যবহার করেন। সে সময় পর্যন্ত যে কোনো জটিল ক্ষতই দূষিত হয়ে ওঠা অবধারিত ছিল। অবশ্য লিস্টার ব্যবহৃত ফিনোল ক্ষতের চারিদিকের কলাগুলি ধ্বংস করত কিন্তু তার ফলে ব্যাকটিরিয়াগুলিও ধ্বংস হ'ত। রোগী অক্লেশে আশ্চর্যভাবে আরোগ্য লাভ করত।

এই ব্যাপারে সাফল্যলাভের পর লিস্টার অস্ত্রোপচার কক্ষেও পিচকারি যোগে ফিনোল ছিটানর ব্যবস্থা চালু করেন। বস্তুটি যদিও সাধারণের শ্বাসকষ্টের কারণ হ'ত, তবুও প্রাণ রক্ষায় সহায়ক ছিল। সেমেলভিসের মতো তাঁকেও বিরুদ্ধপক্ষের মুখোমুখী হতে হয় কিন্তু পাস্তরের গবেষণা কার্যের ফলে বীজবারণের (antisepsis) স্বপক্ষে চিন্তাশীল জনমত গড়ে উঠেছিল, যার জন্য লিস্টারেরই জয় হয়।

ফ্রান্সে পাস্তুরকে অবশ্য আরও কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল (লিস্টারের মতো তাঁর রাষ্ট্রানুমোদিত এম্. ডি. উপাধি ছিল না) কিন্তু তিনি যন্ত্রপাতি ফোটাতে এবং ব্যাণ্ডেজগুলি বাষ্পে নির্বীজিত করতে শল্য চিকিৎসকদের বাধ্য করলেন। লিস্টারের ক্লেশদায়ক ফেনল স্প্রের পরিবর্তে পাস্তুরের ধরনে বাষ্পে নির্বীজন প্রথা (Sterilisation) চালু হয়। আরও মৃদু ধরনের জীববারকের অনুসন্ধান শুরু হ'ল (যেগুলি ব্যাকটিরিয়া ধ্বংস করবে কিন্তু কলা (Tissue) গুলি নয়) এবং সেগুলি আবিষ্কৃত হল।

ইতিমধ্যে জার্মান চিকিৎসক রবার্ট কক্ বিভিন্ন রোগের নির্দিষ্ট ব্যাকৃটিরিয়া-গুলি আবিষ্কার করতে শুরু করেছেন। একটিমাত্র ধরনের ব্যাকৃটিরিয়া চাষের (pure culture) উপায় হিসাবে তিনি স্বতন্ত্রকৃত ব্যাকৃটিরিয়াটির এ্যাগারে (agar—সমুদ্র উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত জিলেটিন (gelatin) ধরনের বস্তু) রোপণের প্রক্রিয়া চালু করেন। যদি সূক্ষ্ম সূচী মুখের সাহায্যে একটি মাত্র ব্যাকৃটিরিয়া উপরোক্ত বস্তুতে স্থানান্তরিত করা হয়, তাহলে শুধু মাত্র সেই ব্যাকৃটিরিয়াটির পুঞ্জ (pure coloney) সেখানে গড়ে উঠে। এইভাবে চাষ করে স্বতন্ত্র ব্যাকটিরিয়ার পুঞ্জ উৎপাদন করা যায় ও পরে পরীক্ষাধীন প্রাণী দেহে পরীক্ষা করে দেখা যায়—সেটি কি রোগের জন্মদাতা। এই কৌশলে শুধুমাত্র যে নির্দিষ্ট সংক্রামক জীবাণুটি চিহ্নিত করা যায় তাই নয়, সেই নির্দিষ্ট জাবাণুটি ধ্বংসের সম্ভাব্য চিকিৎসা সম্বন্ধেও গবেষণা সম্ভব।

এই নতুন পদ্ধতির সাহায্যে কক্ এ্যান্থ্রাক্স (anthrax) রোগ ও যক্ষ্মা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভেষজতত্ত্ব ও শারীরবিদ্যায় তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী কাজ হ'ল যে, রোগীর মৃত্যু না ঘটিয়ে ব্যাকটিরিয়াটি ধ্বংস করার ওষুধের আবিষ্কার। ককের সহকর্মী জার্মান চিকিৎসক ব্যাকটিরিয়া বিশেষজ্ঞ পল্ আরলিক এই অনুসন্ধান কার্যে প্রবৃত্ত হন। তিনি কাজটি 'ম্যাজিক গুলি' (magic bullet) অনুসন্ধান হিসাবে দেখলেন যে, বস্তুটি দেহের ক্ষতি না করে শুধুমাত্র ব্যাকটিরিয়াটিকে আঘাত করবে।

ব্যাকটিরিয়াগুলির রঞ্জনে আরলিক আগ্রহী ছিলেন সুতরাং ব্যাকটিরিয়া ধ্বংসকারী হিসাবে এগুলির সম্ভাব্যতার প্রতি তিনি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হন।

যে রঞ্জকটি অন্যান্য কোষগুলির তুলনায় ব্যাকটিরিয়ার সঙ্গে প্রবলভাবে ক্রিয়া ক'রে সেটি যদি রোগীর পক্ষে ক্ষতিকারক নয় এমন অল্প গাঢ়ত্বে রক্তে প্রবিষ্ট করান হয় তবে নিশ্চয়ই ব্যাকটিরিয়ার মৃত্যু হতে পারে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে আরলিক 'ট্রাইপান রেড' (Trypan red) নামে একটি লাল রঞ্জক আবিষ্কার করেন, যে বস্তুটি সেট্‌সী (Tsetse) মক্ষিকা বাহিত আফ্রিকার ভয়াবহ 'নিদ্রা রোগের' (sleeping sickness) জীবাণু ট্রাইপানোসোম্‌স (Trypanosomes)-কে রঞ্জিত করে। যথাযথ ট্রাইপান রেড রক্তে সূচ যোগে প্রবিষ্ট করালে মৃত্যু না ঘটিয়ে ট্রাইপানোসোমগুলির বিনাশ ঘটায়।

আরলিক কিন্তু সন্তুষ্ট হলেন না—জীবাণুগুলির আরও নিশ্চিত মৃত্যু তিনি চেয়েছিলেন। ট্রাইপান রেড অণুতে 'এ্যাজো' (azo) সমবায় অর্থাৎ একজোড়া নাইট্রোজেন পরমাণু ($-N=N-$) অধিবিষ ক্রিয়ার (toxic effect) জন্য দায়ী অনুমান করে তিনি চিন্তা করলেন, অনুরূপ আর্সেনিক পরমাণুর সমবায়ের ($-AS=AS-$) ফল কিরূপ হবে? রাসায়নিক দৃষ্টিকোণে আর্সেনিক নাইট্রোজেনের অনুরূপ কিন্তু আরও বেশি অধিবিষগুণ সম্পন্ন। আরলিক প্রায় নির্বিচারে একের পর এক আর্সেনিকযুক্ত যৌগিক পদার্থগুলি পরীক্ষা করেন এবং পরীক্ষার সুবিধার জন্য সেগুলির ক্রমিক সংখ্যা নির্দিষ্ট করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে আরলিকের জাপানী ছাত্র সাহাচিরো হাতা ৬০৬ সংখ্যক যৌগটি সিফিলিসের জীবাণুর উপর পরীক্ষা করেন। বস্তুটি পূর্বে ট্রাইপানোসোম্‌ জীবাণুর ক্ষেত্রে অকৃতকার্য হয়েছিল। কিন্তু সিফিলিসের জীবাণুর বিরুদ্ধে বস্তুটি মারাত্মকভাবে কার্যকরী হ'ল (সিফিলিসের জীবাণুকে পাকানো আকর্ষী চেহারার জন্য বলা হয় স্পাইরোকীটি—spirochete)।

আরলিক তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করলেন যে, গ্রীষ্মমণ্ডলে সীমাবদ্ধ রোগ ট্রাইপানো-সোমিয়াসিস্‌ (ঘুম রোগ)-এর আরোগ্য অপেক্ষাও আরও প্রয়োজনীয় কিছু তিনি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। কলম্বাসের সময় থেকে প্রায় চার'শ বছর ধরে সিফিলিস রোগ ইউরোপের গুপ্ত উৎপাতে পর্যবসিত হয়েছিল। (অনুমান করা হয়, কলম্বাসের নাবিকদল ক্যারিবিয়ান ইণ্ডিয়ানদের কাছে থেকে রোগটি আমদানি করে, এবং বদলে ইউরোপীয়ানরা ইণ্ডিয়ানদের বসন্ত রোগটি দান করে)। সিফিলিসের যে কোনো চিকিৎসা ছিল না তাই নয়, লোক-লজ্জার আবরণে রোগটিকে গোপন রাখা হ'ত, তাই এর প্রসার ছিল অবাধ।

জীবনের অবশিষ্ট কাল আরলিক (১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান) ৬০৬

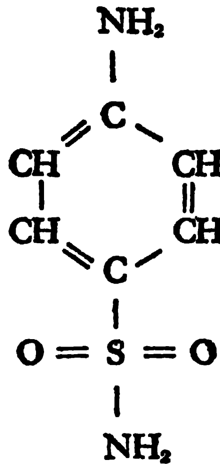
যৌগটির—যার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'স্যালভারসান'—নিরাপদ আর্সেনিক (রাসায়নিক নাম আর্সফিনামিন—arsphenamine) সাহায্যে সিফিলিসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। বস্তুটির রোগ আরোগ্যের ক্ষমতা ছিল, কিন্তু কিছুটা বিপদের সম্ভাবনাও ছিল এবং ওষুধটির নির্ভুল ব্যবহারের জন্য আরলিককে হাসপাতালগুলির উপর জবরদস্তি খাটাতে হ'ত।

আরলিকের সঙ্গে সঙ্গে 'রাসায়নিক চিকিৎসা' বা কেমোথেরাপীর (Chemotherapy) নতুন পর্যায়ের সূত্রপাত হ'ল। উদ্ভিদজাত ওষুধ, যেমন কুইনাইনের পাশাপাশি—উপরোক্ত ওষধটিই প্রথম সংশ্লেষিত ওষুধ (synthetic drug)। স্বভাবতঃই এই আশা জাগল যে, প্রত্যেক রোগই যথাযথভাবে প্রস্তুত রাসায়নিক বিষঘ্নের (antidote) সাহায্যে আরোগ্য করা সম্ভব। কিন্তু আরলিকের পর প্রায় পঁচিশ বছর নতুন আবিষ্কারকদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল না। এই সময়ে একমাত্র সাফল্য জার্মান রসায়নবিদগণ কর্তৃক ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে সংশ্লেষিত 'প্লাসমোশিন' এবং 'এ্যাটাব্রিনের' আবিষ্কার, যেগুলি ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করা সম্ভব। (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই ওষুধ দুটি অরণ্য অঞ্চলে পশ্চিমী সৈন্যদলের কাজে লাগে, কারণ রবারের মতো কুইনাইনের সরবরাহ দক্ষিণ আমেরিকা থেকে বর্তমানে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার তৎকালীন জাপানী অধিকৃত অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছে)।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভাগ্যের দুয়ার খুলল। একজন জার্মান রসায়নবিদ গারহার্ড ডোম্যাক সংক্রামিত ইঁদুরে বিভিন্ন রঞ্জক সূচপ্রয়োগ করছিলেন। মারাত্মক হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকোক্কাস (Hemolytic streptococcus) সংক্রামিত ইঁদুরে তিনি একটি নতুন লাল রঞ্জক প্রণ্টোসিল (Prontosil) অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে ফলাফল লক্ষ্য করেন। ইঁদুরটি বেঁচে গেল। তিন বছরের মধ্যে স্ট্রেপটোকোক্কাস রোগাক্রান্ত মানুষের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রণ্টোসিল জগৎব্যাপী খ্যাতি অর্জন করল।

আশ্চর্যের বিষয়, প্রণ্টোসিল টেস্ট-টিউবস্থ স্ট্রেপটোকোক্কাসগুলি ধ্বংস করতে সক্ষম ছিল না—শুধুমাত্র প্রাণীদেহে এই কাজ করতে পারত। প্যারির পাস্তুর ইনস্টিটিউটের জেঃ ত্রেফুয়েলস (Trefouels) এবং তাঁর সহকর্মীগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, দেহের মধ্যে প্রণ্টোসিল অন্য কোনোও বস্তুতে পরিবর্তিত হয়, যা ব্যাক্‌টিরিয়া ধ্বংসে কার্যকরী। তাঁরা প্রণ্টোসিলকে বিভাজিত করে কার্যকরী অংশটুকু আবিষ্কার করেন, যার নাম 'সালফানিল্যামাইড' (sulfanilamide)

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এই যৌগটি সংশ্লেষিত করা হয়, যা একান্ত ঔদাসীন্যের সঙ্গে প্রকাশিত হয় এবং কালক্রমে বিস্মৃতি লাভ করে। সালফানিল্যামাইডের গঠন নিম্নরূপ—



'অত্যাশ্চর্য ভেষজগুলির' (wonder drugs) মধ্যে এইটিই প্রথম। ক্রমে একের পর এক ব্যাকটিরিয়া বিধ্বংসী আবিষ্কৃত হ'ল। রসায়নবিদরা লক্ষ্য করলেন যে, সালফারযুক্ত গুচ্ছের (group) একটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে বিভিন্ন গুচ্ছের দ্বারা প্রতিস্থাপিত ক'রে নানা শ্রেণীর যৌগিক যথা সাল্ফাপিরিডিন্ (sulfapyridine), সাল্ফাডায়াজিন (sulfadiazine), সাল্ফাথিয়াজোল (sulfathiazole) প্রভৃতি প্রস্তুত করা করা সম্ভব, যেগুলির প্রত্যেকটির ব্যাকটিরিয়া বিধ্বংসী গুণ অপরটির তুলনায় সামান্য পৃথক। বিভিন্ন সংক্রমণের জন্য চিকিৎসকদের তখন বিভিন্ন সালফা ঘটিত ভেষজ থেকে পছন্দ মতো ওষুধ বাছাই করা সম্ভবপর হ'ল। চিকিৎসায় অগ্রসর দেশগুলিতে ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণে, বিশেষ ক'রে নিউমোকোক্কাস ঘটিত নিউমোনিয়া রোগে মৃত্যুর হার নাটকীয়ভাবে কমে গেল।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভেষজতত্ত্ব ও শারীরবিদ্যায় ডোম্যাক্‌কে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রচলিত ধরনে পুরস্কার গ্রহণে সম্মতি জানিয়ে চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গে গেষ্টাপো কর্তৃক তিনি বন্দী হন; কারণ নাৎসী সরকার তাদের বিচিত্র মনোভাবের জন্য নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখার পক্ষপাতী

ছিল না। ডোম্যাক্ পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে বাধ্য হলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন আর পুরস্কার গ্রহণে তাঁর কোনো বাধা রইল না, তখন তিনি প্রথামতো পুরস্কার গ্রহণের জন্য স্টকহল্‌মে গমন করেন।

কিন্তু সাল্‌ফা ভেষজের এই গৌরব অল্পকালস্থায়ী হ'ল—কারণ অধিকতর কার্যকরী নতুন ধরনের জীবাণু-বিধ্বংসী এ্যান্টিবায়োটিক্‌সের (antibiotics) আবিষ্কারে এগুলির গৌরব ম্লান হ'ল।

সমস্ত জীবিত প্রাণী (মানুষ সমেত) কালক্রমে পচন ও ক্ষয়ের ফলে মৃত্তিকায় পর্যবসিত হয়। মৃতবস্তু এবং জীবিত প্রাণীর আবর্জনার সঙ্গে সংক্রামিত বহু রোগের জীবাণু থাকে। তাহ'লে মাটি এই সব সংক্রামক বীজাণু থেকে উল্লেখযোগ্য রূপে মুক্ত থাকে কি করে? খুব কম জীবাণুই (এ্যানথ্রাক্স জীবাণু অন্যতম) মাটিতে বেঁচে থাকতে পারে। অনেক বছর ধরেই জীবাণু-তত্ত্ববিদরা সন্দেহ করতেন যে, মৃত্তিকায় কোনো অণুজীব (microorganism) অথবা কোনো বস্তু পোষণ করে, সেগুলি ব্যাকটিরিয়াগুলি ধ্বংস করে। যাঁরা এই ব্যাকটিরিয়া বিধ্বংসী (bacteriacides) যথেচ্ছ অনুসন্ধান শুরু করেন, রকফেলার ইনস্টিটিউটের রেনি জুল্‌স্ ডুবো তাঁদের অন্যতম। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্তিকাজাত অণুজীব ব্যাসিলাস্ ব্রিভিস (Bacillus brevis থেকে দুইটি ব্যাকটিরিয়া-হন্তা বস্তু স্বতন্ত্র করেন, যে দুটির তিনি নাম দেন—'গ্র্যামিসিডিন্' (Gramicidin) এবং 'টাইরোসিডিন' (Tyrocidin । দেখা গেল, এই দুইটি ডেকস্ট্রো-এ্যামিনো এ্যাসিডযুক্ত পেপটাইড—যা সাধারণ প্রোটিন সংগঠনকারী লিভো-এ্যামিনো এ্যাসিডের দর্পণ প্রতিরূপ (mirror image)।

এ্যান্টিবায়োটিকগুলির মধ্যে এইভাবে প্রস্তুত গ্র্যামিসিডিন্ ও টাইরোসিডিন্ প্রথম। কিন্তু অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বলে ভবিষ্যতে প্রমাণিত হবে এমন একটি এ্যান্টিবায়োটিক, বারো বছর পূর্বে আবিষ্কৃত এবং কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে যা আলোচিত হয়েছিল।

বৃটেনবাসী জীবাণুতত্ত্ববিদ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং এক সকালে লক্ষ্য করেন যে, স্ট্যাফাইলোকোক্কাস্ জীবাণুর (সাধারণ স্ফোট সৃষ্টিকারী জীবাণু) কালচার, যা তিনি একটি বেঞ্চির উপর ফেলে রেখেছিলেন, একটা কিছুর দ্বারা সংক্রামিত হয়েছে, যেটি জীবাণুগুলি ধ্বংস করেছে। কালচার করার ডিশে, যেখানে

স্ট্যাফাইলোকোক্কাস্‌গুলি ধ্বংস হয়েছে সেখানে পরিষ্কার সব চক্রাকৃতি দাগ। ফ্লেমিং বিষঘ্ন (antisepsis) ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। (তিনি চোখের জলে একটি বিষঘ্নগুণ সম্পন্ন এনজাইম আবিষ্কার করেন, যার নাম 'লাইসোজোম্' (lysozome)। তৎক্ষণাৎ তিনি অনুসন্ধান করলেন কি কারণে উক্ত ব্যাকটিরিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আবিষ্কার করলেন যে, বস্তুটি সাধারণ পাঁউরুটিজাত ছত্রাক 'পেনিসিলিয়াম নোটেটাম্' (Penicillium notatum)। উক্ত ছত্রাক এমন কিছু উৎপন্ন করেছে যা জীবাণুর পক্ষে মারাত্মক। ফ্লেমিং ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ক'রে আপন কর্তব্য সমাধা করেন, কিন্তু সেকালে ব্যাপারটা কারুর মনোযোগ তেমন আকর্ষণ করেনি।

দশ বছর পরে বৃটিশ প্রাণরসায়নবিদ হাওয়ার্ড ওয়ালটার ফ্লোরি এবং তাঁর জর্মান বংশজ সহযোগী আর্নেস্ট বেরিস চেইন প্রায় বিস্মৃত এই আবিষ্কারে আকৃষ্ট হন এবং জীবাণু-বিধ্বংসী বস্তুটি স্বতন্ত্র করার চেষ্টা করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা একটি নির্যাস লাভ করেন, যা 'গ্র্যামপজিটিভ (gram-positive) ব্যাকটিরিয়ার (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কবাসী জীবাণুতত্ত্ববিদ্ হ্যান্‌স্ ক্রিশ্চিয়ান জোয়াকিস্ গ্র্যাম্ কর্তৃক আবিষ্কৃত রঞ্জকটি যে সকল ব্যাকটিরিয়াকে রঞ্জিত করে ; বিরুদ্ধে চিকিৎসাক্ষেত্রে কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়।

যুদ্ধকালীন বৃটেনে পেনিসিলিন উৎপাদন সম্ভব না হওয়ায় ফ্লোরি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে একটি কর্মসূচী প্রণয়নে সাহায্য করেন, যার ফলে পেনিসিলিন শুদ্ধিকরণ এবং ছত্রাকের সাহায্যে বস্তুটির দ্রুত উৎপাদনের প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়। যুদ্ধের অবসানে ব্যাপকভাবে পেনিসিলিন উৎপাদন শুরু হ'ল। পেনিসিলিন যে শুধুমাত্র সাল্‌ফা ভেষজকেই স্থানচ্যুত করল তাই নয়, সমগ্র চিকিৎসার ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত এইটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি ওষুধ। ব্যাপক সংক্রমণের ক্ষেত্রে বস্তুটি কার্যকরী, যার মধ্যে পড়ে—নিউমোনিয়া, গনোরিয়া. সিফিলিস, প্রসূতি জ্বর (puerperal fever), স্কারলেট জ্বর (scarlet fever) এবং মেনিনজাইটিস (meningitis)। তাছাড়া একমাত্র পেনিসিলিন-সচেতন (penicilin sensitive) ব্যক্তির দেহে ছাড়া, বস্তুটির কার্যতঃ কোনো অধিবিষ শক্তি বা আনুষঙ্গিক অপ্রীতিকর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লেমিং, ফ্লোরি এবং চেইন একত্রে ভেষজতত্ত্ব ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

পেনিসিলিন আবিষ্কারের ফলে অবিশ্বাস্যভাবে এ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাপক

অনুসন্ধান শুরু হ'ল। (১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে রুটজার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাণুতত্ত্ববিদ্ সেল্ম্যান এ. ওয়াক্সম্যান কর্তৃক 'এ্যান্টিবায়োটিক' শব্দটি স্বোদ্ভাবিত হয়)।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াক্স্ম্যান মৃত্তিকাস্থ স্ট্রেপটোমাইসিস্ (streptomyces) প্রজাতির ছত্রাক থেকে এ্যান্টিবায়োটিক পৃথক করেন, যেটির নাম "স্ট্রেপটো-মাইসিন্"। স্ট্রেপটোমাইসিন্ 'গ্র্যাম্-নেগেটিভ (gram negative) [রঞ্জকটি যে সকল ব্যাকটিরিয়া রঞ্জিত করতে পারে না] ব্যাক্টিরিয়াগুলি আক্রমণ করে। টিউবারকুলার ব্যাসিলাসগুলির (যক্ষ্মার জীবাণু) বিরুদ্ধে এর বিজয়ই সর্বোত্তম। কিন্তু পেনিসিলিনের বৈপরীত্যে স্ট্রেপটোমাইসিনের অধিবিষ ক্রিয়া বেশি, তাই বস্তুটির ব্যবহারে সাবধানতা অবশ্য প্রয়োজন।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কারের জন্য ওয়াক্স্ম্যান ভেষজতত্ত্ব ও শারীর বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রেপটোমাইসিস্ প্রজাতির ছত্রাক থেকে আর একটি এ্যান্টিবায়োটিক ক্লোরামফেনিকল্ (chloramphenicol) স্বতন্ত্র করা হয়। এই বস্তুটি যে শুধু গ্র্যাম-পজিটিভ এবং গ্র্যাম্-নেগেটিভ্ ব্যাকটিরিয়াগুলিকে আক্রমণ করে তাই নয়, আরও কিছু কিছু ক্ষুদ্র জীবাণুকে আক্রমণ করে, যেমন টাইফাস্ জ্বর এবং সাইটাকোসিস্ (psittacosis) বা প্যারট্-ফিভার (parrot fever)-এর বীজাণু। কিন্তু বস্তুটির অধিবিষ শক্তির জন্য, ব্যবহারে সাবধানতা প্রয়োজন।

এর পর অনেকগুলি "প্রশস্ত-বর্ণালীর" (broad-spectrum) এ্যান্টি-বায়োটিক আবিষ্কৃত হল, যেমন—অরিওমাইসিন্ (Aureomycin) টেরা-মাইসিন্, এ্যাক্রোমাইসিন্ (Achromycine) প্রভৃতি। এইগুলিকে বলা হয় "চতুর্বলয়ী" (tetracyclines), কারণ প্রত্যেকটির অণুগুলি পাশাপাশি চারটি বলয় বা চক্রে (rings) গঠিত। এইগুলি বহু জীবাণুর বিরুদ্ধেই ফলপ্রদ এবং বস্তুগুলির অধিবিষ শক্তি অপেক্ষাকৃত কম। তবে এইগুলির আনুষঙ্গিক কুফলগুলির অন্যতম বিরক্তিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হচ্ছে, পরিপাক পথের প্রয়োজনীয় ব্যাকটিরিয়াগুলি নষ্ট ক'রে স্বাভাবিক পরিপাক ক্রিয়া ব্যাহত ক'রে উদরাময়ের সৃষ্টি করা।

পেনিসিলিনের পরই (সবচেয়ে সস্তা ঔষধ), টেট্রাসাইক্লিন (চতুর্বলয়ী) শ্রেণীর এ্যান্টিবায়োটিকসমূহ বর্তমানে সংক্রমণের ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত ঔষধ

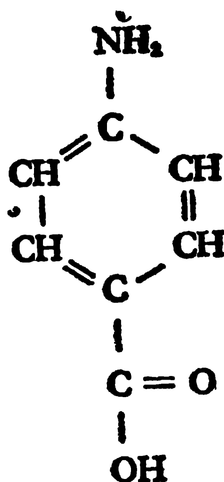
এবং এ্যান্টিবায়োটিকের কল্যাণে বহু সংক্রামক রোগেরই আক্রমণে মৃত্যুহার বর্তমানে খুবই কম।

এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে একমাত্র হতাশার কারণ, প্রতিরোধশক্তিসম্পন্ন ব্যাকটিরিয়াগুলির ত্বরিত উদ্ভব ঘটে। ব্যাকটিরিয়াগুলি প্রতিরোধ করতে "শেখে না", স্বাভাবিক প্রজাতিগুলি এ্যান্টিবায়োটিকগুলির প্রভাবে ধ্বংস হ'লে, পরিব্যক্তির ফলে নতুন ধরনের প্রজাতির সৃষ্টি হয়, যেগুলির প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রবলতর। এই ভয় হাসপাতালগুলিতে বেশি, যেখানে এ্যান্টিবায়োটিকগুলির সর্বদাই ব্যবহার হয় এবং রোগীদের সংক্রমণ রোধ ক্ষমতা স্বাভাবিকের তুলনায় কম। স্টাফাইলোকোকাস্ শ্রেণীর কতকগুলি নতুন প্রজাতি বিশেষভাবে এ্যান্টিবায়োটিকগুলি প্রতিরোধ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে এই "হাসপাতাল স্ট্যাফ"(staph) গুলি বিশেষ উদ্বেগের কারণ।

সৌভাগ্যক্রমে কোনো ক্ষেত্রে একটি এ্যান্টিবায়োটিক বিফল হ'লে অপরটি তখনো প্রতিরোধসম্পন্ন বীজাণুকে আক্রমণ করতে সক্ষম। পরিব্যক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নতুন এ্যান্টিবায়োটিকগুলি এবং পুরনোগুলির সংস্কারসাধন সুফলপ্রদ হতে পারে। যদি এমন কোনো এ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হয় যে, যার বিরুদ্ধে পরিব্যক্ত প্রজাতিগুলিও প্রতিরোধে সক্ষম নয়, তবে তাই হবে সর্বোৎকৃষ্ট। সে ক্ষেত্রে সেই বিশেষ ব্যাকটিরিয়ার বংশ-বৃদ্ধির জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এই ধরনের কিছু কিছু পদার্থের আবিষ্কার হয়েছে। তার মধ্যে পড়ে নতুন এ্যান্টিবায়োটিকগুলি, সংস্কৃত পেনিসিলিন ও টেট্রাসাইক্লিনগুলি, নতুন সাল্ফা ভেষজগুলি এবং নতুন সংশ্লেষিত ভেষজগুলি, যা পুর্বে ব্যবহৃত হয়নি (যেমন নাইট্রোফ্যুরান—nitrofuran)। এমন কি, হাসপাতালগুলিতে ব্যাকটিরিয়া ধ্বংসের জন্য পুরনো প্রথামতো পিচকারি যোগে এগুলি ছিটানোর প্রথাও চালু করা হচ্ছে। মোটের উপর, আমাদের রসায়নজ্ঞান রোগের বীজাণুগুলির প্রসারের বিরুদ্ধে জয়ী হবে বলেই আশা করা যায়।

কি ভাবে 'রাসায়নিক ভেষজবর্গের' (chemotherapeutic) ওষুধগুলি কাজ করে? আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট অনুমান এই যে, প্রত্যেকটি ওযুধই প্রতিযোগিতামূলকভাবে জীবাণুগুলির এক একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উৎসেচকের উৎপাদনে নিরোধক হিসাবে কাজ করে। সাল্ফা ভেষজের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ভালোভাবে প্রমাণ করা যায়। এগুলি, গঠনে প্যারা-এ্যামিনো-বেনজোয়িক

এ্যাসিডের নিকট-সদৃশ। প্যারা-এ্যামিনো-বেনজোয়িক এ্যাসিডের গঠন নিম্নরূপ :



ব্যাকটিরিয়া এবং অন্যান্য কোষের বিপাক ক্রিয়ার পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় 'ফোলিক এ্যাসিড' (folic acid) সংশ্লেষণের জন্য প্যারা-এ্যামিনো-বেনজোয়িক এ্যাসিড প্রয়োজন। যে ব্যাকটিরিয়াটি প্যারা-এ্যামিনো-বেনজোয়িক এ্যাসিডের বদলে সালফানিল্যামাইড অণুটি গ্রহণ করে, সেটি আর ফোলিক এ্যাসিড উৎপাদনে সক্ষম হয় না, কারণ উক্ত প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় উৎসেচকটির নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। ব্যাকটিরিয়াটির বৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অপরপক্ষে মনুষ্য দেহের কোষগুলির কোনো ক্ষতি হয় না, কারণ সেগুলি ফোলিক এ্যাসিড সংশ্লেষিত করে না, খাদ্যবস্তু থেকে গ্রহণ করে। মনুষ্য কোষে এমন কোনো উৎসেচকের উপস্থিতি নেই, যেগুলির ক্রিয়া এইভাবে স্বল্প মাত্রার সাল্‌ফা ভেষজ-দানে ব্যাহত হয়।

যেখানে ব্যাকটিরিয়া এবং মনুষ্য কোষের একই ধরনের উৎসেচক আছে সেখানেও ব্যাকটিরিয়াটিকে পৃথকভাবে আক্রমণ করার অন্য উপায় আছে। প্রদত্ত কোনো বিশেষ ভেষজ ব্যাকটিরিয়ার উৎসেচকের পক্ষে মানুষের উৎসেচক অপেক্ষা অধিকতর মারাত্মক হতে পারে, সেক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ভেষজটি ব্যাকটিরিয়া ধ্বংস করবে কিন্তু মনুষ্য কোষের বেশি কিছু ক্ষতি হবে না।

অথবা বিশেষ আকৃতির কোনো ওষুধ ব্যাকটিরিয়ার কোষ-আবরণী ভেদ করতে পারে কিন্তু মনুষ্যকোষের আবরণী ভেদ করতে পারে না।

এ্যান্টিবায়োটিকগুলিও কি উৎসেচগুলির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতামূলক নিরোধক (Competitive inhibition) হিসাবে কাজ করে? এই প্রশ্নের উত্তর খুব পরিষ্কার নয়। কিন্তু অন্ততঃ কতকগুলি ক্ষেত্রে যে এরূপই করে, তা বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, গ্র্যামিসিডিন্ ও টাইরোসিডিনে 'অস্বাভাবিক' ডেক্সট্রো এ্যামিনো এ্যাসিডগুলি রয়েছে। সম্ভবতঃ যে উৎসেচকগুলি স্বাভাবিক লিভো-এ্যামিনো এ্যাসিডগুলি থেকে যৌগিক পদার্থসমূহ সৃষ্টি করে, সেগুলিতে ডেক্সট্রো এ্যামিনো এ্যাসিডগুলি বাধার সৃষ্টি করে। আর একটি পেপটাইড এ্যান্টিবায়োটিক ব্যাসিট্রাসিনে (bacitracin) অরনিথিন (ornithine) রয়েছে এবং এটি এর অনুরূপ আরজিনিন (arginine) ব্যবহারে উৎসেচকগুলিকে বাধা দিতে পারে। স্ট্রেপটোমাইসিনে ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতি বর্তমান ; এটির অণুতে একটি আশ্চর্য ধরনের শর্করা অণু রয়েছে, যেটি হয়ত এমন কোনো উৎসেচকের কার্যকারিতা নষ্ট করে যে, উৎসেচকটি জীবিত কোষের স্বাভাবিক শর্করাগুলিতে ক্রিয়া করে। আবার ক্লোরামফেনিকলটি ফিনাইল্যালানাইন (phenylalanine) নামক এ্যামিনো এ্যাসিডটির অনুরূপ; সেইরূপ পেনিসিলিন অণুর একটি অংশ এ্যামিনো এ্যাসিড "সিস্টিনে"র অনুরূপ। এই উভয় ক্ষেত্রেই 'প্রতিযোগিতামূলক নিরোধকের' সম্ভবনা খুব বেশি।

স্ট্রেপটোমাইসিন জাতীয় ছত্রাকজাত দ্রব্য 'পিউরোমাইসিনই (puromycine) এ্যান্টিবায়োটিকের প্রতিযোগিতামূলক ক্রিয়ার বিশিষ্ট উদাহরণ। এই যৌগিক পদার্থটির গঠন অনেকটা নিউক্লিওটাইডের মতো (নিউক্লিক এ্যাসিড গঠনকারী অণু) এবং জনস্ হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকেল ইয়ারমোলিন্স্কি এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ প্রমাণ করেন যে, পিউরোমাইসিন 'ট্রান্সফার-আর, এন্-এ'র সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে প্রোটিন সংশ্লেষে বিঘ্ন ঘটায়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ধরনের বিঘ্ন, ব্যাকটিরিয়া ছাড়াও অন্যান্য কোষের পক্ষে অধিবিষের কাজ করে, কারণ এই প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় প্রোটিনের স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যাহত হয়। সুতরাং ওষুধ হিসাবে পিউরোমাইসিনের ব্যবহার, একান্তই বিপজ্জনক।

॥ বিষাণুসমূহ (Viruses) ॥

'আশ্চর্য ভেষজগুলি' (wonder drugs) ব্যাকটিরিয়া ঘটিত রোগের বিপক্ষে সুফলপ্রদ হলেও বিষাণু ঘটিত রোগের বিরুদ্ধে তেমন কার্যকরী না হওয়ায় অধিকাংশ লোকের কাছে ব্যাপারটা রহস্যময় বলে মনে হতে পারে। যখন বিষাণুগুলি বংশবৃদ্ধির সাহায্যেই রোগ সৃষ্টি করে তখন ব্যাকটিরিয়াগুলিকে যেভাবে বিকল করা যায়, বিষাণুগুলিকেও সেইভাবে বিকল করা যাবে না কেন? উত্তর খুবই সহজ এবং বস্তুতঃ বিষাণুগুলির বংশবৃদ্ধির ধরন বোধগম্য হলে তা আরো স্পষ্ট হবে। সম্পূর্ণ পরজীবী হিসাবে এগুলি জীবিত কোষ ছাড়া অন্যত্র বংশবৃদ্ধি করতে অক্ষম এবং বিষাণুর নিজস্ব কোনো বিপাকযন্ত্র নেই বললেই চলে। নিজের অনুকৃতি সৃষ্টির জন্য আক্রান্ত কোষগুলির যোগান দেওয়া পদার্থগুলির উপর বিষাণুগুলিকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। সুতরাং কোষগুলির ধ্বংসসাধন না করে বিষাণুগুলির খাদ্যসংগ্রহ বা এগুলিকে বিকল করা একান্তই মুস্কিল।

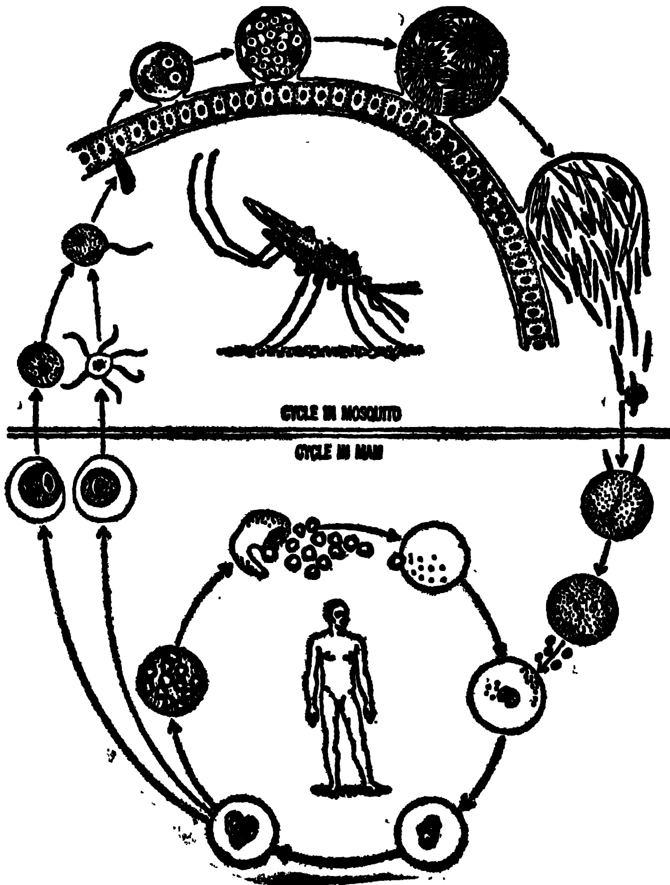
ক্রমশঃ সরলতর প্রাণের পরিচয় লাভের শেষ পর্যায়ে জীববিদ্যাবিদগণ মাত্র অল্পদিন আগে বিষাণুগুলি আবিষ্কার করেন। সম্ভবতঃ এই আলোচনার শুরুতে ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্কারের কাহিনীটিই প্রশস্ত।

১৮৮০ সাল পর্যন্ত লোকের ধারণা ছিল যে, জলা অঞ্চলের দূষিত বাতাসই (ইতালীয় ভাষায় "mala aria" অর্থ 'দূষিত বায়ু') ম্যালেরিয়া রোগের উৎপত্তির কারণ। সেই সময় বছরের পর বছর যত লোকের এই রোগে মৃত্যু হ'ত, অন্য যে কোনো সংক্রামক রোগের তুলনায় তার সংখ্যা ছিল বেশি। তার-পর ফরাসী জীবাণুতত্ত্ববিদ শার্ল লুই আলফোঁস ল্যাভেরাঁ ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ব্যক্তির লোহিত কণিকায় প্লাসমোডিয়াম (plasmodium) গোষ্ঠীয় পরজীবী প্রোটোজোয়ার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের জন্য ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাভেরাঁকে, ভেষজতত্ত্ব ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

হংকংএ মিশনারী হাসপাতালের পরিচালক ইংরেজ চিকিৎসক প্যাট্রিক ম্যানসন্ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, জলা অঞ্চলে শুধু দূষিত বায়ুই নয় মশারও অস্তিত্ব বর্তমান এবং অভিমত প্রকাশ করেন যে, ম্যালেরিয়া সংক্রমণে মশার কিছু একটা ভূমিকা আছে। ভারতবর্ষে এক ইংরেজ চিকিৎসক রোনাল্ড রস্ এই ধারণার বশবর্তী হয়ে গবেষণা করেন এবং প্রমাণ করেন যে, ম্যালেরিয়ার পরজীবী জীবাণু, তার জীবনচক্রের একটি অংশ মশার মধ্যে অতিবাহিত করে (এ্যানোফিলিস—Anopheles গোষ্ঠীয়

মশা)। মশা ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত পানের সঙ্গে এই জীবাণু আপনার দেহের অভ্যন্তরে গ্রহণ করে এবং পরে সুস্থ ব্যক্তিকে দংশনের মাধ্যমে সেই জীবাণু সুস্থ ব্যক্তির দেহে অনুপ্রবিষ্ট করায়।

বাহক পতঙ্গ (insect vector) কর্তৃক রোগ সংক্রমণের ব্যাপারটি গবেষণার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রস্ ভেষজতত্ত্ব ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আধুনিক ভেষজবিদ্যার ক্ষেত্রে



ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবন চক্র

এই আবিষ্কার খুবই মূল্যবান। কারণ, এর ফলে প্রমাণিত হ'ল যে, বাহক পতঙ্গের বিনাশ সাধন ক'রে কোনো রোগ নির্মূল করা সম্ভব। যে সকল জলায়

মশার জন্ম সেগুলি উদ্ধার ক'রে, বদ্ধজল মুক্ত ক'রে, পতঙ্গনাশক রাসায়নিক ব্যবহারে মশককুল ধ্বংস ক'রে, ম্যালেরিয়া নির্মূল করা সম্ভব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, ঠিক এই উপায়ে, পৃথিবীর বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চল ম্যালেরিয়া মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

ম্যালেরিয়াই সংক্রামক রোগগুলির মধ্যে প্রথম, যার উৎপত্তি ব্যাকটিরিয়া শ্রেণীর জীবাণুর (এক্ষেত্রে প্রোটোজোয়া শ্রেণীর) দ্বারা নয় ব'লে আবিষ্কৃত হয়। শীঘ্রই অপর একটি রোগের কারণ আবিষ্কৃত হ'ল, যেটির উৎপত্তির কারণও ব্যাকটিরিয়া শ্রেণীর জীবাণু নয়। সেই রোগটি হচ্ছে মারাত্মক পীতজ্বর (yellow fever)। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রিও-ডি-জেনেরিওয় এই রোগের মারীতে আক্রান্তদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনের মৃত্যু হয়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কিউবায় পীতজ্বরের মহামারী শুরু হলে জীবাণুতত্ত্ববিদ ওয়াল্টার রীডের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের এক অনুসন্ধান পর্ষদ (United States Board of Inquiry) এই রোগের কারণ অনুসন্ধানের জন্য কিউবায় গমন করেন।

এই রোগ সংক্রমণের ব্যাপারে রীড এক ধরনের মশাকে বাহক ব'লে সন্দেহ করেন, ঠিক যেমন ম্যালেরিয়া এক ধরনের মশার দ্বারা সংক্রামিত হয়। এ রোগটি যে রোগীদের এবং ডাক্তারের পরস্পরের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ অথবা রোগীর কাপড়চোপড় বা বিছানা মারফৎ সংক্রামিত হয় না সে তত্ত্বটি তিনি প্রথমে প্রমাণ করেন। তারপর কয়েকজন ডাক্তার স্বেচ্ছায় কতকগুলি মশার দংশন নিজেদের দেহে গ্রহণ করলেন, যে মশাগুলি তার আগে পীতজ্বরগ্রস্ত রোগীদের দংশন করেছিল। তাঁরা রোগাক্রান্ত হলেন এবং সেই সাহসী গবেষকদের কয়েকজনের মৃত্যুও হ'ল। কিন্তু রোগ সংক্রমণের জন্য দায়ী ব'লে "ঈডিস ঈজিপ্টি" (Aedes aegypti) গোষ্ঠীর মশাকে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হ'ল। কিউবার মহামারী রোধ করা গেল এবং বর্তমানে চিকিৎসায় উন্নত দেশগুলিতে পীতজ্বর আর কোনো সমস্যাই নয়।

অ-ব্যাকটিরিয়াসম্ভূত তৃতীয় রোগের উদাহরণ হচ্ছে টাইফাস্ জ্বর (Typhus fever)। এটি উত্তর আফ্রিকার স্থানিক রোগ (endemic) এবং উত্তর আফ্রিকায় মূরদের সঙ্গে স্পেনীয়দের দীর্ঘকালীন যুদ্ধের সময় স্পেন মারফৎ রোগটি ইউরোপে প্রসারলাভ করে। সাধারণভাবে 'প্লেগ' নামে পরিচিত এই রোগটি খুবই ছোঁয়াচে এবং বহু জাতির বিরাট ক্ষতির কারণ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সার্বিয়ার সৈন্যদল অপারগ হলেও, এই রোগের আক্রমণ অস্ট্রিয়ার সৈন্য

দলকে সার্বিয়া ত্যাগে বাধ্য করে। যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধের ফলে পরবর্তীকালে এই রোগের আক্রমণে পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ার যে ক্ষতি হয় (প্রায় ৩০ লক্ষ লোক এই রোগের কবলে প'ড়ে প্রাণত্যাগ করে) তা যে কোনো সামরিক আক্রমণে উদ্ভূত ক্ষতির সমান।

বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে টিউনিসের পাস্তর ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ফরাসী জীবাণুতত্ত্ববিদ শ্যার্ল নিকোল লক্ষ্য করেন যে, শহরে যখন এই রোগের প্রবল মারী তখন হাসপাতালে কারুর এই রোগ হয় না। ডাক্তার এবং নার্সরা টাইফাস আক্রান্ত রোগীদের দৈনন্দিন সংস্পর্শে আসেন, হাসপাতালগুলিতে রোগীর ঠাসাঠাসি, তা সত্ত্বেও সেখানে রোগের প্রসার নেই। নিকোল চিন্তা করতে লাগলেন, হাসপাতালে রোগী এলে কি এমন ঘটে ? তাঁর মনে উদয় হ'ল যে,সবচেয়ে গুরুতর যে পরিবর্তন হয় তা হচ্ছে রোগীদের উকুনভর্তি পোশাকগুলি, তা পরিবর্তন ক'রে তাদের ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। নিকোল সিদ্ধান্ত করলেন, দেহের উকুনই টাইফাস রোগের বাহক। তিনি পরীক্ষা ক'রে আপন অনুমানের যথার্থতা প্রমাণ করেন। এই আবিষ্কারের জন্য ১৯২৮ সালে তিনি ভেষজতত্ত্ব ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর আবিষ্কারের ফলেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে টাইফাস রোগ কোনো সমস্যাই ছিল না, সামরিক ও অসামরিক সকল ব্যক্তিকেই ডি. ডি. টির সাহায্যে উকুনমুক্ত করা হয়। ইতিহাসে উল্লিখিত যুদ্ধগুলির মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, একমাত্র এই যুদ্ধেই রোগে মৃতের সংখ্যা বন্দুক ও বোমায় নিহতের সংখ্যার চেয়েও কম।

পীতজ্বরের মতোই টাইফাস রোগের কারণ ব্যাকটিরিয়ার থেকেও ক্ষুদ্র এক ধরনের জীব এবং এখন আমরা এমন এক আশ্চর্য জগতে প্রবেশ করব যেখানে ব্যাকটিরিয়ার চেয়ে ক্ষুদ্রতর জীবসমূহের বাস।

এই জগতের বস্তু সমূহের আয়তনের ধারণা লাভের জন্য ক্রমক্ষুদ্র বস্তুসমূহের আয়তন লক্ষ্য করা যাক। মানব ডিম্বকোষের ব্যাস ১০০ মাইক্রোন্‌স্ (এক মিটারের ১০ কোটি ভাগের এক ভাগ) এবং খালি চোখে বস্তুটিকে কোনোরকমে দেখা যায়। বৃহৎ প্রোটোজোয়া প্যারামেসিয়াম্ (Paramecium), যাকে উজ্জ্বল আলোকে এক ফোঁটা জলের মধ্যে চলমান অবস্থায় দেখা যায়, সেটিও প্রায় ঐ আকারের। সাধারণ মনুষ্যকোষ আয়তনে ঐগুলির দশ ভাগের একভাগ

ব্যাস প্রায় দশ মাইক্রোন্‌স্‌) এবং সেগুলিকে অণুবীক্ষণের সাহায্য ছাড়া দেখা যায় না। লোহিত কণিকাগুলি আরও একটু ক্ষুদ্র—সর্ববৃহৎটির ব্যাস প্রায় সাত মাইক্রোনস্‌। ব্যাক্‌টিরিয়ার আয়তন, সর্ববৃহৎগুলি সাধারণ কোষের সমান এবং তারপর ক্রমশঃই ক্ষুদ্র হতে থাকে। দণ্ডাকৃতি (rod-shaped) ব্যাক্‌টিরিয়াগুলির গড় দৈর্ঘ্য মাত্র দু-মাইক্রোন্‌স্‌ এবং ক্ষুদ্রতম ব্যাকটিরিয়াগুলি গোলাকৃতি (spheres), যার ব্যাস এক মাইক্রোনের দশ ভাগের চার ভাগের চেয়ে বেশি নয়। সেগুলি সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোনোরকমে দেখা যায়।

এই অবস্থায় জীব, আপাতদৃষ্টিতে যে ক্ষুদ্রতম আয়তনে স্বনির্ভরশীল জীবনে প্রয়োজনীয় বিপাকতন্ত্রের যন্ত্রাদির অবস্থিতি সম্ভব, সেই আয়তন লাভ করে। এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর কোনো জীবের স্বনির্ভর কোষ সম্ভব নয় এবং সেটিকে পরজীবী হিসাবেই বাঁচতে হবে। সেই জীবসমূহকে বাড়তি মালপত্রের মতো বেশির ভাগ উৎসেচক উৎপাদনকারী যন্ত্রাদি ত্যাগ করতে হবে। কোনো কৃত্রিম খাদ্যে, তা সে যতই পর্যাপ্ত হোক না কেন, সেগুলির পক্ষে বৃদ্ধিলাভ ও বংশবৃদ্ধি সম্ভব নয়। সে কারণেই ব্যাকটিরিয়ার মতো এগুলিকে টেস্টটিউবের অভ্যন্তরে পোষণ সম্ভব নয়। একমাত্র জীবিত কোষেই এগুলির বৃদ্ধিলাভ সম্ভব, যা অনুপস্থিত উৎসেচকগুলির যোগান দেবে। স্বভাবতঃই এইরকম কোনো পরজীবী, পোষক কোষের সাহায্যেই বৃদ্ধিলাভ ও বংশবৃদ্ধি করবে।

তরুণ মার্কিন রোগ-বিদ্যাবিদ্‌ হাওয়ার্ড টেইলর রিকেটস্‌ সর্বপ্রথম এই ধরনের উপব্যাকটিরিয়া আবিষ্কার করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'রকি পর্বত স্পটেড ফিভার' (Rocky Mountain spotted fever) নামক রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন, যে রোগের প্রসার হয় পোকা মারফৎ (যে পোকা রক্ত চোষণকারী আরথ্রোপোডা পর্বের (phylum arthropods) মাকড়সার সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট প্রাণী, পতঙ্গের সঙ্গে নয়)। সংক্রামিত পোষক কোষের মধ্যে তিনি প্রোত-বস্তু সমূহ (inclusion bodies) লক্ষ্য করেন, যেগুলি অতিক্ষুদ্র জীব হিসাবে স্থিরীকৃত হয় এবং আবিষ্কর্তার সম্মানে এগুলির নামকরণ করা হয় 'রিকেটসিয়া' (Rickettsia)। রিকেটস্‌ এবং অন্যান্যরা শীঘ্রই আবিষ্কার করেন যে, টাইফাসও রিকেটসিয়া ধরনের রোগ। এই তথ্যের প্রমাণ সংগ্রহকালে রিকেটস্‌ নিজে টাইফাস রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তবুও রিকেটসিয়ার আয়তন ক্লোরামফেনিকল এবং টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় এ্যান্টিবায়োটিকগুলির আক্রমণের পক্ষে যথেষ্টই বড়। এইগুলির ব্যাস এক মাইক্রোনের পাঁচের চার ভাগ থেকে এক মাইক্রোনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত হয়। আপাতদৃষ্টিতে এইগুলির নিজস্ব বিপাক যন্ত্রাদি যথেষ্টই রয়েছে, যার উপর এ্যান্টিবায়োটিকগুলির প্রতিক্রিয়া পোষক কোষ থেকে ভিন্ন। সুতরাং রিকেটসিয়া শ্রেণীর রোগগুলির বিপদ, এ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসার ফলে বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

মাপের নিম্নতম সীমায়, বিষাণুগুলির (Viruses) শুরু। মাপে এইগুলি রিকেটসিয়ার সমান অবস্থায় শুরু, বস্তুতঃ রিকেটসিয়া এবং বিষাণুগুলির মধ্যে পার্থক্যের নির্দিষ্ট সীমা নেই। কিন্তু ক্ষুদ্রতম বিষাণুগুলি সত্যই ক্ষুদ্র। উদাহরণ স্বরূপ, পীতজ্বরের বিষাণুর ব্যাস এক মাইক্রোনের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। বিষাণুগুলি এতই ক্ষুদ্র যে কোষে এইগুলিকে আবিষ্কার করা অথবা কোনো সাধারণ অণুবীক্ষণের (optical microscope) সাহায্যে এইগুলিকে দেখা সম্ভব নয়।

কার্যতঃ বিষাণুতে বিপাকযন্ত্র সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। পোষক কোষের উৎসেচক উৎপাদক যন্ত্রের উপর এইগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কিছু কিছু বৃহত্তম বিষাণু কোনো কোনো এ্যান্টিবায়োটিকগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু অধিকাংশ বিষাণুগুলির বিরুদ্ধেই সেগুলি অকার্যকরী।

চূড়ান্তভাবে আবিষ্কারের কয়েক দশক পূর্বেই বিষাণুর অস্তিত্ব সন্দেহ করা হয়েছিল। জলাতংক রোগের পর্যবেক্ষণে পাস্তুর রোগীর দেহে এমন কোনো জীবের অস্তিত্বের প্রমাণ পাননি, যাকে রোগের কারণ ব'লে সন্দেহ করা চলতে পারে। তা সত্ত্বেও পাস্তুর নিজের প্রতিষ্ঠিত রোগ সমূহের কারণসম্বন্ধীয় 'বীজ-তত্ত্বকে' (germ-theory) নির্ভুল সাব্যস্ত ক'রে মত প্রকাশ করেন যে, উক্ত রোগের বীজটি এতই ক্ষুদ্র যে চোখে দেখা যায় না। তিনি ভুল করেননি।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রুশ জীবাণুতত্ত্ববিদ দ্মিত্রি আইভানোভ্স্কি তামাকের ছত্রাক রোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছিলেন যে, রোগের আক্রমণে তামাক উদ্ভিদের পাতাগুলি নানা বর্ণযুক্ত হয়। তিনি লক্ষ্য করেন যে, রোগাক্রান্ত পাতার রস সুস্থ উদ্ভিদের পাতায় লাগালে সেটিও রোগাক্রান্ত হয়। জীবাণু-গুলিকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টায় তিনি সূক্ষ্ম পোর্সিলিনের ছাঁকনির মধ্য দিয়ে ঐ

রস ছেঁকে নিলেন, যাতে ক্ষুদ্রতম ব্যাকটিরিয়াও রসে থাকতে না পারে। তা সত্ত্বেও ছেঁকে নেওয়া রসে তামাক পাতায় রোগ সংক্রমিত করা সম্ভব হ'ল। আইভানোভ্‌স্কি স্থির করলেন যে, তাঁর ছাঁকনিটি ত্রুটিযুক্ত—যার মধ্য দিয়ে বস্তুতঃ ব্যাকটিরিয়াগুলি গলে আসছে

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাচ জীবাণুতত্ত্ববিদ মারটিনাস ভিলেম্‌ বিয়েরনিক উক্ত পরীক্ষাটি পুনরায় করেন এবং সিদ্ধান্ত করেন যে, রোগ উৎপাদনকারী বস্তুটি এতই ক্ষুদ্র যে, ছাঁকনির মধ্য দিয়ে গলে যায়। যেহেতু অণুবীক্ষণে তিনি পরিষ্কার রোগ সংক্রমণকারী রসে কিছুই দেখতে পেলেন না, অথবা ঐ রস থেকে টেস্ট-টিউবে কিছু উৎপন্ন করতে সক্ষম হলেন না, তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, সংক্রমণকারী বস্তুটি নিশ্চয়ই একটি ক্ষুদ্র অণু, সম্ভবতঃ সেটির মাপ শর্করা অণুর সমান। বিয়েরনিক এই সংক্রমণকারী বস্তুর নাম দেন 'ছাঁকনযোগ্য বিষাণু' (filtrable virus—'ভাইরাস' শব্দটির ল্যাটিন অর্থ 'বিষ')।

সেই বছরেই জার্মান জীবাণুতত্ত্ববিদ্‌ ফ্রিডরিখ অগাস্ট জোহানেস লোফ্‌লার আবিষ্কার করেন যে, গবাদি পশুর ক্ষুর ও মুখের রোগ (hoof-and-mouth disease) উৎপাদনকারী বস্তুও ছাঁকনযোগ্য এবং ১৯০১ সালে ওয়াল্টার রীড পীতজ্বর সংক্রান্ত গবেষণাকালে আবিষ্কার করেন যে, রোগ সংক্রমণকারী বস্তুটিও ছাঁকনযোগ্য বিষাণু।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ প্রায় চল্লিশটি রোগ (যার মধ্যে ছিল হাম, মাম্পস্‌, জলবসন্ত, বসন্ত, পোলিওমায়েলিটিস এবং জলাতংক রোগ) বিষাণুঘটিত ব'লে আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু তখনও বিষাণুর প্রকৃতি রহস্যাবৃত ছিল। তারপর ইংরেজ জীবাণুতত্ত্ববিদ্‌ উইলিয়াম জে. এলফোর্ড কয়েকটিকে ছাঁকনিতে আটকাতে সমর্থ হন এবং প্রমাণ করেন সেগুলি এক ধরনের বস্তুময় কণিকা। তিনি সূক্ষ্ম কলোডিয়ন ঝিল্লী ব্যবহার করেন, যেগুলি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এবং এইভাবে তিনি এত সূক্ষ্ম ঝিল্লী ব্যবহার করেন, যা সংক্রমণকারীবস্তুটি পৃথক করতে সক্ষম। কোনো নির্দিষ্ট রোগের সংক্রমণকারী বস্তুটি পৃথক করতে যে সূক্ষ্মতর ঝিল্লী প্রয়োজন, তার থেকে তিনি সংক্রমণকারী বস্তুটির আয়তনের আন্দাজ পেতেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে, বিয়েরনিকের সিদ্ধান্তে ভুল রয়েছে—সবচেয়ে ছোট বিষাণুও অধিকাংশ অণুর চেয়ে বড়। সবচেয়ে বড় বিষাণুগুলি মাপে রিকেট-সিয়ার অনুরূপ।

এরপর কয়েক বছর জীববিজ্ঞাবিদদের মধ্যে তর্ক চলল—বিষাণুগুলি জীবিত

না মৃত কণিকা। তাদের বংশবৃদ্ধি এবং রোগ সংক্রমণ ক্ষমতা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে, সেগুলি জীবিত। কিন্তু ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন প্রাণরসায়নবিদ ওয়েনডেল মেরেডিথ স্ট্যানলি এমন এক প্রমাণ উপস্থিত করেন, যা 'মৃতের' স্বপক্ষে রায় দিল। তিনি 'টোবাকো মোসেয়িক' বিষাণুতে বহুল সংক্রামিত তামাক পাতা পিষে রস বার করে প্রোটিন স্বতন্ত্রীকরণ পদ্ধতিতে বিষাণুগুলি বিশুদ্ধ ও গাঢ় রূপে পাবার চেষ্টা করেন। স্ট্যানলি আশাতিরিক্তভাবে সফল হন, কারণ বিষাণুগুলি তিনি কেলাসিত অবস্থায় লাভ করেন। কেলাসিত অণুর মতোই তাঁর নিষ্কাষিত বস্তুর কেলাস রূপ সাধারণ এবং তা সত্ত্বেও বিষাণুগুলির স্বভাব বজায় ছিল; যখন তিনি কেলাসগুলিকে জলে দ্রবীভূত করেন, দেখা গেল সেগুলি পূর্বের মতোই সংক্রামী।

বিষাণুর এই কেলাসনের জন্য স্ট্যানলি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে (উৎসেচকগুলির কেলাসনকারী) সামার এবং নরথ্রোপের সংগে একত্রে রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

বিষাণুগুলি যে কেলাসিত করা যায় এই তথ্যে স্ট্যানলি সমেত অনেকেরই মনে হ'ল যে, সেগুলি প্রোটিনের মতোই মৃত। জীবিত কোনো বস্তুকে কেলাসিত করা যায়নি এবং জীবন ও কেলাসন দুটি পরস্পর বিপরীত বস্তু ব'লে অনুমিত হ'ত। জীবন নমনীয়, পরিবর্তনশীল ও গতিশীল আর কেলাস অনমনীয়, নিশ্চল এবং কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত।

তবুও তথ্য হিসাবে এ কথা রয়ে গেল যে, বিষাণু সংক্রামক এবং কেলাসনের পরও সেগুলি বৃদ্ধিলাভ করে ও বংশবৃদ্ধি করে এবং বৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে জীবনের সার ব'লে গণ্য করা হয়।

ইংরেজ প্রাণরসায়নবিদ্ ফ্রেডারিক সি বডেন্ এবং নরমান্ ডব্লিউ পিরি কর্তৃক 'টোবাকো মোসেয়িক' বিষাণুতে রিবোনিউক্লিক এ্যাসিডের অস্তিত্ব আবিষ্কারের ফলে ঘটনার মোড় ফিরে গেল। যদিও বেশি নয়, তবুও বিষাণুগুলির শতকরা ৯৪ ভাগ প্রোটিন এবং শতকরা ৬ ভাগ আর এন্ এ। তা সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে বস্তুটি নিউক্লিওপ্রোটিন। তা'ছাড়া আর সমস্ত বিষাণুও নিউক্লিওপ্রোটিন বলে স্থিরীকৃত হ'ল, যাতে আর-এন্-এ অথবা ডি-এন্-এ অথবা উভয়ই বর্তমান।

প্রোটিন ও নিউক্লিওপ্রোটিনের পার্থক্য কার্যতঃ মৃত ও জীবিতের মধ্যে পার্থক্যের সমান। জানা গেল, যে বস্তু জীন্ সৃষ্টি করে বিষাণুগুলিও সেই একই বস্তু দ্বারা সৃষ্ট এবং জীন্ হচ্ছে জীবনের সারবস্তু। বড় বড় বিষাণুগুলি আকৃতিতে

জীনের সমষ্টি বা অসংবদ্ধ ক্রোমোজোমের মতো। বিষাণুগুলিতে পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয়, নতুন প্রতিরোধী প্রজাতির (strams) সৃষ্টি হয়, যেগুলির গঠন এবং সংক্রমণ ক্ষমতা ভিন্ন। আমরা কল্পনা করে নিতে পারি যে, কোষে বিষাণুগুলি জীনগুলিকে সরিয়ে তদারকির কাজ নিজেরা গ্রহণ করেছে এবং নিজেদের সুবিধামতো রাসয়নিক প্রক্রিয়া পরিচালনা করছে, যার ফলে অধিকাংশ সময় হয় পোষক কোষটি অথবা সমগ্র পোষক জীবটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

যদি জীনগুলি কোষের 'জীবিত' গুণগুলি বহন করে তা'হলে বিষাণুগুলিও জীবিত। অবশ্য প্রাণের সংজ্ঞার উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। ব্যক্তিগত-ভাবে আমি মনে করি, আপন অনুকৃতি সৃষ্টির ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোনো নিউক্লিও প্রোটিন অণুই জীবিত। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী বিষাণুগুলি মানুষ বা হাতীর মতোই 'জীবিত'।

অবশ্য বিষাণুর অস্তিত্বের হাজার পরোক্ষ প্রমাণ থাকলেও চোখে দেখার কাছে কিছুই নয়। আপাতদৃষ্টিতে স্কটল্যাণ্ডবাসী চিকিৎসক জন ব্রাউন বুইস্টই প্রথম লোক, যিনি বিষাণুকে চোখে দেখেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি টীকার স্ফোটকের রসে অণুবীক্ষণের নিচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার মতো দেখতে পান বলে বিবরণ প্রদান করেন। অনুমিত হয় সেগুলি গোবসন্তের বিষাণু, যে বিষাণুগুলি সর্ববৃহৎ জ্ঞাত বিষাণু।

বিষাণুকে ভালো করে দেখতে অথবা শুধু দেখতেই সাধারণ অণুবীক্ষণের চেয়ে আরও ভালো কিছু প্রয়োজন। এই 'আরো ভালো কিছু' আবিষ্কৃত হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে : এটি ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ ; যার বিবর্ধন ক্ষমতা প্রায় ১০০,০০০ এবং এক মাইক্রোনের হাজার ভাগের এক ভাগ ব্যাস বিশিষ্ট বস্তুকেও পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট করে।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের অসুবিধাও আছে। অভিলক্ষ্য বস্তুকে (objective) বায়ুশূন্য স্থানে স্থাপন করতে হবে, যার ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে জলীয় অংশ হারিয়ে বস্তুটির আকৃতিগত পরিবর্তন হয়। অভিলক্ষ্য বস্তুটি যেমন—কোষকে অত্যন্ত পাতলা ফলকে কাটতে হবে। প্রতিবিম্বটি মাত্র দ্বি-মাত্রিক (two-dimensional) হয় আর তাছাড়া ইলেকট্রনগুলির সোজা জৈবিক বস্তুর মধ্য দিয়ে চলে যাবার প্রবণতা থাকায় সেটি পশ্চাদভূমির পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন জ্যোতির্বিদ এবং পদার্থবিদ্যাবিদ রবলি. সি. উইলিয়ামস্ এবং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণবিদ র‍্যালফ ডব্লিউ. জি. উইকফ্ যুক্তভাবে

শেষোক্ত সমস্যাটির মৌলিক সমাধান আবিষ্কার করেন। জ্যোতির্বিদ হিসাবে উইলিয়ামসের মাথায় এল, ঠিক যেমন সূর্যের রশ্মি তির্যকভাবে পড়লে ছায়ার সাহায্যে চাঁদের পাহাড় ও জ্বালামুখগুলির (craters) বন্ধুরতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, ঠিক সেই ভাবে যদি ছায়া ফেলার ব্যবস্থা করা যায় তবে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে বিষাণুগুলিকেও ত্রি-মাত্রিক রূপে (three-dimensional) দেখা যাবে। গবেষণাকারীদ্বয় যে সমাধান করলেন তা হচ্ছে, অণুবীক্ষণের পীঠস্থ বিষাণু কণিকাগুলির উপর তির্যকভাবে বাষ্পীভূত ধাতু প্রবাহিত করা। প্রবাহিত ধাতু প্রত্যেক বিষাণুর পিছনে 'ছায়া' বা পরিষ্কার স্থানের সৃষ্টি করে। ছায়ার দৈর্ঘ্য প্রতিরোধকারী কণিকার উচ্চতা নির্দেশ করে এবং ধাতুটি পাতলা আস্তরণীর সৃষ্টি করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে বিষাণুগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন বিষাণুর ছায়াচিত্রগুলি তাদের আকৃতি নির্ধারণে সহায়তা করে। গোবসন্তের বিষাণুগুলিকে দেখা যায় পিপার আকৃতিবিশিষ্ট। এগুলি স্থূলতায় এক মাইক্রোনের চার ভাগের এক ভাগ— ক্ষুদ্রতম রিকেটসিয়ার প্রায় সমান। 'টোবাকো মোসেয়িকের' বিষাণুগুলি পাতলা দণ্ডের মতো দৈর্ঘ্যে ০.২৮ মাইক্রোন এবং স্থূলতায় ০.০১৫ মাইক্রোন। ক্ষুদ্রতম বিষাণুগুলি, যেমন পোলিওমায়েলিটিস, পীতজ্বর, ক্ষুর ও মুখের রোগ প্রভৃতি—গোলাকৃতি ক্ষুদ্র বিষাণু, যেগুলির ব্যাস ০.০২৫ থেকে ০.০২০ মাইক্রোন হয়ে থাকে। মানব জীনের আকৃতির যে হিসাব পাওয়া যায়, এগুলি তার চেয়েও ক্ষুদ্র। এই বিষাণুগুলির ওজন প্রোটিন অণুগুলির গড় ওজনের মাত্র ১০০ গুণ বেশি।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ফিনল্যাণ্ডের কোষবিদ্যাবিদ আলভার পি. উইল্‌স্কা এক ধরনের ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের পরিকল্পনা করেন, যার ইলেকট্রনগুলি তুলনামূলকভাবে কম গতি সম্পন্ন। সেগুলি উচ্চগতি সম্পন্ন ইলেকট্রন অপেক্ষা কম ভেদকারী হওয়ায় বিষাণুর পরিগঠনের অন্তর্নিহিত অংশগুলি পরিস্ফুট করতে সক্ষম।

বিষাণুবিদ্যাবিদরা কার্যতঃ বিষাণুগুলি টুকরো টুকরো ক'রে পুনরায় একত্রিত করতে শুরু করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হাইনৎস্‌ ফ্রেংকেল কনবার্ট এবং রবলি উইলিয়ামস্‌ লক্ষ্য করেন যে, মৃদু রাসায়নিক ক্রিয়ায় 'টোবাকো মোসেয়িকের' বিষাণুগুলি বিভিন্ন খণ্ডে ভেঙে যায়, যে খণ্ডগুলি পেপটাইড শৃঙ্খলে নির্মিত এবং যার প্রত্যেক খণ্ডে প্রায়

১৫০টি এ্যামিনো এ্যাসিড বর্তমান। দ্রবণে খণ্ডগুলি একত্রিত হয়ে দণ্ডাকৃতি বিষাণু সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু আকর্ষী গঠনের (helix) ঘননিবদ্ধ প্রোটিন দণ্ডটি ফাঁপা। ফাঁপা স্থানটি যে গর্তের সৃষ্টি করেছে সেখানে একটি নিউক্লিক এ্যাসিড অণু স্বচ্ছন্দে স্থান করে নিতে পারে।

ফ্রেংকেল-কনবার্ট 'টোবাকো মোসেয়িক' বিষাণুর নিউক্লিক এ্যাসিড ও প্রোটিন অংশ বিচ্ছিন্ন করে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন যে, বিভিন্ন অংশের স্বতন্ত্রভাবে সংক্রমণ ক্ষমতা রয়েছে কি না। দেখা গেল, স্বতন্ত্রভাবে অংশ দুটির সংক্রমণ ক্ষমতা নেই। কিন্তু প্রোটিন এবং নিউক্লিক এ্যাসিড অংশ দুটি আবার একত্রিত করলে মূল বিষাণুর তুলনায় শতকরা ১ভাগ সংক্রমণ ক্ষমতা পুনরুজ্জীবিত হয়।

ব্যাপারটা কি হ'ল ? বিশ্লিষ্ট বিষাণুর প্রোটিন ও নিউক্লিক এ্যাসিড অংশ দুটি কার্যতঃ মৃত ব'লে অনুমিত হয়েছিল ; তবুও সংমিশ্রণে অন্ততঃ কিছু অংশ পুনরায় জীবন লাভ করল ব'লে মনে হয়। পত্র-পত্রিকায় ফ্রেংকল-কনরাটের পরীক্ষা জড়বস্তু থেকে জীবন সৃষ্টি হিসাবে অভিনন্দিত হ'ল। কিন্তু সে ধারণা ভুল, যার প্রমাণ আমরা এখনই পাব।

আপাতদৃষ্টিতে প্রোটিন ও নিউক্লিক এ্যাসিডের কিছু পুনর্সমবায় সংঘটিত হয়েছিল। অনুমিত হয়, সংক্রমণ ব্যবস্থায় দুইটির নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তা'হলে প্রোটিন এবং নিউক্লিক এ্যাসিডের প্রত্যেকটির কাজের ধারা কিরূপ এবং দুইটির মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ ই বা কোন্‌টি ?

ফ্রেংকেল-কন্‌রাটের এক সুন্দর পরীক্ষায় এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। তিনি একটি প্রজাতির প্রোটিন অংশের সঙ্গে অন্য একটি প্রজাতির নিউক্লিক এ্যাসিড অংশ মিশ্রিত করলেন। এই দুয়ের সংমিশ্রণের ফলে এক সংক্রামক বিষাণুর সৃষ্টি হল, যার গুণাগুণ উভয় ধরনের বিষাণুর সংমিশ্রণ। বিষাণুটির আক্রমণ ক্ষমতা (তামাক উদ্ভিদে সংক্রমণের ক্ষমতার মাত্রা) প্রোটিন প্রদান কারী বিষাণুটির মতো এবং উৎপন্ন নির্দিষ্ট রোগটি (তামাক পাতায় বিভিন্ন রঙ সৃষ্টির প্রকৃতি) যে প্রজাতির নিউক্লিক এ্যাসিড ব্যবহৃত হয়েছে তার মতো।

বিষাণুবিদরা ইতিপুর্বেই প্রোটিন ও নিউক্লিক এ্যাসিডের কার্যাবলী সম্বন্ধে যে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন উক্ত পরীক্ষায় সেইটাই প্রমাণিত হ'ল। অনুমিত হয় যে, বিষাণু কোষ আক্রমণ করলে বিষাণুর প্রোটিন আবরণীটি কোষে সংবদ্ধ

হয় এবং ভিতরে প্রবেশ পথ প্রস্তুত করে। আর নিউক্লিক এ্যাসিডই কোষটি আক্রমণ ক'রে নতুন বিষাণু সৃষ্টির কাজ পরিচালনা করে।

ফ্রেংকেল-কনরাটের সংকর প্রজাতিটি তামাক পাতায় সংক্রামিত হবার পর যে নতুন বিষাণুগুলির সৃষ্টি করে সেগুলি কিন্তু সংকর জাতের নয়, বরং যে ধরনের প্রজাতি থেকে নিউক্লিক এ্যাসিডের অংশ নেওয়া হয়েছিল এগুলি তারই অনুকৃতি। সংক্রমণ ক্ষমতা এবং রোগের বহিঃপ্রকাশ—সবই শেষোক্ত প্রজাতির প্রতিরূপ। অন্যভাবে বললে—নতুন বিষাণুটির প্রোটিন আবরণী নিউক্লিক এ্যাসিডের নির্দেশনায় গঠিত হয়েছে। সেটি আপন প্রজাতির অনুরূপ প্রোটিন সৃষ্টি করেছে, যে প্রজাতির প্রোটিনের সংগে তার নতুন সমবায় হয়েছিল তার প্রোটিনের অনুরূপ নয়।

এই পরীক্ষায় নিউক্লিক এ্যাসিডই যে বিষাণুর অথবা বলতে গেলে যে কোনো নিউক্লিও প্রোটিনের "জীবিত" অংশ সে তথ্যের স্বপক্ষে প্রমাণ আরও জোরদার হ'ল। বস্তুতঃ, অপর একটি পরীক্ষায় ফ্রেংকেল কনরাট প্রমাণ পেলেন যে, শুধুই বিষাণুর বিশুদ্ধ নিউক্লিক এ্যাসিডটি তামাক পাতায় সামান্য পরিমাণে সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম। আপাতদৃষ্টিতে কোনো কোনো সময়, যে ভাবেই হোক, নিউক্লিক এ্যাসিডটি নিজেই কোষে প্রবেশ লাভে সমর্থ হয়।

সুতরাং বিষাণুর নিউক্লিক এ্যাসিড এবং প্রোটিন একত্রিত করে যে নতুন বিষাণুর সৃষ্টি হয় তা জড়বস্তু থেকে প্রাণ সৃষ্টি নয়, কারণ নিউক্লিক এ্যাসিডরূপে প্রাণের অস্তিত্ব আগেই বিদ্যমান। প্রোটিনের কাজ শুধু সংক্রমণ ও বংশবৃদ্ধির সুষ্ঠু সমাধায় নিউক্লিক এ্যাসিডকে সাহায্য করা। নিউক্লিক এ্যাসিড অংশকে যদি মানুষ বলে ধরা হয় তাহলে প্রোটিন অংশটি মোটরগাড়ীর সঙ্গে তুলনীয়। দুয়ের সমবায়ে স্থানান্তরে ভ্রমণ সহজ হয়। মোটরগাড়ী আপনাআপনি চলতে পারে না, মানুষ পায়ে হেঁটে চলতে পারে। কিন্তু মোটরগাড়ীর সহায়তায় ভ্রমণ সুবিধাজনক হয়।

বিষাণুগুলির সংক্রমণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে পরিষ্কার এবং বিস্তারিত তথ্য ব্যাকটি-রিয়োফাজ নামে বিষাণুগুলির পর্যালোচনায় আবিষ্কৃত হয়, যা সর্বপ্রথম ইংরেজ জীবাণুবিদ্যাবিদ্ ফ্রেডারিক উইলিয়ম টোয়র্ট ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে নিরপেক্ষ গবেষণায় ক্যানাডাবাসী জীবাণুবিদ্যাবিদ ফেলিক্স হিউবার্ট ডেরেল সমর্থন করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, এই জীবাণুগুলি অন্য জীবাণু অর্থাৎ ব্যাকটিরিয়াগুলি শিকার করে। ডেরেল এইগুলির নাম দেন

"ব্যাকটিরিয়োফাজ" (bacteriophage), যার গ্রীক শব্দগত অর্থ "ব্যাকটিরিয়া ভক্ষণকারী"।

ব্যাকটিরিয়োফাজগুলি পর্যালোচনার পক্ষে সুন্দরভাবে উপযোগী, কারণ পোষক কোষগুলির সঙ্গে একত্রে এইগুলির টেস্ট-টিউবে কাল্‌চার সম্ভব। এইগুলির সংক্রমণ ও বংশবৃদ্ধি নিম্নলিখিতভাবে হয়ে থাকে।

একটি আদর্শ ব্যাকটিরিয়োফাজের (সাধারণতঃ গবেষকগণ শুধুই 'ফাজ' (phage) বলে থাকেন) আকৃতি ছোট ব্যাঙাচির মতো, যার মাথা স্থূল এবং একটি লেজ আছে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে গবেষকগণ দেখতে সমর্থ হয়েছেন যে, প্রথমে লেজটির সাহায্যে ব্যাকটিরিয়োফাজ ব্যাকটিরিয়ার বহির্ভাগে সংবদ্ধ হয়। কিভাবে এই ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় সে সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট অনুমান এই যে, লেজের অগ্রভাগে বিদ্যুতাধানের প্রকৃতি (বিদ্যুতাধান সমন্বিত এ্যামিনো এ্যাসিডগুলির দ্বারা নির্ধারিত) ব্যাকটিরিয়ার বহির্ভাগের কোনো অংশের বিদ্যুতাধানের প্রকৃতির সঙ্গে বেশ খাপ খায়। ফলে বিদ্যুতাধানের বৈপরীত্যে ও পরস্পরের আকর্ষণের ফলে ফাজের লেজ এবং ব্যাকটিরিয়ার বহির্ভাগের সেই অংশ পরস্পর সংলগ্ন সঠিক মাপের গিয়ারের (gear) দুই দাঁতের মতো জোড়া লেগে যায়। বিষাণুটি একবার লেজের সাহায্যে শিকারের সঙ্গে যুক্ত হলে সম্ভবতঃ কোনোরূপ উৎসেচকের সাহায্যে কোষের সেই অংশে ছিদ্রের সৃষ্টি ক'রে প্রবেশপথ তৈরী করে। অবশ্য ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে প্রকৃত কী ঘটেছে তার কিছুই দেখা যায় না। ফাজটি, বা অন্ততঃ তার দৃশ্যগোচর আবরণটি ব্যাকটিরিয়ার বহির্ভাগে সংবদ্ধ থাকে। ব্যাকটিরিয়ার কোষের মধ্যে কোনোরকম ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু ২০ মিনিটের মধ্যে কোষটি ভেঙে যায় এবং ৩০০টি পর্যন্ত পূর্ণাবয়ব বিষাণু বেরিয়ে আসে।

স্পষ্টতঃই আক্রমণকারী বিষাণুর প্রোটিন আবরণীই কেবলমাত্র কোষের বাইরে থাকে। অবশ্যই প্রোটিন নির্মিত প্রবেশপথ দিয়ে ভিতরের নিউক্লিক এ্যাসিড অংশটুকু ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে। অনধিকার প্রবেশকারী বস্তুটি যে শুধুই নিউক্লিক এ্যাসিড তা মার্কিন জীবাণুবিদ্যাবিদ এ্যালফ্রেড. ডি. হারশি তেজস্ক্রিয় অনুসন্ধানী দ্বারা (radioactive tracer) প্রমাণ করেন। তিনি ফাজগুলি তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরস্‌ এবং তেজস্ক্রিয় সাল্‌ফারের সাহায্যে চিহ্নিত করেন (তেজস্ক্রিয় যমজগুলি পোষক রসে মিশিয়ে ব্যাকটিরিয়ার অংগীভূত ক'রে সেই ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে ফাজগুলি

লালন করেন)। এখন ফস্‌ফরাস্ প্রোটিন এবং নিউক্লিক এ্যাসিড—উভয় বস্তুতেই উপস্থিত থাকে কিন্তু সাল্‌ফার শুধুমাত্র প্রোটিনে উপস্থিত থাকে, নিউক্লিক এ্যাসিডে কোনো সালফার নেই। সুতরাং যদি উভয় বস্তুতে চিহ্নিত কোনো ফাজ ব্যাকটিরিয়ায় প্রবেশ করে এবং উৎপাদিত সন্তানে শুধুমাত্র তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস্ পাওয়া যায় এবং তেজস্ক্রিয় সালফার অনুপস্থিত থাকে, তাহলে পরীক্ষাটি প্রমাণ করে যে, উৎপাদকে বিষাণুর নিউক্লিক এ্যাসিডই কোষে প্রবিষ্ট হয়, প্রোটিন প্রবিষ্ট হয় না। তেজস্ক্রিয় সালফারের অনুপস্থিতি ইংগিত করে যে, উৎপাদিত বিষাণুতে সমস্ত প্রোটিনই পোষক ব্যাকটিরিয়াটি সরবরাহ করেছে। পরীক্ষার ফলে ঠিক এই ব্যাপারই দেখা গেল—উৎপাদিত বিষাণুতে তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস্ই (উৎপাদনকারী বিষাণুর) উপস্থিত থাকে, তেজস্ক্রিয় সালফার নয়।

পুনরায় জীবন পরিচালনায় নিউক্লিক এ্যাসিডের প্রধান ভূমিকা প্রমাণিত হ'ল। আপাতদৃষ্টিতে ফাজের নিউক্লিক এ্যাসিড অংশটুকুই ব্যাকটিরিয়ায় প্রবেশলাভ ক'রে প্রোটিন অংশ সমেত সমস্ত বিষাণুটির অনুকৃতিই আক্রান্ত কোষের বস্তুর সহায়তায় নতুন বিষাণুর নির্মাণ পরিচালনা করে।

॥ অনাক্রম্যতা ॥

বিষাণুরাই মানুষের জীবন্ত শত্রুদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবল (মানুষ নিজে ছাড়া)। দেহের কোষের সঙ্গে বিষাণুদের নিবিড় সংযোগের জন্য সেগুলি ভেষজ বা অনুরূপ কোনো কৃত্রিম অস্ত্রের আক্রমণে অজেয় ছিল। কিন্তু তবুও মানুষ এমন কি সবচেয়ে প্রতিকূল অবস্থাতেও এগুলির সঙ্গে যুঝতে সক্ষম ; রোগ প্রতিরোধে মানুষের শারীরযন্ত্রের আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে।

চতুর্দশ শতাব্দীর 'কৃষ্ণ-মৃত্যুর' (black death) কথা মনে করা যাক। মধ্যযুগের এমন এক জঘন্য অপরিচ্ছন্ন ইউরোপে এর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, যেখানে আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র ধারণা ছিল না, আবর্জনা নিষ্কাষণের সুব্যবস্থা ছিল না, কোনো রকম যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না এবং গাদাগাদি করে নিরুপায়ভাবে বহুলোক এক জায়গায় বাস করত। অবশ্য সংক্রামিত গ্রাম থেকে লোকে পালিয়ে যেতে পারত, কিন্তু তার ফলে পলায়মান আক্রান্ত রোগীর দ্বারা রোগ আরও দ্রুতগতিতে দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ত। তা সত্ত্বেও জনসাধারণের তিন চতুর্থাংশ সাফল্যের

সঙ্গে এই রোগ প্রতিরোধ করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি চারজনে যে একজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল সেটা আশ্চর্যের নয়, প্রতি চারজনে তিনজন যে রোগ প্রতিরোধ করেছিল সেইটাই পরমাশ্চর্যের।

পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যে কোনো রোগের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ব'লে একটা কিছু আছে। একদল লোকের মধ্যে কোনো প্রবল ছোঁয়াচে রোগের আক্রমণে কিছু লোকের আক্রমণ হয় মৃদু, কিছু লোক খুব বেশি অসুস্থ হয়, আর কিছু লোক মারা যায়। তাছাড়া সম্পূর্ণ অনাক্রম্যতা ব'লেও একটা জিনিস আছে—যা কারুর জন্মগত, কেউ বা অর্জন করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, হাম, জলবসন্ত অথবা মাম্পস্ (mumps) রোগের একবার আক্রমণে সাধারণতঃ মানুষকে সারা জীবনের জন্য অনাক্রম্য করে তোলে।

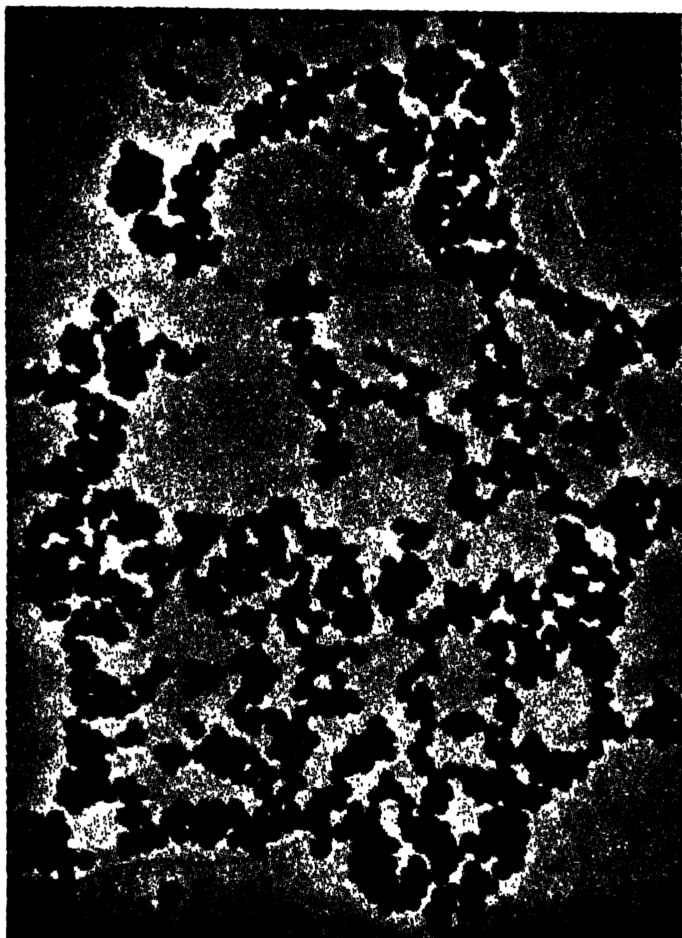
উপরে উক্ত তিনটি রোগের কারণই বিষাণুর আক্রমণ। তা সত্ত্বেও ঐগুলি তুলনীয়ভাবে কম সংক্রামক এবং ক্বচিৎ মৃত্যুর কারণ হয়। হাম সাধারণতঃ কিছু মৃদু লক্ষণের সৃষ্টি করে, অন্ততঃ শিশুর ক্ষেত্রে। কিভাবে দেহ এই বিষাণুগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং পরে নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করে যে, বিষাণুগুলি আর উদ্বেগের কারণ হয় না? এই প্রশ্নের উত্তরে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের সূত্রপাত এবং সে কাহিনীর শুরুতে আমাদের বসন্তরোগ জয়ের কাহিনী বিবৃত করতে হবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বসন্ত রোগ বিশেষভাবে ভীতিপ্রদ ছিল, কারণ শুধু যে এই রোগটি প্রায়শঃই মারাত্মক তাই নয়, যারা সেরে ওঠে তারাও চিরকালের জন্য বিকৃত আকৃতির হয়। মৃদু আক্রমণে শুধু চামড়ায় গর্তের সৃষ্টি হয় আর প্রবল আক্রমণে শুধু যে সৌন্দর্যের হানি হয় তাই নয় মানবিক আকৃতিরও হানি হয়। জনসাধারণের এক বিরাট অংশ সে আমলে তাদের মুখে বসন্ত রোগ আক্রমণের চিহ্ন বহন করত। আর যাদের আক্রমণ হয়নি, সর্বদাই আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে তুর্কীর অধিবাসীরা বসন্ত রোগের প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের অনাক্রম্য ক'রে তোলার জন্য, ইচ্ছা ক'রেই বসন্ত রোগের মৃদু সংক্রমণ নিজেদের দেহে গ্রহণ করত। যে লোকের মৃদু আক্রমণ হয়েছে তার স্ফোটকের রস নিয়ে তারা নিজেদের শরীরে আঁচড় কেটে তাতে মিশিয়ে দিত, ফলে, কেউ কেউ মৃদু আক্রমণে ভুগত আর কেউ বা যে-মৃত্যু ও বিকৃতি এড়াতে চেয়েছিল তারই কবলে পড়ত। এই কাজে ঝুঁকি ছিল, কিন্তু রোগের



যক্ষ্মারোগের দণ্ডাকৃতি (rod-shaped) বিজাণু—ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দ্বারা চিত্র গ্রহণ করা হইয়াছে।



স্টাফিলোকোক্কাস বীজাণু—হাজার গুণ প্রতিফলিত হইয়াছে। চিত্র হইতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাইতেছে যে, কেন গ্রীক শব্দ "একগুচ্ছ আঙুর" —এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে।

বিভীষিকা এড়াতে সে বিভীষিকার ঝুঁকি নিতেও লোকে রাজী ছিল।

১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত রূপসী লেডী মেরী ওরট্লী মণ্টেগুর স্বামী যখন তুর্কীতে অল্পকালের জন্য ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হিসাবে যান, তিনিও তাঁর সহগমন করেন এবং উপরোক্ত প্রথার কথা জানতে পেরে নিজের সন্তানদের ঐ পদ্ধতিতে টিকা দান করেন। তারা নিরাপদে রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা ইংলণ্ডে জনপ্রিয় হ'ল না, হয়ত লেডী মণ্টেগুর সাংঘাতিক খামখেয়ালির কুখ্যাতি তার জন্য অংশতঃ দায়ী ছিল।

গ্লুসেস্টার শায়ারের কিছু গ্রাম্য লোকের বসন্তরোগ প্রতিরোধের নিজস্ব প্রথা ছিল। তারা বিশ্বাস করত, গোবসন্ত—যা গরুগুলিকে এবং মাঝে মাঝে মানুষকে আক্রমণ করে তা বসন্ত ও গোবসন্ত উভয় রোগেরই প্রতিরোধক। এই ব্যাপারটি যদি সত্য হয় তা'হলে খুবই ভালো। কারণ গো-বসন্তে ক্ষতও যেমন কম হয় তেমনই প্রায়ই কোনো দাগ অবশিষ্ট থাকে না। গ্লুসেস্টার শায়ারের এক ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার সিদ্ধান্ত করেন যে, এই সাধারণ প্রচলিত কুসংস্কারে কিছু সত্য থাকতেও পারে। তিনি লক্ষ্য করেন যে, গোয়ালিনীরা যেমন সহজে গো-বসন্তে আক্রান্ত হয়, আপাত দৃষ্টিতে তেমনই বসন্তের দাগ তাদের মুখে দেখা যেত না। (সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে গোয়ালিনীদের সৌন্দর্য সম্বন্ধে যে রোমাণ্টিক ধারণা প্রচলিত ছিল, তার কারণ যখন বহু লোকের মুখই বসন্তের দাগে ভরা তখন তাদের মুখশ্রী ছিল অক্ষত।)

এও কি সম্ভব যে গো-বসন্ত আর বসন্তে এমনই সাদৃশ্য আছে যে, গো-বসন্তের আক্রমণে শরীরে যে অনাক্রম্যতা গড়ে উঠে তা বসন্তের বিরুদ্ধেও কার্যকরী? অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ডাঃ জেনার এই ধারণার সত্যতা যাচাই করতে শুরু করলেন (সম্ভবতঃ নিজের পরিবারের লোকজনের উপর প্রথম পরীক্ষা করেন)। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চূড়ান্ত পরীক্ষাকার্যের ঝুঁকি নেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। প্রথমে তিনি এক গোয়ালিনীর আক্রান্ত হস্ত-ক্ষত থেকে গো-বসন্ত ক্ষতের রস নিয়ে একটি আট বছরের বালক জেমস ফিপ্‌সকে টিকা দিলেন। দু'মাস পরে পরীক্ষার চরম ও চূড়ান্ত মুহূর্ত এল। জেনার তরুণ জেমসের দেহে ইচ্ছা করেই বসন্ত রোগের ক্ষতের রস অনুপ্রবিষ্ট করালেন।

বালকটির রোগ আক্রমণ হল না। সে অনাক্রম্যতা লাভ করেছিল।

জেনার গো-বসন্তের ল্যাটিন নাম "ভ্যাক্‌সিনিয়ার" (Vaccinia) অনুসরণে

পদ্ধতিটির নাম দিলেন "ভ্যাক্‌সিনেশন্" (Vaccination)। সারা ইউরোপে ভ্যাকসিনেশন পদ্ধতি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। ভেষজ বিজ্ঞানে যে বিরল সংখ্যক বিপ্লবগুলি অতি সহজেই এবং তাৎক্ষণিক রূপে সাধারণে প্রচলিত হয়েছে এইটি তার মধ্যে অন্যতম—কারণ বসন্ত রোগের বিভীষিকা এবং সে বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য জনগণের যে কোনো প্রতিশ্রুত পন্থা পরীক্ষা করার ইচ্ছা ছিল প্রবল। এমন কি চিকিৎসাজগতের নেতারা যদিও যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন তবু চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে মাত্র ক্ষীণ প্রতিরোধ করেছিলেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব্-ফিজিসিয়ানে জেনারের নির্বাচনের প্রস্তাব উঠেছিল, তিনি হিপোক্রেটিস এবং গ্যালেনের তত্ত্বে যথাযথ পারংগম নন এই যুক্তিতে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়।

বর্তমানে সভ্য দেশগুলিতে বসন্তরোগ নির্মূল হয়েছে, যদিও ভয়ংকর ব্যাধি রূপে এর বিভীষিকা এখনও প্রবল। বিরাট শহরে একজন মাত্র আক্রান্ত ব্যক্তির খবরে প্রায় শহরের সমস্ত বাসিন্দাই নতুন করে টিকা নেওয়ার জন্য ডাক্তারের কাছে ছুটে যান।

অন্যান্য প্রবল রোগগুলির বিরুদ্ধে অনুরূপ টিকা আবিষ্কারের চেষ্টা প্রায় দেড় শতাব্দী যাবৎ সুফলপ্রসূ হয়নি। পাস্তরের গবেষণার ফলেই পরবর্তী বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়। তিনি আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করেন যে, অনুজীব গুলিকে দুর্বল করে তিনি সংশ্লিষ্ট রোগগুলির প্রবল আক্রমণ মৃদুতায় পরিবর্তিত করতে পারেন।

পাস্তর এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া নিয়ে কাজ করছিলেন, যেগুলি মুরগী শাবকের কলেরা রোগের কারণ। তিনি ব্যাকটিরিয়ার এমন গাঢ় একটি ক্বাথ প্রস্তুত করেন, যা চামড়ার নিচে সূচীপ্রয়োগে প্রবিষ্ট করলে একদিনের মধ্যে মুরগী-শাবকের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। একবার এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি কালচার ব্যবহার করেন যেটি এক সপ্তাহ যাবৎ পড়ে ছিল। এই ক্ষেত্রে মুরগী-শাবকগুলি সামান্য অসুস্থ হয়ে আবার সেরে উঠল। পাস্তর সিদ্ধান্ত করলেন যে, কালচারটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং নতুন করে শক্তিশালী আর একটি ক্বাথ তিনি তৈরী করলেন। কিন্তু যে মুরগী শাবকগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়া ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণ থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছিল সেগুলি এই নতুন ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে মরল না। স্পষ্টতঃই দুর্বল ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণের ফলে মুরগী-শাবকগুলি প্রবল ব্যাক-টিরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

বলতে গেলে পাস্তুর এই বিশেষ বসন্ত রোগের জন্য কৃত্রিম "গো-বসন্ত" উপাদান গ্রহণ করেন। তিনিও এই পদ্ধতিটিকে "ভ্যাক্‌সিনেশন" নাম দিয়ে জেনারের কাছে দর্শনগত ঋণ স্বীকার করেন, যদিও এই পদ্ধতির সঙ্গে "ভ্যাক্‌সিনিয়ার" কোনোই সম্বন্ধ ছিল না। সেই থেকে যে কোনো রোগের বিরুদ্ধে টিকা দান পদ্ধতিকে সাধারণতঃ "ভ্যাক্‌সিনেশন" বলা হয় এবং এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বস্তুটিকে বলা হয় 'ভ্যাক্‌সিন' (vaccine)।

পাস্তুর রোগের জীবাণুগুলি দুর্বল করার (তনুকরণের—attenuation) আরও নানা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, এ্যানথ্রাক্স (anthrax) রোগের জীবাণুগুলি উচ্চ তাপমাত্রায় কালচার করলে যে সেগুলি নতুন প্রজাতির (strain) সৃষ্টি করে, যেগুলি প্রাণীকে এই রোগের বিরুদ্ধে অনাক্রম্য ক'রে তোলে তা তাঁরই আবিষ্কার। তার আগে পর্যন্ত এ্যানথ্রাক্স রোগটি এমন ছোঁয়াচে এবং প্রবল মারাত্মক ছিল যে, একটি গরু এই রোগে আক্রান্ত হ'লে পালের সব ক'টি গরুকে মেরে ফেলে পুড়িয়ে ফেলতে হত।

অবশ্য, পাস্তুরের সবচেয়ে বিখ্যাত বিজয় হ'ল জলাতংক (hydrophobia) বা "রেবিস" (rabies) রোগের বিষাণুর বিরুদ্ধে। "রেবিস" শব্দটি এসেছে ল্যাটিন থেকে, যার অর্থ "প্রলাপ-বকা", কারণ এই রোগ দেহের নার্ভতন্ত্র আক্রমণ ক'রে পাগলামির লক্ষণগুলি প্রকাশ করে। পাগলা কুকুরে দংশিত কোনো ব্যক্তির দেহে একমাস বা দু'মাস প্রচ্ছন্নাবস্থার (incubation) পর ভয়ঙ্কর রোগলক্ষণগুলি প্রকাশ পায় এবং প্রায় অনিবার্যভাবে অতি কষ্টকর অবস্থায় সে ব্যক্তি মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

পাস্তুর রোগটির কোনো দৃশ্য-গোচর অনুজীব দেখতে পাননি (অবশ্য তিনি বিষাণুর বিষয় কিছুই জানতেন না), সুতরাং বিষয়টি অনুশীলনের জন্য তিনি জীবিত প্রাণী ব্যবহার করেন। তিনি সংক্রামক রসটি একটি খরগোসের মস্তিষ্কে সূচী প্রয়োগে প্রবেশ করান এবং প্রচ্ছন্নাবস্থার পর সেই খরগোসের সুষুম্না কাণ্ডটি (spinal cord) পিষে ফেলে তার নির্যাস সূচী প্রয়োগে দ্বিতীয় খরগোসের মস্তিষ্কে অনুপ্রবিষ্ট করান এবং এইরকম ধারাবাহিক চালান। প্রস্তুত নির্যাস যতক্ষণ পর্যন্ত না খরগোসে রোগ সৃষ্টিতে অক্ষম হয় ততক্ষণ পর্যন্ত পাস্তুর তাঁর এই অনুকরণ (attenuated) প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে থাকেন। তারপর তিনি সেই তনুকৃত বিষাণু সূচীপ্রয়োগে কুকুরে অনুপ্রবিষ্ট করান; তৎসত্ত্বেও

কুকুরটি বেঁচে রইল। কিছুকাল পরে তিনি সেই কুকুরে জলাতংক রোগ পূর্ণমাত্রায় সংক্রামিত করে তিনি আবিষ্কার করেন যে, সেই কুকুরটি অনাক্রম্যতা লাভ করেছে।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পাস্তুর তাঁর আরোগ্য প্রণালী মানুষের উপর পরীক্ষার সুযোগ পান। পাগলা কুকুরে ভীষণভাবে দংশিত নয়-বছরের বালক যোসেফ মাইস্টারকে তাঁর কাছে আনা হয়েছিল। অত্যন্ত দ্বিধা ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে পাস্তুর বালকটিকে ক্রমান্বয়ে কম থেকে আরও কম তনুকৃত বিষাণুর দ্বারা সূচী প্রয়োগে টিকা দিলেন; আশা করলেন তার ফলে রোগের প্রচ্ছন্নাবস্থার মধ্যেই বালকটির দেহে অনাক্রম্যতা গড়ে উঠবে। তিনি সফল হলেন। অন্ততঃ ছেলেটি বেঁচে গেল। (উত্তরকালে মাইস্টার পাস্তুর ইনস্টিটিউটের দারোয়ান হয়েছিল এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসস্থ নাৎসী সৈন্যদল যখন তাকে পাস্তুরের সমাধিক্ষেত্র খুলতে আদেশ দেয়, তখন সে আত্মহত্যা করে)।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সৈন্যবাহিনীর একজন ডাক্তার এমিল ফন্ বেরিং ককের গবেষণাগারে কাজ করার সময় আর একটি ধারণাকে যাচাই করার চেষ্টা করেন। অনুজীব, এমন কি তনুকৃত অনুজীবও মানবদেহে প্রবিষ্ট করাবার ঝুঁকি নিয়ে দরকার কি? যদি ধরে নেওয়া যায় যে, রোগসংক্রমণকারী বস্তু দেহের মধ্যে কিছু একটা প্রতিরোধক বস্তু গড়ে তোলে, তা'হলে প্রাণীদেহে জীবাণু সূচীপ্রয়োগে যে প্রতিরোধক বস্তু গড়ে ওঠে তার নির্যাস সূচী প্রয়োগে মানবদেহে প্রবিষ্ট করালে কি একই কাজ হবে না?

ফন্ বেরিং আবিষ্কার করেন যে, এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সত্যই কাজ হয়। এই প্রতিরোধক বস্তুটি পাওয়া গেল রক্তমণ্ডতে (blood serum) এবং ফন্ বেরিং বস্তুটির নাম দেন 'প্রতিবিষ' (antitoxin)। তিনি প্রাণীদেহে ধনুষ্টংকার ও ডিপ্থিরিয়া রোগের প্রতিবিষ তৈরী করান। তাঁর প্রস্তুত ডিপ্থিরিয়া প্রতিবিষ প্রথমেই একটি আক্রান্ত শিশুকে এমন নাটকীয় সাফল্যের সংগে আরোগ্য করল যে, এই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গৃহীত হ'ল এবং ফলে ডিপ্থিরিয়ায় মৃত্যুর হার চূড়ান্ত রূপে হ্রাস করল।

পল আরলিক্ (যিনি উত্তরকালে সিফিলিস রোগের "ম্যাজিকগুলি" আবিষ্কার করেন) ফন্ বেরিংএর সঙ্গে কাজ করতেন এবং সম্ভবতঃ তিনিই প্রতিবিষের যথাযথ মাত্রার পরিমাপ হিসাব করেন। পরে তিনি ফন্ বেরিং-এর সঙ্গ ত্যাগ করেন (তিনি অত্যন্ত রাগী লোক ছিলেন, তাই কারুর সঙ্গে

তাঁর বনত না) এবং একাকী 'সিরাম চিকিৎসার' (serum therapy) তত্ত্বগত বিষয়ে বিশদ গবেষণা করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারের সূত্রপাত বর্ষে ফন্-বেরিং ভেষজতত্ত্ব এবং শারীর বিদ্যায় এই পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আরলিকও একজন রুশ জীব-বিদ্যাবিদের সঙ্গে একত্রে এই পুরস্কার লাভ করেন।

প্রতিবিষের ফলে উৎপন্ন অনাক্রম্যতা যতক্ষণ প্রতিবিষটি রক্তে থাকে ততক্ষণই মাত্র বজায় থাকে। কিন্তু রসায়নবিদরা আবিষ্কার করেন যে, ডিপ্‌থিরিয়া এবং ধনুষ্টংকারের প্রতিবিষের গঠন উত্তাপে অথবা ফরম্যাল-ডিহাইড (formaldehyde)-এর সংগে প্রতিক্রিয়ায় এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে, সৃষ্ট নতুন বস্তুটি (বলা হয় টক্সয়েড, toxoid) নিরাপদে মানবদেহে সূচী প্রয়োগে প্রবেশ করানো যায়। তখন রোগী নিজে যে প্রতিবিষ সৃষ্টি করে তা প্রাণীদেহে সৃষ্ট প্রতিবিষ অপেক্ষা বেশিদিন কার্যকরী থাকে; তা'ছাড়া নতুন ক'রে অনাক্রম্যতা সৃষ্টির জন্য নতুন মাত্রায় টক্সয়েডও সূচী প্রয়োগে প্রয়োজন-মতো দান করা যায়।

জলাতংক রোগের বিষাণুর সঙ্গে পাস্তরের শ্রমসাধ্য দ্বন্দ্বে প্রমাণিত হ'ল যে, বিষাণুগুলির ইচ্ছামতো ব্যবহার আয়াসসাধ্য ব্যাপার। টেস্ট টিউবের কৃত্রিম পোষকরসে ব্যাকটিরিয়াগুলির কালচার, ইচ্ছামতো ব্যবহার এবং তন্নুকরণ সম্ভব। বিষাণুগুলির ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়াগুলি সম্ভব নয়, কারণ সেগুলি শুধুমাত্র জীবিত কলাতেই বৃদ্ধিলাভ করতে পারে। বসন্ত রোগের ক্ষেত্রে পরীক্ষণীয় বিষয়ের (গো-বসন্তের বিষাণু) জীবিত পোষক ছিল গরু এবং গোয়ালিনীরা। জলাতংক রোগের জন্য পাস্তর খরগোস ব্যবহার করেন। কিন্তু জীবিত প্রাণী অণুজীব কালচারের পোষক হিসাবে খুবই দামী এবং ফললাভ সময় সাপেক্ষ।

এই শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে ফরাসী জীববিদ্যাবিদ্ এ্যালেক্সিস্ ক্যারেল একটি সুচতুর কৌশলের জন্য প্রচুর খ্যাতিলাভ করেন, যা পরে চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণায় অমূল্য ব'লে পরিগণিত হয়—ব্যাপারটি হচ্ছে টেস্ট টিউবে কলার (tisue) অংশ বিশেষ জীবিত রাখা। ক্যারেল শল্য চিকিৎসক হিসাবে এই ব্যাপারে আকৃষ্ট হন। তিনি প্রাণীর রক্ত সংবহন পাত্র (blood vessel) এবং যন্ত্রাদি (organs) এক দেহ থেকে অপর দেহে সন্নিবিষ্ট করার এক নতুন উপায় আবিষ্কার করেন, যার জন্য ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভেষজতত্ত্ব এবং শারীর বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। স্বভাবতঃই এক দেহ থেকে

যন্ত্রাদি অপর দেহে সন্নিবিষ্ট করার প্রস্তুতিপর্বে সেগুলিকে জীবিত রাখার ব্যবস্থা করতে হ'ত। তিনি সেইগুলির পুষ্টির ব্যবস্থা করেন—যে ব্যবস্থায় কলাগুলিতে রক্ত, বিভিন্ন নির্যাস ও আয়নসমূহ (ions) সরবরাহ করা হ'ত। আনুষঙ্গিক লাভ হিসাবে ক্যারেল, চার্লস্ অগস্টাস লিণ্ডবার্গের সহায়তায় কলাগুলিতে রক্ত সরবরাহের জন্য একটি অমার্জিত ধরনের "যান্ত্রিক হৃদপিণ্ড" সৃষ্টি করেন। বর্তমানে শল্য-চিকিৎসায় যে কৃত্রিম হৃদপিণ্ড, কৃত্রিম ফুসফুস এবং কৃত্রিম কিডনীর প্রচলন হয়েছে বস্তুটি তার পূর্বসূরী।

ক্যারেলের আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে একটি মুরগীর ভ্রূণের হৃদ্‌পিণ্ড ৩৪ বছর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব –(মুরগী-শাবকের জীবনের স্থায়িত্বের চেয়েও অনেক বেশি সময়) এমন কি ক্যারেল তাঁর কলা-কালচারের (tisue culture) সাহায্যে বিষাণুর চাষ করতে চেষ্টা করেন এবং কিছুটা সফলও হন। এই পদ্ধতির একমাত্র গলদ এই যে, বিষাণুর সঙ্গে ব্যাকটিরিয়াগুলিও জন্মলাভ করে এবং বিশুদ্ধ বিষাণু পেতে হ'লে যে পদ্ধতিতে কলাগুলি জীবাণুহীন করতে হ'ত তা এতই বিরক্তিকর যে তার চেয়ে প্রাণীদের ব্যবহার সুবিধাজনক।

যাই হোক, মুরগীর ভ্রূণ ব্যবহারের পরিকল্পনাটি সঠিক। এক টুকরো কলার (tissuo) চেয়ে সমস্ত ভ্রূণটির ব্যবহার সুবিধাজনক। মুরগীর ভ্রূণ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীব, এটি ডিমের আচ্ছাদনে সুরক্ষিত এবং এই আচ্ছাদনটি ব্যাকটিরিয়ার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিরোধকের কাজ করে এবং এইগুলি সস্তা ও প্রচুর সহজলভ্য। ১৯৩১ সালে ভ্যানডার-বিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে রোগবিদ্যাবিদ্ আর্নেস্ট-ডব্লিউ গুড্‌প্যাশ্চার এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ মুরগীর ভ্রূণের মধ্যে বিষাণু সন্নিবেশিত করতে সফলকাম হন। এই প্রথম ব্যাকটিরিয়ার মতো সহজেই বিশুদ্ধ বিষাণুরও চাষ করা সম্ভব হ'ল।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নিষিক্ত ডিম্বে বিষাণুর কালচার মারফৎ প্রথম বিশিষ্ট চিকিৎসা সংক্রান্ত বিজয়টি সম্ভব হ'ল। রকফেলার ইনস্টিটিউটে জীবাণুবিদ্যাবিদ্‌রা তখনও পীতজ্বর সংক্রান্ত বিষাণুর বিরুদ্ধে আরও কিছু কার্যকরী প্রতিরোধকের সন্ধান করছিলেন। মশককুল নির্মূল করা অসম্ভব ব্যাপার, তা'ছাড়া ক্রান্তি-বৃত্ত অঞ্চলে সংক্রামিত বানররা সর্বদা এই রোগের সঞ্চয় স্থান হিসাবে রয়েছে। রকফেলার ইনস্টিটিউটের ম্যাক্স থিলার এই বিষাণু তনুকরণের চেষ্টা শুরু করেন। তিনি বিষাণুটি ২০০টি ইঁদুর এবং ১০০টি মুরগীর ডিমের মধ্য দিয়ে পরিচালিত ক'রে অবশেষে এক ধরনের পরিব্যক্ত প্রজাতি পেলেন, যার

আক্রমণে এই রোগের মৃদু লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় এবং পরিশেষে পীতজ্বরের বিরুদ্ধে পূর্ণ অনাক্রম্যতা গড়ে ওঠে। এই অবদানের জন্য ফিলার ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভেষজতত্ত্ব ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

সব কিন্তু মেনে নিয়েও এই কথা বলা চলে যে, কাঁচের পাত্রে কালচারের কাজ যে রকম নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে, ত্বরিতগতিতে ও নিপুণভাবে সম্ভব হয় অন্যত্র তা হয় না। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে হারভার্ড মেডিকেল স্কুলের জন এফ্. এণ্ডার্স, টমাস এইচ. ওয়েলার ও ফ্রেডারিক সি. রবিনস ক্যারেলের পদ্ধতিতে ফিরে গেলেন। (ক্যারেল ১৯৪৪ সালে মারা যান, তিনি উক্ত গবেষকদের সাফল্য দেখে যেতে পারেননি)। এই সময়ের কলা কালচারে (tissue culture) ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁদের কাছেও নতুন এক অস্ত্র ছিল—তা হচ্ছে এ্যান্টিবায়োটিকস্। তাঁরা কলাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহে পেনিসিলিন এবং স্ট্রেপ্টোমাইসিন যোগ করেন, ফলে বিশুদ্ধ বিষাণু উৎপাদনে আর কোনো ঝামেলা রইল না। আকস্মিক প্রেরণার বশে, তাঁরা পোলিওমায়োলিটিস রোগের বিষাণু নিয়ে এই পরীক্ষা করেন। পূর্বোক্ত মাধ্যমে ঐ বিষাণুর চাষ সফলকাম হওয়ায় তাঁদের আনন্দের সীমা রইল না। এই পরীক্ষার ফলে পোলিও রোগ জয়ের পথ সুগম হ'ল এবং উপরোক্ত তিনজন গবেষক ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভেষজতত্ত্ব ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

বৃহদাকারের পরীক্ষা বর্তমানে পোলিওমায়েলিটিস বিষাণু কেবলমাত্র বানরের (যেগুলি গবেষণাগারের দামী প্রাণী এবং মেজাজী) মাধ্যমের বদলে টেস্ট-টিউবে চাষ করাও সম্ভব। বিষাণু নিয়ে এই কলা কালচার পদ্ধতির সহায়তায়ই পিট্‌স্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জোনাস ই. সল্ক বিষাণুর উপর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার গবেষণা করতে সমর্থ হন এবং আবিষ্কার করেন যে, ফরম্যাল ডিহাইডে মৃত পোলিও বিষাণুই দেহে অনাক্রম্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টিতে সক্ষম এবং অধুনা বিখ্যাত 'সক্ ভ্যাক্সিন' (salk-vaccine) আবিষ্কার করেন।

পোলিও রোগে মৃত্যুর উচ্চহার, পক্ষাঘাতের বিভীষিকা, শিশুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং বিশেষ ক'রে এই রোগে আক্রান্ত বিখ্যাত ফ্রাঙ্কলিন. ডি. রুজভেল্টের জন্য, এই রোগ বিজয় মানব ইতিহাসে বিভিন্ন রোগবিজয়ের মধ্যে সবিশেষ স্মরণীয়। হলিউডের উদ্বোধনী প্রচারের মতো চিকিৎসা সংক্রান্ত আর কোনো ঘোষণা সম্ভবতঃ এত সাড়ম্বর অভ্যর্থনা লাভ করে নি, যেমন লাভ

করেছিল 'সক্-ভ্যাক্‌সিনের' কার্যকারিতা সম্বন্ধে তদন্তকারী কমিটির বিবরণী। অবশ্য উল্লাস প্রকাশের অন্যান্য অনেক সাধারণ কারণের চেয়ে এই আবিষ্কারটি যে উৎকৃষ্টতর সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু অতি উৎসাহের উদ্দাম প্রচারের আড়ম্বরে, বিজ্ঞানের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই ভ্যাক্‌সিনের জন্য জনসাধারণের প্রবল চাহিদা মেটাতে আপাতদৃষ্টিতে এমন কিছু ত্রুটিযুক্ত, ভ্যাক্‌সিন অনবধানতাবশতঃ বাজারে চালু হয়, যা অনাক্রম্যতার পরিবর্তে ব্যাধিটিরই সৃষ্টিকারী—ফলে জনসাধারণের পাল্টা রুষ্ট প্রতিক্রিয়ায় এই রোগের বিরুদ্ধে টিকাদান কার্য বেশ কিছুদিন ব্যাহত হয়। তা সত্ত্বেও পোলিও বিষাণু বশে আনার গবেষণার যে বিজয় গৌরব তা বিষাণুর বিরুদ্ধে নব নব বিজয় লাভের পথ সুগম করবে।

ভ্যাক্‌সিন ঠিক কি ভাবে কাজ করে? এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো ভবিষ্যতে অনাক্রম্যতার রাসায়নিক রহস্যের চাবিকাঠি আমাদের হাতে তুলে দেবে।

অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় জীববিদ্যাবিদরা সংক্রমণের বিরুদ্ধে দেহের মুখ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্যে "এ্যান্টিবডিস" (antibodies)-গুলির সংগে পরিচিতি লাভ করেন। (অবশ্য রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি রয়েছে, যেগুলিকে বলা হয় "ফ্যাগোসাইট্‌স্" (phagocytes); যেগুলি ব্যাকটিরিয়াভুক্। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রুশ জীববিদ্যাবিদ ইলিয়া ইলিচ মেশনিকভ্ এই ব্যাপারটি আবিষ্কার করেন। তিনি পাস্তরের পর প্যারিসের পাস্তর ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং আরলিকের সঙ্গে একত্রে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ভেষজতত্ত্ব ও শারীর বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু বিষাণুর বিরুদ্ধে ফ্যাগোসাইটগুলি কার্যকরী নয় এবং যে অনাক্রম্যতা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছি তার সঙ্গে এর সম্বন্ধও নেই)। বিষাণু অথবা যে কোনো আগন্তুক বস্তুই দৈহিক রসায়নে প্রবিষ্ট হলে তাদের বলা হয় "এ্যান্টিজেন" (antigen)। এ্যান্টিবডি এমন একটি বস্তু যা নির্দিষ্ট এ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য দেহে বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হয়। এই বস্তুটি এ্যান্টিজেনের সংগে সম্মিলিত হয়ে এ্যান্টিজেনের কর্মক্ষমতা লোপ করে।

রসায়নবিদরা এ্যান্টিবডি চিহ্নিত করার বহু পূর্বেই নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, এ্যান্টিবডিগুলি প্রোটিন ছাড়া কিছু নয়। কারণ, প্রথমতঃ অতিপরিচিত এ্যান্টিজেনগুলি প্রোটিন এবং অনুমিত হয় যে, প্রোটিনই প্রোটিনকে শিকার



একটি ষাঁড়ের স্পার্ম (Sperm) কোষ



যকৃত-সেল (Liver cell), দশ হাজার গুণ বাড়ানো হয়েছে।

করে। নির্দিষ্ট একটি এ্যান্টিজেনকে বেছে নিয়ে তার সংগে মিলিত হবার মতো সাংগঠনিক কৌশল একমাত্র প্রোটিনেই সম্ভব।

পূর্বে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাণ্ডস্টীনার (রক্ত শ্রেণীর আবিষ্কর্তা) কতকগুলি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, এ্যান্টিবডিগুলি অত্যন্ত বিশিষ্ট গুণ সম্পন্ন। এ্যান্টিবডি উৎপাদনের জন্য তিনি যে বস্তু ব্যবহার করেন তা এ্যান্টিজেন নয়, আরও সরল ধরনের সব যৌগ, যেগুলির পরিগঠন সুপরিজ্ঞাত ছিল। সেগুলি ছিল আরসেনিক সমন্বিত যৌগ, যার নাম "আরসানিলিক এ্যাসিড"। সরল ধরনের প্রোটিন—যেমন ডিমের শ্বেতাংশ (অর্থাৎ এ্যালবুমেনের) সংমিশ্রণে আরসানিলিক এ্যাসিড প্রাণীদেহে সূচী-প্রয়োগে এ্যান্টিজেনের ন্যায় কাজ করে এবং রক্তমস্তুতে এ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে। অধিকন্তু এই এ্যান্টিবডি মাত্র আরসানিলিক এ্যাসিডের বিরুদ্ধেই বিশিষ্টরূপে কার্যকরী; প্রাণীর রক্তমস্তু মাত্র আরসানিলিক-এ্যালবুমেন সংমিশ্রণকেই নষ্ট করে, বিশুদ্ধ এ্যালবুমেনকে নয়। বস্তুতঃ সময় বিশেষে এ্যালবুমেনের সংমিশ্রণ ব্যতিরেকেই কেবলমাত্র আরসানিলিক এ্যাসিডের সঙ্গে এ্যান্টিবডির প্রতিক্রিয়া ঘটান সম্ভব। ল্যাণ্ডষ্টীনার আরও প্রমাণ করেন যে, আরসানিলিক এ্যাসিডের পরিগঠনে অতি সামান্য পরিবর্তনই এ্যান্টিবডিতে প্রতিফলিত হয়। একটি নির্দিষ্ট ধরনের আরসানিলিক এ্যাসিডে উদ্দীপিত এ্যান্টিবডি, সামান্য ভিন্ন ধরনের আরসানিলিক এ্যাসিডের এ্যাসিডের বিরুদ্ধে কার্যকরী নয়।

আরসানিলিক এ্যাসিডের মতো যে সব যৌগ প্রোটিনের সম্মিলনে এ্যান্টিবডি উৎপাদন করে,ল্যাণ্ডস্টীনার সেগুলির নামকরণ করেন "হ্যাপটেন্‌স্" (haptens—গ্রীক শব্দ থেকে গৃহীত; যার অর্থ "বন্ধন করা")। অনুমিত হয় যে, প্রত্যেকটি প্রকৃতিজাত এ্যান্টিজেনের অণুতে একটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে যা হ্যাপটেন হিসাবে কাজ করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী যে জীবাণু বা বিষাণুগুলি ভ্যাক্‌সিন হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলির পরিগঠনে যথেষ্ট পরিবর্তনের ফলে সেগুলির কোষ ধ্বংসের ক্ষমতা হ্রাস পায় কিন্তু হ্যাপটেন শ্রেণী যথাযথ বজায় থাকে, যার ফলে সেগুলি নির্দিষ্ট এ্যান্টিবডি নির্মাণের কারণ স্বরূপ হয়।

প্রকৃতিজাত হ্যাপটেনগুলির রাসায়নিক প্রকৃতির সম্বন্ধে অনুশীলন খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। যদি ব্যাপারটি নির্ধারণ করা সম্ভব হয় তবে সম্ভবতঃ হ্যাপটেনকে কোনো একটি নির্দোষ প্রোটিনের সম্মিলনে ভ্যাক্‌সিন্ হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে, যে বস্তুটি নির্দিষ্ট এ্যান্টিজেনের এ্যান্টিবডিগুলি

উৎপাদন করবে। ফলে অধিবিষ (toxins) দুর্বল বিষাণুর ব্যবহার, (যাতে সব সময় সামান্য ঝুঁকির অবকাশ রয়েছে) পরিহার করা সম্ভব হবে।

ঠিক কি ভাবে এ্যান্টিজেন এ্যান্টিবডির সৃষ্টি করে তা নিধারিত হয়নি। আরলিক বিশ্বাস করতেন যে, দেহে স্বাভাবিকভাবেই সকল রকমের এ্যান্টিবডি অল্প পরিমাণে উপস্থিত রয়েছে এবং যথাযথ এ্যান্টিবডির সঙ্গে আক্রমণকারী এ্যান্টিজেনগুলির প্রতিক্রিয়ায় দেহকে সেই বিশেষ এ্যান্টিবডির অধিকতর উৎপাদনে উদ্দীপিত করে। কোনোও কোনোও অনাক্রম্যবিদ্(immunologists) এখনও এই তত্ত্ব বা এই তত্ত্বের পরিশোধিত ভাষ্যে বিশ্বাসী। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেহ যে সম্ভাব্য সকল প্রকার এ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে এবং এমন কি অস্বাভাবিক আরসানিলিক এ্যাসিডের মতো পদার্থের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট এ্যান্টিবডিগুলি সহ সর্বদাই প্রস্তুত থাকে—এই ব্যাপার একান্তই অবাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়।

উপরোক্ত তত্ত্বের বিকল্পে বলা হয় যে, দেহে কোনো একটি সাধারণ প্রোটিন অণুর উপস্থিতি রয়েছে, যেটি যে কোনো এ্যান্টিজেনের অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে এ্যান্টিজেনের সংগে প্রতিক্রিয়াকার্য বিশেষ এ্যান্টিবডি গড়ে তুলতে, এ্যান্টিজেনটি ছাঁচের কাজ করে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে পাউলিং এই তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন যে, বিশেষ এ্যান্টিবডিগুলি একই মূল অণুর বিভিন্ন পরিবর্তিত রূপ, যা বিভিন্নভাবে পরিগঠিত হয়েছে। অন্য ভাবে বলা যায় যে, দস্তানা যেমন হাতের মাপে হয়, এ্যান্টিবডিগুলি বিশেষ এ্যান্টিজেনের সামঞ্জস্যে উৎপাদিত হয়।

কিন্তু এ্যান্টিবডিগুলির এই বিশিষ্টতাই এক ধরনে অসুবিধাজনক। অনুমান করা যাক্, একটি বিষাণুতে পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে সেটির প্রোটিন গঠন সামান্য ভিন্ন। এই বিষাণুটির পুরনো এ্যান্টিবডি এই নতুন পরিগঠনের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। অর্থাৎ কোনো এক নির্দিষ্ট প্রজাতির বিষাণুর বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা অন্য কোনো প্রজাতির বিরুদ্ধে নিরাপদ নয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং সাধারণ সর্দিকাসির বিষাণুগুলিতে সামান্য ধরনের পরিব্যক্তির সম্ভাবনা বেশি হওয়ায় এই রোগগুলি প্রায়শঃই আমাদের হয়ে থাকে। বিশেষ ক'রে ইনফ্লুয়েঞ্জার সময় বিশেষে এমন পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয়, যার সংক্রমণ ক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে প্রবল এবং যেগুলি জন্মলাভের পর প্রতিরোধ-শক্তিহীন বিস্মিত জগতের উপর দিয়ে বাত্যার মতো বয়ে যায়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাপার ঘটে,

এবং ১৮৫৭ সালে "এশিয়ান ফ্লু"ও (Asian flu) ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে—যদিও তাতে মৃত্যুর হার পুর্বের তুলনায় কম ছিল।

দেহের এ্যাণ্টিবডি উৎপাদনে অত্যুত্তম পারদর্শিতার আর একটি বিরক্তিকর উপসর্গ হচ্ছে কোনো নির্দোষ প্রোটিন দেহে প্রবেশ করলে তার বিরুদ্ধেও এ্যাণ্টিবডি উৎপাদনের প্রবণতা। দেহ তখন সেই প্রোটিনের বিরুদ্ধে "স্পর্শকাতর" হয়ে ওঠে এবং সেই নির্দোষ প্রোটিনের পরবর্তী যে কোনোও অনুপ্রবেশের প্রতিক্রিয়া হয় প্রবল। প্রতিক্রিয়াগুলি সাধারণতঃ চুলকানি অশ্রুপাত, নাকে ও গলায় লালা নিঃসরণ, হাঁপানি প্রভৃতির রূপ নেয়। কোনো কোনো উদ্ভিদের রেণু (হে-ফিভার সৃষ্টিকারী), কোনো কোনো খাদ্য প্রাণীদের রোম অথবা প্রাণীদের মরামাসে এই সব অ্যালার্জি-প্রতিক্রিয়ার (allergic reactions) সৃষ্টি হয়।

ধরতে গেলে প্রত্যেক মানুষেরই, অন্য মানুষ সম্বন্ধে এ্যালার্জি রয়েছে। এক ব্যক্তির শরীর থেকে অপর ব্যক্তির শরীরে অংগ বা উপাংগ সংযোজন (grafting) অথবা দেহান্তরে প্রতিরোপণ (transplantation) সহজ নয়, কেন না, গ্রহীতার দেহ সংযোজিত কলাকে (tissue) বহিরাগত প্রোটিন হিসাবে তার বিরুদ্ধে এ্যাণ্টিবডি উৎপাদিত করে। কেবলমাত্র অভিন্ন যমজের ক্ষেত্রেই এক ব্যক্তির দেহকলা অপর ব্যক্তির দেহে সংযোজন করা কার্যকরী হয়। যেহেতু অভিন্ন বংশগতির ফলে তাদের প্রোটিনগুলি ঠিক একই রকমের হয়, তারা পরস্পরের মধ্যে কলাগুলি (tissue) এবং এমন কি বৃক্কের মতো সম্পূর্ণ শরীরযন্ত্রও বিনিময় করতে পারে। আজকাল এই ধরনের কিছু কিছু শল্যচিকিৎসা নাটকীয়ভাবে সাফল্যলাভ করেছে। এক প্রাণীদেহ থেকে অপর প্রাণী দেহে কিছু কিছু অংগ সংযোজন কার্য আপাতদৃষ্টিতে সাফল্যলাভ করেছে এবং একটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের যমজেও তা সফল হয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই দেহে এ্যাণ্টিবডি উৎপাদন ব্যাহত করার জন্য দেহে প্রবল বিকীরণ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছে।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে গবেষকগণ আবিষ্কার করেন যে, রক্তস্রোতে 'হিস্টামিন' (histammine) নামে একটি পদার্থ সামান্য পরিমাণে নিঃসৃত হওয়ার ফলে অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই আবিষ্কারের ফলে অ্যালার্জির উপসর্গগুলি দূরীকরনের জন্য প্রশমণকারী 'হিস্টামিন প্রতিরোধী' (anti-histamine) পদার্থের অনুসন্ধান সার্থক হয়। অবশ্য বস্তুটির দ্বারা অ্যালার্জির লক্ষণগুলি

প্রশমিত হয়, অ্যালার্জি দূর করা সম্ভব নয়। (কয়েকটি অ্যালার্জি উপসর্গের সংগে সাধারণ সর্দিকাসির মিল থাকায় ঔষধ ব্যবসায়ীগণ স্থির করে যে, একটির পক্ষে প্রযোজ্য ওষুধ নিশ্চয়ই অপরটির বিরুদ্ধে কার্যকরী হবে এবং ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে 'অ্যান্টি হিস্টামিন, ট্যাবলেটে বাজার ছেয়ে ফেলে। সর্দিকাসির বিরুদ্ধে ট্যাবলেটগুলি কার্যকরী না হওয়ায় সেগুলির প্রচলন কমে যায়।)

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইলেকট্রোফোরেরিস্ প্রযুক্তির সাহায্যে প্রোটিন স্বতন্ত্রীকরণ পদ্ধতির ব্যবহারে জীববিদ্যাবিদ্‌গণ অবশেষে রক্তে এ্যান্টিবডিগুলির ভৌত অবস্থান নির্ণয়ে সমর্থ হন। যে রক্তাংশে এ্যান্টিবডিগুলির অবস্থিতি তার নাম "গামা গ্লোবিউলিন্" (gamma-globulin)।

কিন্তু শিশুর দেহ এ্যান্টিবডিগুলি উৎপাদনে অসমর্থ হওয়ায় তারা যে সহজেই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় সে বিষয়ে চিকিৎসকগণ বহুকাল অবহিত ছিলেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে ওয়াল্টার রীড হাসপাতালের ডাক্তাররা প্রবল সেপ্‌টিসেমিয়ায় (বিষাক্ত রক্ত) আক্রান্ত আট বছরের একটি বালকের প্লাজমা (plasma) ইলেকট্রোফোরেটিক বিশ্লেষণ করে আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করেন যে, তার রক্তে গামা গ্লোবিউলিনের চিহ্নমাত্র নেই। শীঘ্রই অপরাপর ক্ষেত্রে একই ব্যাপার আবিষ্কৃত হল। অনুসন্ধানকারীগণ প্রমাণ করেন যে, গামা গ্লোবিউলিনের এই অনুপস্থিতির হেতু বংশানুক্রমিক বিপাক-ক্রিয়ার ত্রুটি, যার ফলে গামা-গ্লোবিউলিন উৎপাদন ব্যাহত হয়; এই রোগটিকে বলা হয় "এ্যাগামাগ্লোবিউলিনেমিয়া" (agammaglobulinemia)। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা ব্যাক্‌টিরিয়ার বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা অর্জন করতে পারে না। অবশ্য বর্তমানে এ্যান্টিবায়োটিকগুলির ব্যবহারে তাদের বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বিষাণুর আক্রমণের বিরুদ্ধে—যেমন হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগের এক দফা আক্রমণের পর তারা অনাক্রম্যতা অর্জন করতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে বিষাণুর বিরুদ্ধে এ্যান্টিবডিগুলিই দেহের একমাত্র প্রতিরক্ষী নয়।

॥ ক্যান্সার (কর্কট রোগ) ॥

সংক্রামক রোগের বিপদ কমার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধরনের রোগাক্রমণের হার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে বহু লোক, যারা শতাব্দী কাল আগে তরুণ অবস্থায়

যক্ষ্মা, ডিপ্‌থিরিয়া, নিউমোনিয়া অথবা টাইফাস প্রভৃতি রোগের যে কোনো একটির আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারত তারা বর্তমানে যথেষ্ট দীর্ঘায়ু হয়ে হৃদরোগ অথবা ক্যান্সার রোগে প্রাণত্যাগ করে। হৃদরোগ ও ক্যান্সার যে পাশ্চাত্ত্য জগতে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় নম্বরের মারক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে উপরোক্ত ব্যাপার তার অন্যতম কারণ। বস্তুতঃ, ক্যান্সার মানুষের বিভীষিকার ক্ষেত্রে প্লেগ ও বসন্তের স্থান নিয়েছে। দুঃস্বপ্নের মতো এই আতঙ্কটি আমাদের বুকে চেপে আছে, বিনা পূর্বাভাসে এই রোগের হঠাৎ নির্মম আক্রমণে আমাদের যে-কেউ বলি হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে ক্যান্সার বিভিন্ন ধরনের রোগের সমষ্টি, যা দেহের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ধরনে আক্রমণ করে। কিন্তু সবক্ষেত্রেই প্রাথমিক বিপর্যয় একই ধরনের হয়—আক্রান্ত কলা-গুলির (tissue) বিশৃংখল অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি ও বিপর্যয়। ক্যান্সার (কর্কটের ল্যাটিন শব্দের অর্থ কাঁকড়া বা কর্কট—crab) নাম উৎপত্তির কারণ, হিপোক্রেটিস এবং গ্যালেন মনে করতেন যে, রোগাক্রান্ত শিরার মধ্য দিয়ে এই রোগটি উর্ধ্ব দাঁড়া কাঁকড়ার পার্শ্বগতির মতো দেহের ধ্বংসসাধন করতে করতে ছড়িয়ে পড়ে।

টিউমার (Tumor —ল্যাটিন শব্দগত অর্থ "বৃদ্ধি লাভ করা") ও ক্যান্সার মোটেই সমার্থক নয়; শব্দটি যেমন যে কোনো নির্দোষ দৈহিক বৃদ্ধি যেমন আব (নিরীহ টিউমার, benign tumor) প্রভৃতিকে বোঝায়, তেমনই ক্যান্সারও (দুষ্ট-টিউমার, malignant tumor) বোঝায়। আক্রান্ত কলাগুলি অনুযায়ী ক্যান্সারগুলি নানা নামে অভিহিত হয়। চামড়া ও যন্ত্রের অন্তঃস্থ আবরণীর ক্যান্সারকে (যেগুলির আক্রমণের হার সর্বাপেক্ষা বেশি) বলা হয় "কার্সিনোমাস" (Carcinomas—কাঁকড়ার গ্রীক শব্দ উদ্ভূত) ; যোজক কলাগুলির (Connective tissues) ক্যান্সারকে বলা হয় "সারকোমাস্" (sarcomas) ; যকৃতের ক্যান্সারকে "হেপাটোমা" (hepatoma) ; গ্ল্যাণ্ডগুলির ক্যান্সারকে "এ্যাডিনোমাস" (adenomas) ; রক্তের শ্বেত কণিকার ক্যান্সারকে "লিউকেমিয়া" (leukemia) প্রভৃতি বলা হয়।

জার্মানীর রুডল্‌ফ্‌ ভিরশাউ, যিনি প্রথম অণুবীক্ষণে ক্যান্সারাক্রান্ত কলা পরীক্ষা করেন, বিশ্বাস করতেন যে, বহিঃস্থ প্রতিবেগের উত্তেজনা ও অভিঘাতের ফলে ক্যান্সারের উৎপত্তি। এইরূপ বিশ্বাস জন্মান স্বাভাবিক, কারণ দেহের যে অংশগুলি বহির্জগতে সবচেয়ে বেশি অনাবরিত থাকে সেই অংশগুলিতেই

ক্যান্সারের আক্রমণের হার বেশি। কিন্তু রোগের বীজাণুতত্ত্ব যে আমলে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সেই সময় রোগবিদ্যাবিদ্‌রা ক্যান্সারের জীবাণুর সন্ধানে ব্যাপৃত হন। রোগোৎপত্তির বীজাণুতত্ত্বের ঘোরতর বিরোধী ভিরশাউ নিজস্ব 'উত্তেজনা তত্ত্বে' (irritation theory) অবিচল রইলেন। (যখন মনে হ'ল, অবশেষে বীজাণুতত্ত্বেরই জয় হবে, তিনি রোগবিদ্যার সাধনা ত্যাগ ক'রে প্রত্নতত্ত্ব ও রাজনীতিতে যোগদান করেন। ইতিহাসে খুব অল্প বৈজ্ঞানিকই ডুবন্ত ভুলের জাহাজের সঙ্গে এমন চরমভাবে তলিয়ে গেছেন)।

ভিরশাউ যদিও ভুল যুক্তির জন্য একগুঁয়েমি করেছিলেন, তবুও তাঁর একগুঁয়েমির কারণটি হয়ত একেবারে ভুল ছিল না। ক্রমশঃই প্রমাণ পাওয়া গেল যে, কতকগুলি প্রতিবেগ বিশেষ করে ক্যান্সার রোগের কারণ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চিমনী পরিষ্কারকগণের অণ্ডকোষের ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার প্রবণতা অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি ছিল। আলকাতরা উপজাত রঙের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, রঞ্জন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের চামড়া ও মূত্রস্থলীর (bladder) ক্যান্সারের হার সাধারণের চেয়ে বেশি। অনুমিত হ'ল যে, ব্লুল এবং এ্যানিলিন বর্গের রঞ্জকগুলিতে (aniline dyes) এমন কিছু আছে যাতে ক্যান্সারের সূত্রপাত হতে পারে। তারপর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে দুইজন জাপানী বৈজ্ঞানিক কে. ইয়ামাগিওয়া এবং কে. ইশিকাওয়া আবিষ্কার করেন যে, খরগোসের কানে দীর্ঘদিন ধরে আলকাতরা উপজাত কোনো কোনো রাসয়নিক পদার্থের প্রলেপে খরগোসের ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে দুইজন বৃটিশ রাসয়নিক "ডাইবেনজান্‌-থ্রাসিন্‌" (dibenzanthracene—পাঁচটি বেনজিন চক্র সমন্বিত একটি হাইড্রোকার্বন) নামক এক সংশ্লেষিত রাসয়নিক পদার্থের সাহায্যে প্রাণীদেহে ক্যান্সার সৃষ্টিতে সক্ষম হন। এই বস্তুটি আলকাতরায় পাওয়া যায় না। কিন্তু তিন বছর পরে আবিষ্কৃত হ'ল যে, "বেনজপাইরিন" (benzpyrene, এই বস্তুটিতেও পাঁচটি বেন্‌জিন্‌ চক্র ভিন্ন পরিগঠনে থাকে) নামক আলকাতরা উপজাত এক রাসয়নিক পদার্থ ক্যান্সার সৃষ্টিতে সক্ষম।

বর্তমানে বহুসংখ্যক ক্যান্সারোৎপাদক বা "কার্সিনোজেন (carcinogens) সনাক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলিই প্রথম আবিষ্কৃত পদার্থে দুইটির মতোই অগণ্য বেন্‌জিন্‌ চক্র সমন্বিত হাইড্রোকারবন। কতকগুলি আবার এ্যানিলিন বর্গের রঞ্জকগুলির সমতুল্য অণুবিশিষ্ট। বস্তুতঃ খাদ্যে কৃত্রিম রঞ্জক

ব্যবহারে প্রধান আশঙ্কার কারণ এই যে, দীর্ঘদিনের ব্যবহারে হয়ত সেই রঙ ক্যান্সার উৎপাদনকারী হয়ে উঠতে পারে।

বহু জীববিদ্যাবিদ্ বিশ্বাস করেন যে, গত দুই অথবা তিন শতাব্দী যাবৎ মানুষ তার প্রতিবেশে বহু নতুন নতুন ক্যান্সার উৎপাদনকারী বস্তুর সমাবেশ ঘটিয়েছে। কয়লার ব্যবহার বেড়েছে, অধিক মাত্রায় তেল পোড়ানো হয়, বিশেষ করে পেট্রোল ইঞ্জিনে; খাদ্য এবং বিলাসদ্রব্যে সংশ্লেষিত রাসয়নিক পদার্থের ব্যবহার বৃদ্ধি প্রভৃতি আরও অনেক। সবচেয়ে নাটকীয়ভাবে অবশ্য সন্দেহ করা হয় ধূমপানকে, অন্ততঃ পরিসাংখ্যিক হিসাবে—যার ফলে ফুসফুসের ক্যান্সারের হার বেড়েছে লক্ষ্য করা যায়।

যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাটি নিশ্চিতরূপে ক্যান্সার উৎপাদনকারী তা হচ্ছে তেজসমন্বিত বিকীরণ এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে থেকে মানুষ অধিকতর মাত্রায় এই বিকীরণের সান্নিধ্যে এসেছে।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ভিলহেল্ম্ কনরাড রোয়েণ্টজেন ক্যাথোড রশ্মি (cathode-ray) উৎপাদিত অনুপ্রভা (luminescence) পর্যবেক্ষণের জন্য এক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করেন। ফলাফল ভালো করে লক্ষ্য করার জন্য তিনি ঘরটি অন্ধকার করেন। তাঁর ক্যাথোড রশ্মি উৎপাদক নলটি একটি কালো কার্ডবোর্ড-বাক্সের আবরণে ঢাকা ছিল। ক্যাথোড রশ্মির নলটিকে চালু করতে তিনি ঘরের অপর প্রান্তে কোনো একটি কিছু হতে আলোকচ্ছটা লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হন। এই আলোকচ্ছটা এসেছিল বেরিয়াম প্ল্যাটিনোসায়ানাইড (Barium platinocyanide) প্রলিপ্ত একতাড়া কাগজ থেকে। উক্ত রাসায়নিক বস্তুটি হচ্ছে অনুপ্রভশীল। আবরক বাক্স থেকে উদ্ভূত বিকীরণের ফলেই কি এই আলোকচ্ছটা সম্ভব? রোয়েণ্টজেন ক্যাথোড-রশ্মির নলটি নিভিয়ে দিলেন, আলোকচ্ছটাও বন্ধ হ'ল। তিনি আবার নলটি নিভিয়ে দিলেন, আলোকচ্ছটাও বন্ধ হ'ল। তিনি আবার নলটি জ্বাললেন—আলোকচ্ছটাও ফিরে এল। তিনি কাগজগুলি পার্শ্ববর্তী ঘরে নিয়ে গেলেন, তবুও সেগুলি আলোকোজ্জ্বল রইল। স্পষ্টতঃই ক্যাথোড রশ্মির নল থেকে এমন এক ধরনের বিকীরণ উৎপন্ন হচ্ছিল, যা কার্ডবোর্ড এবং দেয়ালের বাধা ভেদ করতে সক্ষম।

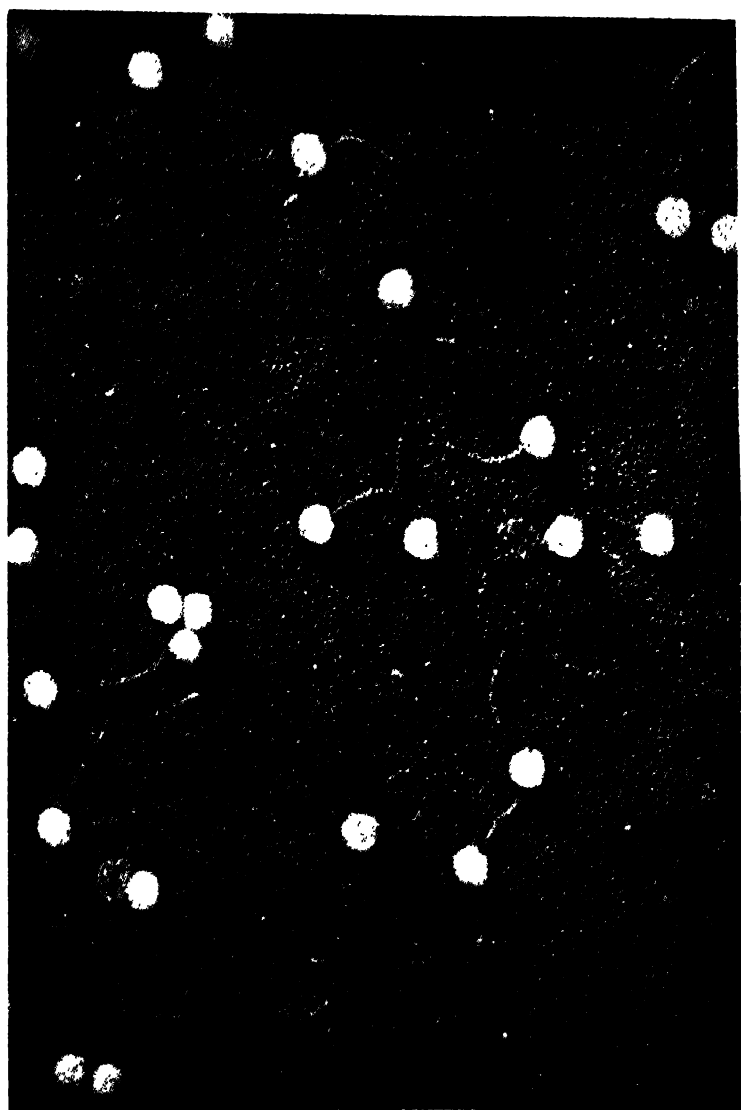
রশ্মিটি কি ধরনের সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা না থাকায় রোয়েণ্টজেন

রশ্মিটিকে শুধুই এক্স-রশ্মি (X-rays) নামে অভিহিত করেন। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ নাম পালটিয়ে রশ্মিটিকে 'রঞ্জন রশ্মি' (Roentgen-rays) নামে অভিহিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু রোয়েণ্টজেন শব্দটি জার্মান ভিন্ন অপরের পক্ষে উচ্চারণ দুষ্কর বলে 'এক্স-রে' নামটি চালু রইল।

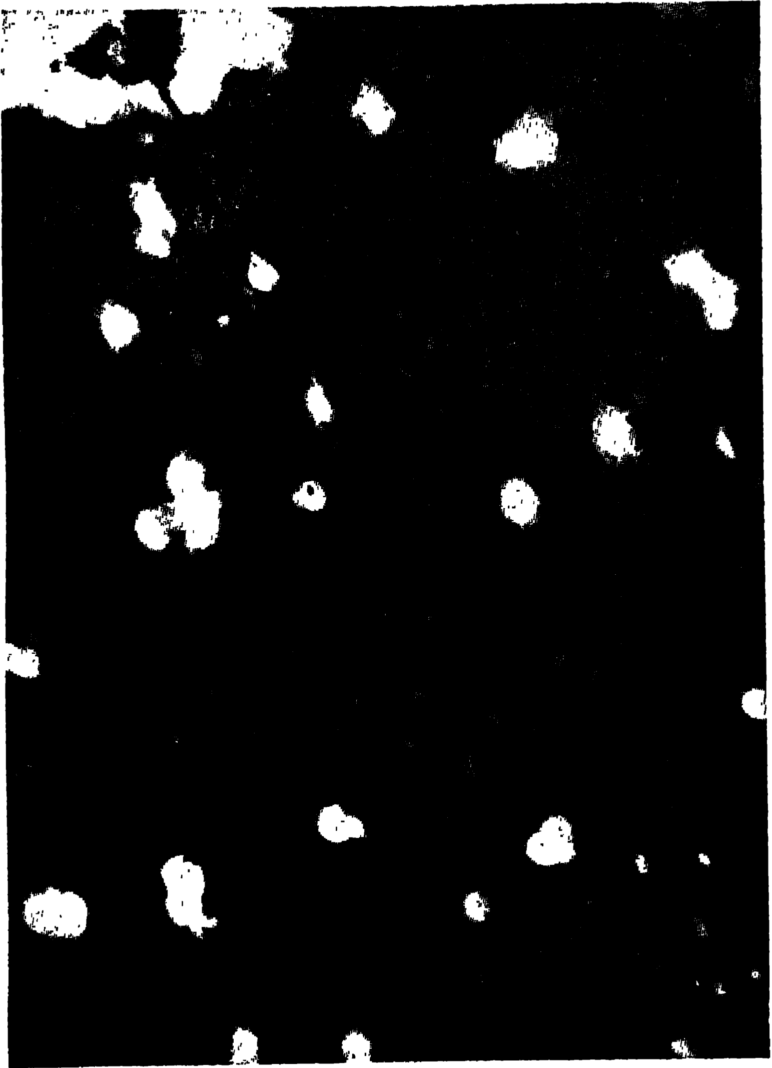
এক্স-রে পদার্থবিদ্যায় বিপ্লব আনল। ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিকদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করার ফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝড় বয়ে চলল এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তেজস্ক্রিয় বিকীরণ আবিষ্কৃত হ'ল, যার ফলে পরমাণুর অন্তঃস্থ জগতের দ্বার খুলে গেল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারের সূত্রপাত হলে রোয়েণ্টজেনই প্রথম পদার্থবিদ্যায় এই পুরস্কার লাভ করেন।

তীব্র এক্‌স্‌-রশ্মিজাত বিকীরণে অন্য কিছুরও শুরু হ'ল—মানুষের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতায় যা কখনও হয়নি—এই সময় থেকেই মানুষ সেই তেজসমন্বিত বিকীরণের অভিজ্ঞতা লাভ করল। রোয়েণ্টজেনের আবিষ্কারের সংবাদ আমেরিকায় পৌছবার চারদিন পরে এক রোগীর পায়ে বুলেটের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য এক্স-রের ব্যবহার হ'ল। দেহ অভ্যন্তর পুংখানুপুংখরূপে দেখার পক্ষে এ পদ্ধতিটি আশ্চর্যভাবে উপযোগী। এক্স-রে সহজেই নরম কলাগুলি (নিম্ন পারমাণবিক ভর বিশিষ্ট মৌল দিয়ে মুখ্যতঃ গঠিত) ভেদ করে এবং উচ্চ পারমাণবিক ভর বিশিষ্ট মৌল, যথা—হাড় (মুখ্যতঃ ফস্‌ফোরাস্‌ এবং ক্যালসিয়াম দ্বারা গঠিত) কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয়। দেহের অপর পার্শ্বে রক্ষিত একটি আলোকচিত্রগ্রহণকারী প্লেটে যে সকল নরম কলায় এক্স-রে অল্প পরিমাণ মাত্র শোষিত হওয়ায় তীব্র বেগে নির্গত হয়েছে, তারই কালো পটভূমিকায় হাড়গুলি সাদা মেঘের মতো দেখায়। সীসার বুলেটকে সম্পূর্ণ সাদা দেখায়, কারণ এক্স-রে সেটিকে ভেদ করতে সক্ষম নয়।

স্পষ্টতঃই, হাড়ের ভাঙন, ক্যালসিয়াম-পুঞ্জীভূত (calcified) জোড়গুলি দাঁতের গহ্বরগুলি এবং দেহের মধ্যে কোনো বহিঃস্থ বস্তুর অবস্থিতি প্রভৃতি নির্ণয়ে এক্স-রের উপযোগিতা রয়েছে। কিন্তু আরও সহজ হচ্ছে ভারী পদার্থের (heavy eliment) অদ্রবনীয় লবণ (insoluble salt) অণুপ্রবিষ্ট করিয়ে নরম কলাগুলির পরিলেখ সৃষ্টি করা। বেরিয়াম সালফেট গলাধঃকরণ করলে পাকস্থলী ও অন্ত্রের পরিলেখ সৃষ্টি হয়। রক্তে একটি আয়োডিন সমন্বিত যৌগ সূচীপ্রয়োগ করলে তা বৃক্ক (kidney) ও জরায়ুতে উপস্থিত হয় এবং সেগুলির পরিলেখ সৃষ্টি করে; কারণ যেহেতু আয়োডিনের পার-



ব্যাক্‌টেরিওফাজ



ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস

মাণবিক ওজন উচ্চমাত্রার, সেই হেতু বস্তুটি এক্স-রের পক্ষে অনচ্ছ (opaque)।

এক্স-রের আবিষ্কারের পূর্বেও ডেনদেশীয় চিকিৎসক নিয়েলস্ র‍্যাইবার্গ ফিনসেন আবিষ্কার করেন যে, উচ্চতেজের বিকীরণ জীবাণু ধ্বংসে সক্ষম; তিনি লুপুস ভালগারিস (lupus vulgaris) নামক চর্মরোগের ব্যাকটিরিয়া ধ্বংসের জন্য অতিবেগুনী আলোক ব্যবহার করেন। (১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই অবদানের জন্য তিনি ভেষজবিদ্যা ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন)। দেখা গেল, এক্স-রেগুলি আরও বেশি মারাত্মক। সেগুলি 'রিং ওয়ার্ম' (ring-worm)-জাত ছত্রাক ধ্বংসে সক্ষম। এক্স-রে মনুষ্য-কোষের ধ্বংস বা ক্ষতি-সাধনেও সক্ষম এবং কালক্রমে, শল্য চিকিৎসকের নাগালের বাইরে—আক্রান্ত ক্যান্সার কোষগুলি ধ্বংসের জন্য রশ্মিটির ব্যবহার প্রচলিত হয়।

অনেক অভিজ্ঞতায় অবশেষে আরও আবিষ্কৃত হ'ল যে, উচ্চ তেজের বিকীরণের ফলে ক্যান্সার 'সৃষ্টি' সম্ভব। এক্স-রে এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থের বহু পূর্বতন গবেষক ক্যান্সার রোগে মৃত্যুমুখে পতিত মেরী কুরি এবং তাঁর কন্যা আইরিন জোলিও কুরী উভয়েই লিউকেমিয়ায় মারা যান; উভয় ক্ষেত্রেই বিকীরণ হতেই যে ক্যান্সারের উদ্ভব—সে কথা সহজ বিশ্বাস্য! ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ গবেষক জি. এম্ ফিন্ড্লে আবিষ্কার করেন যে, অতিবেগুনী আলোকের বিকীরণের তেজে, ইঁদুরের চামড়ায় ক্যান্সারের উৎপত্তি হয়।

বর্ধিতহারে তেজসমন্বিত বিকীরণের অধীনস্থ হওয়ার ফলেই (চিকিৎসা-বিদ্যায় এক্স-রের ব্যবহার প্রভৃতি) যে মানুষের ক্যান্সার রোগের হার বেড়েছে সে কথা সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ আছে এবং পারমাণবিক বিস্ফোরণজাত ধূলি পতনের ফলে আমাদের হাড়ে স্ট্রন্শিয়াম ৯০এর পুঞ্জীভবনের ফলে হাড়ের ক্যান্সার রোগ এবং লিউকেমিয়ার হার বাড়বে কি না তা ভবিষ্যতে নির্ণীত হবে।

সব কিছু ক্যান্সার উৎপাদনকারী পদার্থ—যথা রাসায়নিক পদার্থ, বিকীরণ প্রভৃতি—এগুলির মধ্যে মিল কোথায়? একটি যুক্তিসংগত অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে, এইগুলির প্রভাবে প্রজননগত পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয় এবং দেহস্থ কোষের পরিব্যক্তির ফলে ক্যান্সারের উৎপত্তি ঘটে।

অনুমান করা যাক, কোনো একটি জীনের পরিবর্তন হ'ল, যেটি কোষের বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রক রূপে প্রয়োজনীয় মূল উৎসেচকটি উৎপাদনের ক্ষমতা হারাল। এইরকম ত্রুটিযুক্ত জীনসমন্বিত কোনো কোষ বিভাজিত হ'লে, ত্রুটিযুক্ত জীনটি উৎপাদিত কোষে সঞ্চারিত হবে। এইভাবে নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র কাজ না করা সত্ত্বেও, কোষ বিভাজন অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলতে পারে. যা সমস্ত দেহ অথবা এমন কি সংশ্লিষ্ট কলার প্রয়োজনে দৃক্‌পাত করবে না (উদাহরণ স্বরূপ, শারীরযন্ত্রের কোনো কোষের বিশেষ ক্ষমতা অর্জন)। কলাটি এইভাবে বিপর্যস্ত হবে। ব্যাপারটা যেন দেহে এক ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি।

তেজসমন্বিত বিকীরণ যে পরিব্যক্তির সৃষ্টি করে সে তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ক্যান্সার উৎপাদনকারী (Carcinogens) রাসায়নিক পদার্থগুলির ব্যাপার কি? রাসায়নিক পদার্থও যে পরিব্যক্তির সৃষ্টি করে তারও পরীক্ষা যোগে প্রমাণিত হয়েছে। এই ব্যাপারে চমৎকার উদাহরণ হচ্ছে 'নাইট্রোজেন মাস্টার্ডস্' (nitrogen mustards)। এই যৌগটি প্রথম মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত মাস্টার্ড গ্যাসের (mustard gas) ন্যায় চামড়া পুড়িয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে—যেমন করে এক্স-রেগুলি। এইগুলি ক্রোমোজোমের ক্ষতিসাধন ক'রে পরিব্যক্তির হারও বাড়ায়। তাছাড়া তেজসমন্বিত বিকীরণের ন্যায় ক্রিয়াশীল আরও রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

যে সকল রাসায়নিক পদার্থ পরিব্যক্তির সৃষ্টি করে তাদের বলা হয় "মিউটাজেন্‌স্" (mutagens) বা "পরিব্যক্তি সৃষ্টিকারী"। সমস্ত পরিব্যক্তি সৃষ্টিকারী পদার্থই ক্যান্সার সৃষ্টিকারী (carcinogens) নয় এবং ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থই পরিব্যক্তি সৃষ্টিকারী নয়, সে ব্যাপারটি প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এমন বহু যৌগ আছে যেগুলি পরিব্যক্তি সৃষ্টি ও ক্যান্সার সৃষ্টি উভয় গুণসম্পন্ন হওয়ায় সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে যে, এই সমপাতন আকস্মিক নয়।

ইতিমধ্যে ক্যান্সার উৎপাদনে জীবাণুর ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণাটুকু একেবারে লোপ পায়নি। বিষাণু আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পাস্তুরের আমলের ধারণা পুনর্জন্ম লাভ করে। রকফেলার ইনস্টিটিউটের পিটন রুস্-ই প্রথম গবেষণাকারী, যিনি সম্ভাব্য বিষাণুর অনুসন্ধান করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুরগীর ছানার টিউমার নিষ্পেষিত ক'রে ছেঁকে নেন এবং পরিষ্কার পরিস্রুৎটি অন্যান্য মুরগীর ছানায় সূচীপ্রয়োগ করেন। তাদের মধ্যে কয়েকটির টিউমার হয়। পরিস্রুৎটি যত সূক্ষ্ম হয় টিউমারের সংখ্যা তত কমে। এই ব্যাপারে মনে হ'ল, নিশ্চয়ই

কোনো ধরনের কণিকা টিউমার উৎপাদনের জন্য দায়ী এবং অনুমিত হ'ল কণিকাগুলির মাপ বিষাণুর মতো।

"টিউমার বিষাণু"র ইতিহাস খুবই চাঞ্চল্যকর। প্রথম যে টিউমার উৎপাদনকারী বিষাণুর সন্ধান পাওয়া গেল সেগুলি এক প্রকৃতিকভাবে নিরীহ (uniformly benign); উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পরীক্ষা ক'রে দেখানো হয়েছে বিষাণুগুলি খরগোসের 'প্যাপিলোমাস' (Papillomas) (আঁচিলের মতো বস্তু) সৃষ্টিতে সক্ষম। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মেইনের বার হারবারের বিখ্যাত ইঁদুর প্রজনন পরীক্ষাগারে, জন. জে. বিট্‌নার চমকপ্রদ কিছু আবিষ্কার করেন। উক্ত পরীক্ষাগারের মড্ স্লাই দুইটি প্রজাতির ইঁদুরের প্রজনন করানো ঘরে একটিতে ক্যান্সার আক্রমণের প্রবণতা ছিল এবং অপর প্রজাতিটির ক্যান্সার প্রতিরোধে জন্মগত ক্ষমতা ছিল। দ্বিতীয় প্রজাতির ইঁদুরগুলির ক্বচিৎ ক্যান্সার রোগ দেখা যেত, কিন্তু প্রথম প্রজাতির প্রায় প্রত্যেকটি পূর্ণবয়স্ক ইঁদুর ক্যান্সারে আক্রান্ত হ'ত। বিট্‌নারের পরীক্ষায় নবজাত বাচ্চার মা বদল করা হ'ত, যার ফলে এক প্রজাতির বাচ্চা অন্য প্রজাতির দুগ্ধ পান করত। তিনি আবিষ্কার করেন যে, ক্যান্সার প্রতিরোধকারী প্রজাতির বাচ্চা ক্যান্সার আক্রমণের প্রবণতা সমন্বিত মাতার দুগ্ধ পানে সাধারণতঃ ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হ'ত। অপর পক্ষে ক্যান্সার আক্রমণের প্রবণতা সম্পন্ন বাচ্চা রোগপ্রতিরোধকারী মাতার দুগ্ধপানে ক্যান্সারে আক্রান্ত হ'ত না। বিটনার সিদ্ধান্ত করেন যে, ক্যান্সারের কারণ তা সে যাই হোক না কেন, জন্মগত নয়, তা মাতৃদুগ্ধে বাহিত হয়। তিনি বস্তুটির নাম দেন "মিল্ক ফ্যাক্টর" (milk factor)।

স্বভাবতঃই বিটনারের মিল্ক ফ্যাক্টরকে বিষাণু বলে সন্দেহ করা হ'ল। অবশেষে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়নবিদ স্যামুয়েল গ্রাফ্ মিল্ক ফ্যাক্টরের কণিকাগুলিতে নিউক্লিক এ্যাসিড সমূহের উপস্থিতি আবিষ্কার করেন। অন্যান্য টিউমার বিষাণুগুলি, যা কয়েক ধরনের ইঁদুরের টিউমার এবং প্রাণীর লিউকেমিয়া রোগসমূহ সৃষ্টি করে, আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সে সবগুলিতেই নিউক্লিক এ্যাসিডসমূহ বর্তমান। মানুষের ক্যান্সারের কোনো বিজাণু আবিষ্কৃত হয়নি। কারণ, স্পষ্টতঃই মানুষের ক্ষেত্রে ক্যান্সারের গবেষণাকার্য সীমাবদ্ধ।

বর্তমানে পরিব্যক্তিতত্ত্ব এবং বিষাণুতত্ত্ব সম্মিলিত হতে শুরু করেছে। সম্ভবতঃ উভয় ধারণার আপাত বৈপরীত্য মোটেই বিপরীত নয়। বিষাণু

এবং জীনসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তুর সমতা রয়েছে, উভয়ের ব্যবহার বিধির চাবিকাঠি রয়েছে নিউক্লিক এ্যাসিডগুলিতে। বস্তুতঃ, ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জি. এ. ডি. মেয়োরকা, স্লোন কেটারিং ইনস্টিটিউট এবং ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অব হেলথে তাঁর সহকর্মীবৃন্দ ইঁদুরের টিউমার থেকে ডি. এন্. এ. অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন এবং প্রমাণ করেন যে, কেবলমাত্র ঐ ডি. এন. এ. বিষাণুর মতোই কার্যকরীভাবে ক্যান্সার উৎপাদনে সক্ষম।

এইভাবে পরিব্যক্তিতত্ত্ব এবং বিষাণুতত্ত্বের পার্থক্য যে-প্রশ্নে একীকৃত হয় তা হচ্ছে যে, ক্যান্সার উৎপাদনকারী নিউক্লিক এ্যাসিডটি জীনে পরিব্যক্তির ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে, না কোষ বহিঃস্থ বিষাণুর আক্রমণে দেহে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে। এই উভয় ব্যাপারই শুধু যে পৃথক পৃথক ভাবে কার্যকরী তাই নয়, একত্রেও ক্রিয়াশীল হতে পারে।

কিন্তু কোষগুলি যখন অসংযত ভাবে বৃদ্ধিলাভ করে তখন বিপাক ক্রিয়া যন্ত্রে কি রকম বৈকল্যের সূচনা করে? এখনও পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। কতকগুলি গ্রন্থিরস বা হরমোন (hormones) সম্বন্ধে সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে, বিশেষ ক'রে 'সেক্স হরমোন' (sex hormone) বা যৌন গ্রন্থিরস সম্বন্ধে।

তার একটি কারণ হচ্ছে, যৌন গ্রন্থিরস যে দেহে স্থানিক বৃদ্ধি উদ্দীপিত করে, তা আমাদের জানা আছে (যেমন, উদ্ভিন্নযৌবনা বালিকার স্তন)। দ্বিতীয় কারণ, জনন-যন্ত্রের কলাগুলি—স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে স্তন, কাঁধ ও ডিম্বকোষ এবং পুরুষের অণ্ডকোষ ও প্রোস্টেট (prostate) বিশেষ ক'রে ক্যান্সার আক্রান্ত হবার সম্ভাবনাসম্পন্ন। রাসয়নিক সাক্ষ্যই অবশ্য সব চেয়ে জোরদার। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান প্রাণরসায়নবিদ্ হাইনরিখ্ ভাইল্যাণ্ড (যিনি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাইল এ্যাসিডস্ বা পিত্ত অম্লসমূহের উপর গবেষণার জন্য রসায়নবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন) বাইল এ্যাসিডকে" "মিথাইল-কোল্যানথ্রীন্" (methylcholanthrene) নামে একটি জটিল হাইড্রোকার্বনে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হন, যে বস্তুটি একটি শক্তিশালী ক্যান্সার উৎপাদনকারী রাসায়নিক পদার্থ (Carcinogen)। মিথাইল কোল্যানথ্রীন্ (বাইল এ্যাসিডের মতোই) চারটি চক্র সমন্বিত স্টেরয়েড্ (steroid) এবং উল্লেখযোগ্য যে, সমস্ত যৌনগ্রন্থিরসগুলিই স্টেরয়েড্। বিকৃত গঠনের যৌন-

গ্রন্থিরসের অণু কি তা হলে ক্যান্সার উৎপাদনকারী হিসাবে কাজ করে? অথবা সঠিক ধরনের গ্রন্থিরসও বিকৃত ধাঁচের জীন কর্তৃক, ক্যান্সার উৎপাদকের ভ্রান্ত ভূমিকায় অবতরণে বাধ্য হয়ে অনিয়ন্ত্রিত কোষ বৃদ্ধি উদ্দীপিত করে? ব্যাপারটি অনুমানসাপেক্ষ, কিন্তু সম্ভাবনাগুলি কৌতূহলোদ্দীপকও বটে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, কখনও কখনও যৌন-গ্রন্থির ক্ষরণ সরবরাহের পরিবর্তন ক'রে ক্যান্সার বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, দেহে পুরুষের যৌন-গ্রন্থির ক্ষরণ উৎপাদন কম করার জন্য অণ্ডকোষ-কর্তন অথবা প্রজননকারী স্ত্রী যৌনগ্রন্থির ক্ষরণদানে প্রোস্টেটে ক্যান্সারের আক্রমণ হ্রাস করা যায়। চিকিৎসা হিসাবে অবশ্য এই ব্যাপারে হৈ চৈ করার কিছু নেই, কারণ ক্যান্সার প্রতিরোধে অক্ষমতার হতাশাই আমাদের এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করে।

শল্যচিকিৎসাই এখনও পর্যন্ত ক্যান্সারের বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র। কিন্তু এই চিকিৎসার সীমা পূর্বের মতোই নির্দিষ্ট; কখনও কখনও রোগীর মৃত্যু না ঘটিয়ে ক্যান্সার কেটে বার করা সম্ভব নয়, আবার প্রায়ই ছুরি চালনার সময় আক্রান্ত কলার অংগ (যেহেতু বিপর্যস্ত ক্যান্সার কলাগুলি সহজেই টুকরো টুকরো হ'য়ে যায়) স্থানচ্যুত হ'য়ে রক্তস্রোতের সংঙ্গে মিশে যায় এবং দেহের অন্য অংশে বাহিত হ'য়ে দৃঢ়মূল হবার পর বৃদ্ধিলাভ করতে শুরু করে।

ক্যান্সার কলা ধ্বংসের জন্য তেজসমন্বিত বিকীরণের ব্যবহারেও অসুবিধা আছে। ঐতিহ্যময় এক্স-রে এবং রেডিয়ামের সংগে বর্তমানে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার, নতুন অস্ত্ররূপে প্রচলিত হয়েছে। 'কোবাল্ট-৬০' শেষোক্তটির অন্যতম, যার উচ্চ তেজের গামা রশ্মি রেডিয়ামের তুলনায় কম ব্যয়সাধ্য; অপর একটি হচ্ছে তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের দ্রবণ (পারমাণবিক ককটেল, atomic cocktail), যে বস্তুটি থাইরয়েড (thyroid) গ্রন্থিতে জমা হ'য়ে থাইরয়েড ক্যান্সারকে আক্রমণ করে। কিন্তু দেহের তেজস্ক্রিয়ার সহ্য ক্ষমতা সীমিত হওয়ায় ক্যান্সার রোধের চেয়ে আক্রমণের আশংকা সর্বদাই বেশি থাকে।

এখনও শল্যচিকিৎসা এবং বিকীরণই আমাদের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার, যার দ্বারা বহু প্রাণ পরিত্রাণ পেয়েছে এবং অন্ততঃ পরমায়ু দীর্ঘতর হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত না জীববিদ্যাবিদ্গণ অন্বিষ্ট "ম্যাজিকগুলির" সন্ধান পান, যা সাধারণ মনুষ্যকোষের কোনো ক্ষতি না ক'রে ক্যান্সার কোষগুলি খুঁজে বার করে—হয়

সেগুলি ধ্বংস করবে, না হয় তাদের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন বন্ধ করবে—ততদিন উপরোক্ত উপায় দু'টিই ক্যান্সারের বিরুদ্ধে মানুষের প্রধান সহায় থাকবে।

দু'টি প্রধান পথ ধরে বহু গবেষণা কার্য চলছে। একটি হচ্ছে, কোষ বিভাজন সম্বন্ধে সম্ভাব্য সকল কথা জানা এবং অপরটি স্বাভাবিক কোষ এবং ক্যান্সার আক্রান্ত কোষের চূড়ান্ত পার্থক্য আবিষ্কারের আশায় কোষ কি ভাবে বিপাক ক্রিয়া চালায় তার অনুসন্ধান। পার্থক্য অবশ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত সে পার্থক্যের স্বরূপ অতি সামান্য পর্যায়ের।

তা ছাড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সুপ্রচুর রাসয়নিক পদার্থের বাছাই কার্যও চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ক্যান্সার কোষগুলির ধ্বংসসাধনে তেজস্ক্রিয়তার অনুকৃতির ফলে কিছুকালের জন্য নাইট্রোজেন মাস্টার্ড সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়া গিয়েছিল। এই ধরনের কিছু কিছু ওষুধ অবশ্য কয়েক ধরনের ক্যান্সারের আক্রমণে কিছু পরিমাণ সাহায্য করে বলে অনুমিত হয়, অন্ততঃ পরমায়ু দীর্ঘতর করে, কিন্তু স্পষ্টতঃই সেগুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

নিউক্লিক এ্যাসিডগুলিতেই ভবিষ্যতের আশা অধিকতর পরিমাণে ন্যস্ত। স্বাভাবিক এবং ক্যান্সার আক্রান্ত কোষের নিউক্লিক এ্যাসিডগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু পার্থক্য থাকবে। সুতরাং বর্তমান লক্ষ্য এই যে, এমন একটা কিছু উপায় নির্ধারণ করা, যা একটির রাসায়নিক কার্যাবলীতে বাধা প্রদান করলেও অপরটির কাজ অবাধ থাকবে। অথবা হয়ত বিপর্যস্ত ক্যান্সার কোষগুলি স্বাভাবিক কোষের তুলনায় নিউক্লিক এ্যাসিডগুলি উৎপাদনে কম পারদর্শী। যদি তাই হয় তাহলে অধিকতর পারদর্শী কোষগুলির মারাত্মক ক্ষতি না করেও কম পারদর্শী ক্যান্সার কোষগুলির কর্মযন্ত্র হয়ত বিকল করা সম্ভব হবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, নিউক্লিক এ্যাসিড উৎপাদনে অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি পদার্থ হচ্ছে "ফোলিক এ্যাসিড'। পিউরিন এবং পিরিমিডিনগুলি উৎপাদনে নিউক্লিক এসিডের কাঠামোর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এখন ফোলিক এ্যাসিডের আকৃতিবিশিষ্ট কোনো যৌগ হয়ত প্রতিযোগিতামূলক বাধের (competitive inhibition) সাহায্যে ক্যান্সার কোষগুলিতে নিউক্লিক এ্যাসিড উৎপাদন ব্যাহত করতে পারে কিন্তু স্বাভাবিক কোষগুলিতে যথেষ্ট উৎপাদন অব্যাহত থাকবে এবং অবশ্যই নিউক্লিক এ্যাসিড ব্যতিরেকে ক্যান্সার কোষগুলির বিভাজন সম্ভব হবে না। বস্তুতঃই এই ধরনের "ফোলিক এ্যাসিড বিরোধীর" (folic-acid

antagonists) অস্তিত্ব রয়েছে। সেগুলির অন্যতম "এ্যামিথোপটেরিন্" (amethopterin) লিউকেমিয়ার বিরুদ্ধে কিছুটা কার্যকরী।

এ ছাড়াও প্রত্যক্ষতর আক্রমণের উপায়ও রয়েছে। পিউরিন এবং পিরিমিডিনগুলির প্রতিযোগী পদার্থ সরাসরি সূচীপ্রয়োগে কি হয়? সবচেয়ে আশাপ্রদ যৌগটি হচ্ছে "৬-মারক্যাপটোপিউরিন্" (6-mercaptopurine)। যৌগটি ঠিক এ্যাডিনিনের মতোই, তফাৎ এই যে, এ্যাডিনিনের NH_2 গুচ্ছের স্থলে এই বস্তুটিতে রয়েছে —SH গুচ্ছ।

পৃথিবীব্যাপী গবেষণার মাধ্যমে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে আক্রমণ—অন্যান্য জীববৈজ্ঞানিক গবেষণার তুলনায় অনেক বেশি তীক্ষ্ণ ও ধীসম্পন্ন এবং প্রভূত অর্থ এই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়। তবুও এই রোগের নিরাময় সহজলভ্য নয়, কারণ ক্যান্সার রোগের রহস্য জীবনের রহস্যের মতোই সূক্ষ্ম।

চতুৰ্দ্দশ অধ্যায়

দেহ

॥ খাদ্য ॥

সুন্দর স্বাস্থ্য যে সরল ও সুষম খাদ্যের (balanced diet) উপর নির্ভরশীল চিকিৎসকগণ কর্তৃক এই তথ্যের স্বীকৃতিই সম্ভবতঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম মহান পদক্ষেপ। গ্রীক দার্শনিকগণ যে খাদ্য ও পানীয়ের ব্যাপারে সংযমের উপদেশ দিতেন তা শুধু দার্শনিক কারণেই নয় পরন্তু যারা এই উপদেশ মেনে চলত তারা স্বাচ্ছন্দ্যময় দীর্ঘ জীবন লাভ করত। এই ভাবে শুরু অবশ্য ভালোই হয়েছিল, কিন্তু কালক্রমে জীববিদ্যাবিদ্‌গণ উপলব্ধি করলেন, শুধু মাত্র সংযমই যথেষ্ঠ নয়। যদিও কোনো লোকের কম না খাবার সৌভাগ্য হয়, অথবা অত্যধিক খাওয়া বর্জনের সুবুদ্ধি থেকেও থাকে তথাপিও তার স্বাস্থ্য ভালো চলবে না, যদি তার খাদ্যে কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় পদার্থের অভাব থাকে,—যা বাস্তবিকই পৃথিবীর কোনো কোনো অংশে বিপুল সংখ্যক লোকের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে।

প্রয়োজনীয় খাদ্যের ব্যাপারে মানব-দেহ বিশেষত্ব সমন্বিত (অন্যান্য জীবের তুলনায়)। উদ্ভিদ মাত্র কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জল এবং কোনো কোনো অজৈব আয়নিত পদার্থের সাহায্যেই প্রাণ ধারণ করতে পারে। কোনো কোনো জীবাণু একইভাবে জৈব খাদ্য ব্যতিরেকেই ভালোভাবেই জীবন ধারণ করতে পারে, তাদের বলা হয় "অটোট্রফিক" (autotrophic) বা "স্বয়ং বৃদ্ধি লাভকারী" (self-growing) যার অর্থ, যে-প্রতিবেশে অন্য জীবিত বস্তুর অস্তিত্ব নেই সেখানেও এইগুলি বৃদ্ধি লাভ করতে পারে। পাঁউরুটি জাত ছত্রাক নিউরোস্পোরা (Neurospora) থেকে সামান্য অবস্থার শুরু অজৈব পদার্থ ছাড়াও এইগুলির শর্করা এবং ভাইটামিন বায়োটিন আবশ্যক হয় এবং জীব দেহ যত জটিল থেকে জটিলতর হয় ততই তারা জীবিত কলা গঠনে জৈব মূল বস্তুর (building blocks) প্রয়োজনে ক্রমশঃই খাদ্যের উপর নির্ভরশীল হয় বলে অনুমিত হয়। তার কারণ, আদিম ধরনের

জীবে উপস্থিত এমন কতকগুলি উৎসেচকের অভাব উচ্চতর জীবে ঘটে থাকে। সবুজ উদ্ভিদে অজৈব পদার্থসমূহ থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত এ্যামিনো এ্যাসিডসমূহ, স্নেহ জাতীয় পদার্থসমূহ (fats), এবং শর্করা জাতীয় পদার্থসমূহ (carbohydrates) উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উৎসেচকগুলি বর্তমান। মানবদেহে আমরা বহু এ্যামিনো এ্যাসিড, ভাইটামিনসমূহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহের উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উৎসেচকের অভাব দেখতে পাই, যেগুলি খাদ্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় বর্তমান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

এই ব্যাপারটি এক ধরনের আপজাত্য বলে মনে হতে পারে—প্রতিবেশের উপর বর্ধমান নির্ভরশীলতা জীবকে অসুবিধায় ফেলে। কিন্তু তা ঠিক নয়। যদি পরিবেশের মাধ্যমে সাংগঠনিক মূল বস্তু লভ্য হয় তবে বিস্তৃত উৎসেচক সংক্রান্ত যন্ত্রাদি দেহে বহন করে লাভ কি? এই যন্ত্র ত্যাগ করার ফলে কোষে যে স্থান ও শক্তির উদ্বৃত্ত হয় তা অন্য সূক্ষ্ম ও বিশেষ ব্যবহারে নিয়োজিত করা চলে।

ইংরেজ চিকিৎসক উইলিয়ম প্রাউটই (সেই একই প্রাউট, যিনি সমস্ত মৌলগুলি হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত—এই তত্ত্বের প্রবক্তা হিসাবে নিজ কাল অপেক্ষা এক শতাব্দী অগ্রগামী ছিলেন) প্রথম ইংগিত দেন যে, জৈব খাদ্যগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে, পরবর্তীকালে যেগুলির নাম হয়—কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এবং ফ্যাটস্ (শর্করা জাতীয় পদার্থ, আমিষ জাতীয় পদার্থ এবং স্নেহ জাতীয় পদার্থ)।

উনবিংশ শতাব্দীর রসায়নবিদ্ ও জীববিজ্ঞানবিদ্গণ এবং উল্লেখযোগ্যভাবে জার্মানীর জাস্টস্ ফন্ লিবিগ্ ক্রমশঃ এই সব খাদ্যের পুষ্টিগত গুণাগুণ নির্ধারণ করেন। তাঁরা আবিষ্কার করেন যে, প্রোটিন অপরিহার্য এবং প্রাণী মাত্রই এই বস্তুর সাহায্যেই প্রাণ ধারণ করতে পারে। দেহে কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ পদার্থ থেকে প্রোটিন উৎপাদন সম্ভব নয়, কারণ উপরোক্ত বস্তুগুলিতে নাইট্রোজেন নেই, কিন্তু প্রোটিন কর্তৃক সরবরাহকৃত বস্তু থেকে প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ পদার্থ উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু যেহেতু পরিবেশে প্রোটিনের সরবরাহ কম সেইহেতু শুধু মাত্র প্রোটিন খাদ্যে প্রাণ ধারণ করা অপচয়জনক—ব্যাপারটা যেন জ্বালানীর যোগান থাকা সত্ত্বেও ঘরের আসবাবপত্র পুড়িয়ে আগুন জ্বালাবার মতো।

অনুকূল পরিবেশে মানব-দেহে দৈনিক প্রোটিনের প্রয়োজন আশ্চর্যজনক ভাবে কম। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার 'জাতীয় গবেষণা পরিষদে'র খাদ্য ও পুষ্টি পর্ষদ পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির জন্য নিম্নতম প্রয়োজন হিসাবে দৈনিক প্রতি কিলোগ্রাম দৈহিক ওজনের জন্য এক গ্রাম প্রোটিন খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করেছে, অর্থাৎ সাধারণ পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক মাত্র দু' আউন্স প্রোটিন প্রয়োজন। প্রায় দু' কোয়ার্ট দুধেই উপরোক্ত প্রয়োজন মিটতে পারে। শিশু, গর্ভিনী এবং স্তন্যদানকারী মাতার প্রোটিনের প্রয়োজন সামান্য কিছু বেশি।

অবশ্য সব কিছু নির্ভর করে কি জাতীয় প্রোটিন নির্বাচিত হয় তার উপর। উনবিংশ শতাব্দীর গবেষকগণ দুর্ভিক্ষকালে জিলেটিনের সাহায্যে মানুষ প্রাণ ধারণ করতে পারে কি না তা নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। জিলেটিন এমন একটি প্রোটিন, যা তাপ সাহায্যে হাড় এবং প্রাণী দেহের অন্যান্য অভক্ষ্য অংশ থেকে উৎপাদিত। কিন্তু ফরাসী শারীরবৃত্তবিদ্ ফ্রাঁসোয়া মেজেন্দি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, শুধু মাত্র জিলেটিনকে একমাত্র প্রোটিন হিসাবে ব্যবহারের ফলে কুকুরের দেহের ওজন হ্রাস পায় এবং তার মৃত্যু হয়। এই ব্যাপারের অর্থ এই নয় যে, খাদ্য হিসাবে জিলেটিন অচল, সংক্ষেপে এর অর্থ—একমাত্র প্রোটিন খাদ্য হিসাবে জিলেটিন থেকে সমস্ত সাংগঠনিক মূল বস্তুর সরবরাহ লাভ করা যায় না। প্রোটিনের উপযোগিতার মূল কথা হচ্ছে এই যে, দেহ প্রোটিনের সরবরাহকৃত নাইট্রোজেনকে কত সহজে ব্যবহার করতে পারে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কৃষিবিদ্ জন্ বেনেট লয়েস এবং জোসেফ হেনরা গিলবার্ট শূকরদের দুই জাতের প্রোটিন খাদ্য দেন—মসুর জাতীয় খাদ্য এবং বার্লি জাতীয় খাদ্য। তাঁরা আবিষ্কার করেন যে, শূকরেরা মসুর অপেক্ষা বার্লির নাইট্রোজেন বেশি মাত্রায় গ্রহণে সক্ষম। এই পরীক্ষাই সর্ব প্রথম "সুষম নাইট্রোজেনের" (Nitrogen balance) পরীক্ষা।

বৃদ্ধিশীল জীব, গৃহীত খাদ্য থেকে ক্রমশঃ নাইট্রোজেন সঞ্চিত করে (পজিটিভ নাইট্রোজেন ব্যালান্স—positive nitrogen balance)। উপবাস, ক্ষয়কারক রোগ অথবা কেবলমাত্র জিলেটিনকে প্রোটিন হিসাবে ব্যবহারের ফলে দেহ সুষম নাইট্রোজেনের দৃষ্টিকোণে ক্ষয়িত হতে থাকে। এই অবস্থাকে বলা হয় নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালান্স negative nitrogen balance) এই অবস্থায় গৃহীত নাইট্রোজেনের তুলনায় ক্ষয়ের হার বেশি, তা সে যত জিলেটিনই গ্রহণ করা হোক না কেন।

কেন এমন হয়? উনবিংশ শতাব্দীর রসায়নবিদ্‌রা অবশেষে আবিষ্কার করেন যে, প্রোটিন হিসাবে জিলেটিন অতীব সরল। অধিকাংশ প্রোটিনে উপস্থিত ট্রিপ্‌টোফ্যান্‌ (tryptophan) এবং অন্যান্য এ্যামিনো এ্যাসিড-সমূহ জিলেটিনে অনুপস্থিত। এই সব মূল সাংগঠনিক বস্তু ব্যতিরেকে দেহ নিজ পদার্থের উপযোগী প্রোটিন গঠন করতে সমর্থ হয় না। অতএব খাদ্যে অন্যান্য প্রোটিন না পেলে জিলেটিন থেকে প্রাপ্ত এ্যামিনো এ্যাসিডসমূহ নিষ্ফল হওয়ায় সেগুলি রেচন-ক্রিয়ার সাহায্যে বিদূরিত হয়। যেন ছুতোর কাজের সময় কাঠের যোগান পেলেও পেরেকের অভাব হল। তার ফলে কেবলমাত্র যে কাজই হবে না তা নয়, অনাবশ্যক জঞ্জালবোধে কাঠগুলো অপসারণের প্রয়োজনও হয়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জিলেটিনে যে সব এ্যামিনো এ্যাসিডের অভাব সেইগুলি যোগ করে বস্তুটিকে খাদ্য হিসাবে উৎকৃষ্টতর করার চেষ্টা হলেও তা বিফল হয়। জিলেটিনের মতো চূড়ান্তভাবে সীমিত নয় এমন অন্যান্য প্রোটিনের ক্ষেত্রে অবশ্য কিছুটা সুফল লাভ হয়েছে।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ প্রাণরসায়নবিদ্‌ ফ্রেডারিক গাউল্যাণ্ড হপকিন্স এবং ই. জি. উইলকক্‌ শস্যে আবিষ্কৃত "জাইন্‌" (zein) নামক প্রোটিনের খাদ্য মাত্র ইঁদুরকে দান করেন। তাঁরা জানতেন যে, এই প্রোটিনে ট্রিপ্‌টোফ্যান নামক এ্যামিনো এ্যাসিড অতি স্বল্প মাত্রায় বর্তমান। চৌদ্দ দিনের ভিতর ইঁদুরটির মৃত্যু হয়। তারপর গবেষকগণ জাইনের সঙ্গে ট্রিপ্‌টোফ্যান ব্যবহার করেন। এইবার ইঁদুরের জীবনকাল দ্বিগুণতর হ'ল। এই প্রথম প্রমাণিত হ'ল যে, প্রোটিন নয়, এ্যামিনো এ্যাসিডই খাদ্যের অপরিহার্য অংশ। (যদিও ইঁদুরগুলির অকাল মৃত্যু অব্যাহত ছিল, তার কারণ বোধ হয় কতকগুলি ভাইটামিনের অভাব, যেগুলি সে সময় অজ্ঞাত ছিল)।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মাকিন পুষ্টিবিদ্যাবিদ উইলিয়াম সি. রোজ্‌ এ্যামিনো এ্যাসিড সমস্যাটির মূলে পৌছলেন। ইতিমধ্যে অতি প্রয়োজনীয় সমস্ত ভাইটামিনের আবিষ্কার হওয়ায় তিনি প্রাণীদের সমস্ত ভাইটামিন সরবরাহ অব্যাহত রেখে এ্যামিনো এ্যাসিডের উপর মনোযোগ অর্পণ করেন। রোজ প্রোটিনের বদলে এ্যামিনো এ্যাসিড সমূহের এক মিশ্রণ খাদ্য হিসাবে ইঁদুরকে দান করেন। এই খাদ্যে ইঁদুরগুলি দীর্ঘজীবী হ'ল না। কিন্তু দুগ্ধজাত প্রোটিন 'কেজিন'কে (Casein) খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের ফলে ইঁদুরের কোনোই ক্ষতি হ'ল না। আপাতদৃষ্টিতে কেজিনে এমন একটা

কিছু ছিল সম্ভবতঃ কোনো অনাবিষ্কৃত এ্যামিনো এ্যাসিড, যা রোজ্ ব্যবহৃত এ্যামিনো এ্যাসিড মিশ্রণে অনুপস্থিত ছিল। রোজ কেজিনকে বিভাজিত ক'রে তার নানা আণবিক অংশসমূহ তাঁর এ্যামিনো এ্যাসিড মিশ্রণে যোগ করেন। এইভাবে তিনি "থ্রিয়োনিন্" (threonine) নামক এ্যামিনো এ্যাসিডটি আবিষ্কার করেন—যেটি অনাবিষ্কৃত মুখ্য এ্যামিনো এ্যাসিডগুলির শেষতম। তাঁর এ্যামিনো এ্যাসিড মিশ্রণে থ্রিয়োনিন্ যোগ করলে খাদ্যে অভগ্ন প্রোটিনের অভাব সত্ত্বেও ইঁদুরগুলির বৃদ্ধি স্বাভাবিক রইল।

রোজ্ তারপর ইঁদুরগুলির খাদ্য-সূচী থেকে একের পর এক এ্যামিনো এ্যাসিডগুলি বাদ দিলেন। এইভাবে ইঁদুরের খাদ্যে তিনি দশটি অপরিহার্য এ্যামিনো এ্যাসিডের সন্ধান পেলেন। লাইসিন্, ট্রিপটোফ্যান্, হিস্টিডিন ফিনাইল অ্যালানিন. লিউসিন্, আইসোলিউসিন্, থ্রিয়োনিন, মিথিওনিন, ভালিন্ এবং আরজিনিন্। উপরোক্ত দশটি এ্যামিনো এ্যাসিডের প্রচুর সরবরাহে ইঁদুরের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্যগুলি যেমন গ্লাইসিন্, প্রোলিন্ এ্যাস্পারটিক্ এ্যাসিড, এ্যালানিন ইত্যাদি উৎপাদন করা সম্ভব।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে রোজ্ মানুষের প্রয়োজনীয় এ্যামিনো এ্যাসিডগুলির প্রতি মনোযোগ অর্পণ করেন। তিনি স্নাতকের ছাত্রদের নিয়ন্ত্রিত খাদ্য গ্রহণে রাজী করান, যে-খাদ্যে এ্যামিনো এ্যাসিডের এক মিশ্রণকে নাইট্রোজেনের একমাত্র উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঘোষণা করতে সমর্থ হন যে, পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির খাদ্যে মাত্র আটটি এ্যামিনো এ্যাসিড প্রয়োজন—ফিনাইল অ্যালানিন লিউসিন্, আইসোলিউসিন্, মিথিওনিন্, ভ্যালিন্, লাইসিন্, ট্রিপটোফ্যান্ এবং থ্রিয়োনিন। যেহেতু আরজিনিন্ এবং হিস্টিডিন্ ইঁদুরের পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু মানুষের পক্ষে পরিহার্য, সেইহেতু অনুমিত হয় যে, এই বিষয়ে মানুষ, ইঁদুর এবং বস্তুতঃ বিশদভাবে পরীক্ষিত অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবের তুলনায় কম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

সাধারণতঃ কোনো ব্যক্তি খাদ্যে অপরিহার্য আটটি এ্যামিনো এ্যাসিডের সাহায্যে প্রাণ ধারণে সক্ষম—এইগুলির যথেষ্ট সরবরাহে তার পক্ষে অন্যান্য এ্যামিনো এ্যাসিডগুলিই শুধু নয়, কার্বোহাইড্রেটস্ এবং স্নেহ পদার্থের উৎপাদনও সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে শুধুমাত্র এ্যামিনো এ্যাসিডগুলি দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য—স্বাদ এবং একঘেয়েমির কথা বাদ দিলেও—খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় এ্যামিনো এ্যাসিডগুলি কি তা জানা বিশেষ

দরকার এই কারণে যে, নাইট্রোজেনের পুর্ণ সদ্ব্যবহারের প্রয়োজনে আমরা স্বাভাবিক প্রোটিনগুলিতে প্রয়োজনীয় এ্যামিনো এ্যাসিডগুলি দরকার মতো যোগ করতে পারি।

॥ ভাইটামিনসমূহ ॥

দুর্ভাগ্যক্রমে খাদ্যে বাতিক এবং কুসংস্কার আজও বহু লোককে ভ্রান্ত করে এবং আজকের জ্ঞানালোকসম্পন্ন যুগেও সর্বাধিক বিক্রীত সর্বরোগহর ওষুধের জন্ম দেয়। অবশ্যই কতকগুলি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট রোগ আরোগ্য হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই অপুষ্টিজনিত ব্যাধিগুলি (deficiency disease)—বিশেষ রোগ, যা স্বাভাবিক সুষম খাদ্যের অভাবে মানুষে দেখা দেয়।

প্রাচীনকালে স্কার্ভি রোগের কথা জানা ছিল—যে রোগে কৈশিকগুলি উত্তরোত্তর ভংগুর হয়, মাড়ি থেকে রক্তপাত হয়, দাঁত আল্‌গা হয়ে পড়ে, দুরারোগ্য ক্ষত সহজে নিরাময় হয় না এবং রোগী ক্রমশঃই দুর্বল হয়ে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিশেষ করে অবরুদ্ধ শহরে এবং দূর সমুদ্র যাত্রায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যেত। (ম্যাগেলানের নাবিকগণ সাধারণ অপুষ্টির চেয়ে স্কার্ভি রোগেই বেশি আক্রান্ত হয়)। হিমায়নের ব্যবস্থাহীন দূর সমুদ্র যাত্রায় তখন এমন খাদ্য বহন করা হত, যা সহজে নষ্ট হয় না—যেমন বিস্কুট এবং লবণ মাখানো শূকর মাংস। যাইহোক, বহু শতাব্দী ধরে চিকিৎসকগণ খাদ্যের সংগে স্কার্ভির যোগাযোগ আবিষ্কারে সক্ষম হননি।

১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশ-আবিষ্কারক জ্যাকুয়েস্‌ কর্টিয়ার যখন ক্যানাডায় শীতকাল যাপন করছিলেন তাঁর দলের ১১০ জন স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হয়। স্থানীয় অধিবাসীগণ এই রোগের প্রতিকার জানত এবং ফরাসীদের পাইন পাতা ভেজানো জল পান করিতে বলে। কার্টিয়ারের লোকজন চূড়ান্ত হতাশায় এই শিশুসুলভ প্রতিকারের শরণ নেয়। তার ফলে তাদের স্কার্ভি রোগ নিরময় হয়।

দুই শতাব্দীর পরে স্কটল্যাণ্ড দেশীয় চিকিৎসক জেমস্‌ লিণ্ড এই জাতীয় কতকগুলি ঘটনা লক্ষ্য ক'রে রোগ নিরাময়ের জন্য তাজা ফলমূল এবং তরিতরকারিকে ব্যবহার ক'রে পরীক্ষা করেন। স্কার্ভি পীড়িত নাবিকদের

ওপর এই নিরাময় পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে তিনি আবিষ্কার করেন যে, লেবু অথবা কমলালেবুর ব্যবহারে আরোগ্য সব থেকে তরান্বিত হয়। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বৃটিশ নৌবাহিনীর কর্তাব্যক্তিরা লিণ্ডের পরীক্ষায় যথেষ্ট সন্তুষ্ট হওয়ার ফলে (এবং স্কার্ভি পীড়িত নৌবহর বিনা যুদ্ধে নৌসংঘাতে হেরে যাবার সম্ভাবনায়) বৃটিশ নাবিকদের দৈনিক খাদ্য তালিকায় লেবুর রসের ব্যবস্থা করেন। (সেই থেকে বৃটিশ নাবিকদের নামকরণ হয়েছে 'লিমিস্' (limeys) এবং লণ্ডনে টেমস্ নদীর যে অঞ্চলে কাঠের বাক্সে লেবু গুদামজাত থাকত তাকে এখনও বলা হয় "লাইম্ হাউস্" (lime-house)। লেবুর রসের কল্যাণে বৃটিশ নৌবাহিনী থেকে স্কার্ভি বিদায় নিল।

খাদ্য দ্বারা এই সব সাময়িক বিজয় সত্ত্বেও (কেউই যার কারণ ব্যাখ্যায় সক্ষম ছিল না) উনবিংশ শতাব্দীর জীববিদ্যাবিদগণ বিশ্বাস করতে রাজী হলেন না যে, খাদ্য দ্বারা রোগ জয় সম্ভব, বিশেষ ক'রে পাস্তুরের বীজাণু তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পর সে ধারণা বদ্ধমূল হ'ল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অবশ্য হল্যাণ্ডবাসী চিকিৎসক ক্রিশ্চিয়ান আইকম্যান্ তাঁদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করলেন।

আইকম্যানকে ডাচ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে "বেরিবেরি" সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য পাঠানো হয়েছিল—রোগটি এই অঞ্চলে স্থানীয় (endemic)। যদি রোগটি জীবাণুবহিত হয়, সেই সন্দেহে জীবাণু আবিষ্কারের জন্য তিনি কয়েকটি মুরগী শাবককে গবেষণার কার্যে সঙ্গে নিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এক অভাবিত ঘটনায় তাঁর পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হ'ল। কোনো রকম পূর্বাভাস না দিয়ে তাঁর মুরগী শাবকগুলি এক ধরনের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হ'ল—কিছু মরল আর যেগুলো বাঁচল চার মাস পরে তাদের স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হ'ল। আইকম্যান্ এই আক্রমণের জন্য দায়ী কোনো রকম জীবাণুর সন্ধান না পেয়ে সংশয়ান্বিত হয়ে অবশেষে শাবকগুলির খাদ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন যে, যে ব্যক্তিকে পূর্বে শাবকগুলির আহার্যের ভার দেওয়া হয়েছিল সে খরচ বাঁচাবার জন্য (এবং নিঃসন্দেহে কিছু নিজস্ব লাভের জন্যও) সামরিক হাসপাতালের ফেলে দেওয়া খাদ্য, যা বেশির ভাগ ছিল কলে ছাঁটাই করা চাল তাই ব্যবহার করত। কয়েক মাস পরে একজন নতুন পাচক এসে মুরগীদের খাদ্যের ভার নেয়; সে উপরোক্ত খাদ্য বন্ধ ক'রে শাবকগুলিকে মুরগীদের স্বাভাবিক খাদ্য আ-ছাঁটা চাল সরবরাহ করত। তার ফলেই মুরগী শাবকগুলি সুস্থ হয়ে ওঠে।

আইকম্যান্ পরীক্ষা শুরু করলেন। তিনি মুরগীদের কলে ছাঁটা চাল খেতে দিলেন, তার ফলে সেগুলি অসুস্থ হয়ে পড়ল। আবার আছাঁটা চাল খেতে দেওয়ায় সেগুলি সুস্থ হয়ে উঠল। এই ঘটনাই সর্বপ্রথম চেষ্টাকৃত খাদ্য অপ্রতুলতায় রোগ সৃষ্টি করা। আইকম্যান্ স্থির করলেন যে, "পলিনিউরাইটিস্" (Polyneuritis), আক্রান্ত মুরগীদের রোগ লক্ষণ, বেরিবেরি আক্রান্ত মানুষের মতোই। তবে কি কলে-ছাঁটা চাল খাবার ফলেই মানুষের বেরিবেরি রোগ হয়?

মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য চালের তুঁষ ছাড়িয়ে ফেলা হয়, যার ফলে চাল ভালো থাকে, কারণ তুঁষের সঙ্গে চালের যে অংশ বাদ যায় তাতে যে তেল থাকে তা সহজেই নষ্ট হয়। আইকম্যান্ এবং তাঁর সহকর্মী জি, গ্রিন্স্ চালের তুঁষের যে জিনিস বেরিবেরি আক্রমণ রোধ করে তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন। তাঁরা সেই বিশেষ বস্তুটিকে তুঁষ থেকে বিশ্লিষ্ট ক'রে জলে দ্রবীভূত করতে সমর্থ হন এবং আবিষ্কার করেন যে, বস্তুটি এমন ঝিল্লীর মধ্য দিয়ে গলে যেতে সক্ষম, যা প্রোটিনকে আটকে রাখে। স্পষ্টত:ই বস্তুটি খুবই ক্ষুদ্র অণু। তাঁরা অবশ্য বস্তুটির রাসায়নিক পরিগঠন আবিষ্কারে সমর্থ হননি।

ইতিমধ্যে অন্যান্য গবেষকগণও জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য রহস্যময় বস্তুর সন্ধান পাচ্ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাচ পুষ্টিবিদ্যাবিদ্ সি. এ. পেকেলহারিং আবিষ্কার করেন যে, প্রভূত ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন সমন্বিত কৃত্রিম খাদ্য গ্রহণেও পরীক্ষাকার্যে ব্যবহৃত ইঁদুরগুলি একমাসের মধ্যে মারা যাচ্ছে। কিন্তু সেই খাদ্যে কয়েক ফোঁটা দুধ মেশালে ইঁদুরের স্বাস্থ্য ভালোই থাকছিল। ইংল্যাণ্ডে প্রাণ-রসায়নবিদ ফ্রেডেরিক হপ্‌কিন্স, যিনি খাদ্যে এ্যামিনো এ্যাসিডসমূহের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছিলেন, তিনিও কয়েকটি গবেষণায় প্রমাণ করেন যে, দুধের কেজিনে এমন একটা কিছু পদার্থ আছে, যা কৃত্রিম খাদ্যে যোগ করলে দেহবৃদ্ধির সহায়ক হয়। এই রহস্যময় পদার্থটি জলে দ্রবনীয়। স্বল্প পরিমাণ ইস্টের নির্যাস, খাদ্যের অনুপূরক হিসাবে কেজিনের চেয়েও কার্যকরী।

খাদ্যে সামান্য পরিমাণে উপস্থিত নানা পদার্থসমূহ যে জীবনের পক্ষে অপরিহার্য, সে সম্বন্ধে পথপ্রদর্শক গবেষণাকার্যের জন্য ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আইকম্যান ও হপকিন্স একত্রে ভেষজতত্ত্ব ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

পরবর্তী কাজ হ'ল খাদ্যের এই সব জীবনের পক্ষে অপরিহার্য স্বল্প উপাদান-সমূহ (vital trace factors) স্বতন্ত্র করা। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ জাপানী প্রাণরসায়নবিদ্ ইউ. সুজুকি. টি. শিমামুরা এবং এস্. ওহ্‌ডাকি চালের তুঁষ থেকে একটি যৌগিক পদার্থ নিষ্কাষিত করেন, যা বেরিবেরির বিরুদ্ধে সংগ্রামে খুবই কার্যকরী। সেই বস্তু পাঁচ থেকে দশ মিলিগ্রাম মাত্রায় মুরগী শাবকের বেরিবেরি আরোগ্যের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল। সেই বছরই পোলিশ-বংশজ প্রাণ রসায়নবিদ্ ক্যাসিমির ফাঙ্ক (তৎকালে ইংল্যাণ্ডে গবেষণাকারী এবং পরে যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন) খামির (yeast) থেকে একই যৌগ প্রস্তুত করেন।

যেহেতু যৌগটি অ্যামিন (অ্যামিন-গুচ্ছ (NH_2) সমন্বিত যৌগ) সেই হেতু ফাঙ্ক এইগুলির নামকরণ করেন "ভাইটামিন" (Vitamine), যার ল্যাটিন শব্দগত অর্থ প্রাণ-অ্যামিন। তিনি অনুমান করেন যে, বেরিবেরি, স্কার্ভি, পেলাগ্রা (Pellagra) এবং রিকেট (Ricket) প্রভৃতি সব রোগেরই মূল "ভাইটামিনের" স্বল্পতা। এই সকল রোগের উৎপত্তি যে খাদ্যগত স্বল্পতা এইটুকু ব্যাপারেই শুধু ফাঙ্কের অনুমান সত্য। কিন্তু পরে প্রকাশ পেল সমস্ত "ভাইটামিনই" "অ্যামিন" নয়।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে দু'জন মার্কিন প্রাণ-রসায়নবিদ্ এল্‌মার ভারনন ম্যাক্‌কোলাম্ এবং এম্. ডেভিস্ মাখন এবং ডিমের কুসুমে স্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য আর একটি "স্বল্প উপাদান" আবিষ্কার করেন। এই বস্তুটি জলের বদলে স্নেহ জাতীয় পদার্থে দ্রবনীয়। ম্যাক্‌কোলাম্ "জলে দ্রবনীয় বি-র" সঙ্গে পার্থক্য ক'রে বস্তুটির নামকরণ করেন "স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবনীয় এ" (fat-soluble A)। প্রথমোক্ত নামটি বেরিবেরির বিরুদ্ধে কার্যকরী উপাদানটির নাম, যা তিনিই দিয়েছেন। এই সব উপাদানসমূহের রাসায়নিক তথ্যাদি অজ্ঞাত থাকায় এই নামগুলি যথার্থ বলেই অনুমিত হয় এবং বর্ণমালার সাহায্যে এগুলির নামকরণের প্রথা প্রবর্তিত হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ প্রাণ-রসায়নবিদ্ জে. সি. ড্রামণ্ড নাম দুটি পাল্‌টিয়ে রাখেন "ভাইটামিন-এ" ও "ভাইটামিন-বি" এবং "ভাইটামাইন্" শব্দের এ্যামাইন্ অংশটুকু বর্জনের চিহ্ন হিসাবে উক্ত ইংরেজী শব্দের (vitamine) শেষ e বর্ণ বর্জন করেন। এছাড়াও তিনি প্রচার করেন যে, স্কার্ভি প্রতিরোধ উপাদানটি ভিন্ন, তিনি তার নাম দেন "ভাইটামিন-সি"।

শীঘ্রই আবিষ্কৃত হয় যে খাদ্যের উপাদান হিসাবে "ভাইটামিন-এ" চক্ষুর চতুস্পার্শ্বস্থ ঝিল্লীর অস্বাভাবিক শুষ্কতা দূর করার জন্য প্রয়োজন, যে রোগের নাম "জেরোপ্থালমিয়া" (xeropthalmia)—গ্রীক শব্দগত অর্থ "শুষ্ক চক্ষু"। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্কোলাম্ এবং তাঁর সহযোগিবৃন্দ কড্-মাছের যকৃতের তেলে (cod-liver oil) একটি পদার্থের সন্ধান পান যা জেরোপ্থালমিয়া এবং রিকেট উভয় রোগেই কার্যকরী এবং এই বস্তুর নির্দিষ্ট ব্যবহারে শুধুমাত্র রিকেট সারানোও সম্ভব। তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে, রিকেট প্রতিরোধী বস্তুটি চতুর্থ ভাইটামিন এবং বস্তুটির নামকরণ করেন "ভাইটামিন-ডি"। ভাইটামিন 'ডি'ও এ স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবণীয় এবং 'সি' ও 'বি' জলে দ্রবণীয়।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এই তথ্য পরিষ্কার হ'ল যে, ভাইটামিন 'বি' একটি সরল পদার্থ নয় বরং বিভিন্ন গুণসম্পন্ন কয়েকটি যৌগের মিশ্রণ। খাদ্যের যে উপাদানে বেরি বেরি আরোগ্য হয় তার নাম ভাইটামিন 'বি'$_১$ (vitamin B_1) দ্বিতীয় উপাদানের নাম ভাইটামিন 'বি'$_২$ (vitamin B_2)। কতকগুলি নতুন উপাদানের বিবরণী অবশ্য যথার্থ নয় বলেই প্রমাণিত হ'ল, ফলে 'বি$_৩$' (B_3) 'বি$_৪$' (B_4)ও 'বি$_৫$' (B_5) নামগুলি আর শোনা যায় না। যাই হোক, ক্রমিক সংখ্যার উর্ধ্বগতি হয়ে 'বি-$_{১৪}$' অবধি পৌঁছল। এই ভাইটামিন শ্রেণীর সব কটিই (সব কটিই জলে দ্রবনীয়) একত্রে সাধারণতঃ বি-ভাইটামিন কম্প্লেক্স (B-vitamin complex) নামে অভিহিত হয়।

নতুন বর্ণও সংযোজিত হ'ল। তার মধ্যে ভাইটামিন 'ই' (E) এক ও 'কে' (K) (উভয়ই স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবণীয়) ভাইটামিন হিসাবে নির্দিষ্ট রইল, কিন্তু দেখা গেল, ভাইটামিন'এফ' ভাইটামিনই নয়, এবং ভাইটামিন 'এইচ' বি-কমপ্লেক্স ভাইটামিনগুলির অন্যতম।

আজকাল ভাইটামিনগুলির রাসায়নিক পরিগঠন আবিষ্কারের ফলে যথার্থ ভাইটামিনগুলিরও বর্ণমালায় নাম যদিও অবশ্য স্নেহ-জাতীয় পদার্থে দ্রবণীয় ভাইটামিনগুলির ক্ষেত্রে যে কোনো কারণেই হোক বর্ণ-সংযোজিত নামগুলি প্রচলিত রয়েছে।

যেহেতু ভাইটামিনগুলির অস্তিত্ব খুবই অল্প এইগুলির রাসায়নিক পরিগঠন নিধারণ করা সহজ ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, এক টন চালের তুঁষে মাত্র পাঁচ গ্রাম (এক-আউন্সের পাঁচ ভাগের এক ভাগের কিছু কম) ভাইটামিন 'বি$_১$' পাওয়া যায়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে কেউই রাসায়নিক বিশ্লেষণের উপযোগী

যুক্তিসংগতভাবে বিশুদ্ধ ভাইটামিন নিষ্কাষিত করতে পারেনি। দু'জন ডাচ প্রাণরসায়নবিদ্ বি. সি. পি. জানসেন এবং ডব্লিউ. পি. ডোনাথ সামান্য উপাদানের সাহায্যে ভাইটামিন 'বি'-র সংযুতি নির্ধারণ করেন, যা পরে ভুল প্রমাণিত হয়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী প্রাণরসায়নবিদ্ এস্. ওহ্‌ডাকি সামান্য পরিমাণ বেশী উপাদানের সাহায্যে পুনরায় চেষ্টা করেন এবং প্রায় যথার্থভাবে সংযুতি নির্ধারণ করেন। তিনিই প্রথম ভাইটামিন অণুতে একটি সাল্‌ফার পরমাণুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন।

অবশেষে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বেল-টেলিফোন গবেষণাগারের তৎকালীন রসায়নের অধ্যক্ষ রবার্ট আর উইলিয়ামস্ কঠিন আয়াসে বহু টন চালের তুঁষ হতে যথেষ্ট পরিমাণ ভাইটামিন 'বি' স্বতন্ত্র করেন, যার ফলে বস্তুটির পূর্ণ সাংগঠনিক সংকেত (structural formula) নির্ধারণ করা সম্ভব হ'ল এবং ২০ বৎসরব্যাপী গবেষণার সমাপ্তি হল। সংকেতটি নিম্নরূপ :

```
CH3        N       NH2  CH3      CH2 - CH2 - OH
   \    //  \     /      \      /
    C          C          C == C
    |          ||         |      \
    |          ||         |       S
    N          C          N(+)   /
     \\     /    \      /  \\   /
       CH          CH2       CH
```

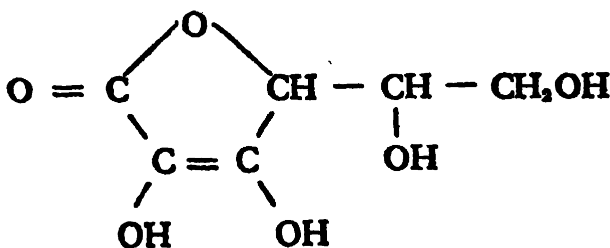
যেহেতু অণুটির অপ্রত্যাশিত উপাদান হচ্ছে সাল্‌ফার পরমাণু (theion গ্রীক ভাষায়) সেই হেতু ভাইটামিনটির নামকরণ হ'ল "থিয়ামিন" (thiamine)।

ভাইটামিন 'সি'র সমস্যা ছিল ভিন্ন। লেবুতে তুলনা মূলকভাবে ভাইটামিন 'সি'র প্রাচুর্য সত্ত্বেও সমস্যা হল পরীক্ষার জন্য এমন কোনো প্রাণীর—যা ভাইটামিনটি নিজ দেহে প্রস্তুত করে না। মানুষ এবং বানর জাতি ছাড়া অধিকাংশ স্তন্যপায়ী জীবই এই ভাইটামিন উৎপাদনের ক্ষমতা অব্যাহত রেখেছে। যাতে স্কার্ভির আক্রমণ ঘটানো যায় এমন সস্তা এবং সরল ধরনের গবেষণার প্রাণী ছাড়াও রাসায়নিকভাবে বিশ্লিষ্ট লেবুর রসের বিভিন্ন অংশ-গুলিতে ভাইটামিন 'সি'র অবস্থিতি নির্ধারণ দুষ্কর ছিল।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান প্রাণরসায়নবিদ্ বি. কোহেন এবং এল্. বি. মেণ্ডেল এই সমস্যার সমাধানে আবিষ্কার করেন যে, গিনিপিগ এই ভাইটামিনটি উৎপাদনে সক্ষম নয় এবং এইভাবে সমস্যাটির সমাধান হ'ল। বস্তুতঃ, মানুষের

তুলনায় গিনিপিগে স্কার্ভির আক্রমণ আরও সহজেই হয়। কিন্তু অন্য একটি সমস্যা রয়ে গেল। দেখা গেল, ভাইটামিন 'সি' খুবই অস্থায়ী (unstable) (ভাইটামিনগুলির মধ্যে এইটিই সবচেয়ে অস্থায়ী) সুতরাং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বতন্ত্র করার কালে ভাইটামিনটি সহজেই নষ্ট হয়। বহু গবেষকই ঐকান্তিক নিষ্ঠায় এর ভাইটামিনের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে অকৃতকার্য হন।

বাস্তবে ঘটল এই যে, এমন এক ব্যক্তি, যিনি বস্তুটির সন্ধানে উৎসুক ছিলেন না, তিনিই অবশেষে ভাইটামিন 'সি' স্বতন্ত্র করতে সক্ষম হন। ১৯২৮ সালে হাংগেরীয় বংশজ প্রাণরসায়নবিদ্ এ্যালবার্ট জেনৎ-জর্জি লণ্ডনের হপ্‌কিন্স গবেষণাগারে গবেষণা করছিলেন এবং দেহের কলাগুলি কীভাবে অক্সিজেন ব্যবহার করে—সেই সম্বন্ধেই তিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন ; এই প্রসংগে তিনি বাঁধাকপি থেকে এমন একটি পদার্থ স্বতন্ত্র করেন, যা একটি যৌগ থেকে আর একটি যৌগে হাইড্রোজেন পরমাণু স্থানান্তরনে সাহায্য করে। কিছু কাল পরেই পিটস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের চার্ল্‌স্ গ্লেন কিং এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ যাঁরা ভাইটামিন 'সি'-রই অনুসন্ধান করছিলেন, বাঁধাকপি থেকে প্রাপ্ত বস্তুটি প্রস্তুত করেন এবং আবিষ্কার করেন যে, বস্তুটি স্কার্ভি রোগের প্রবল প্রতিরোধক। এ-ছাড়াও বস্তুটি লেবুর রসের কেলাসের অনুরূপ। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কিং বস্তুটির পরিগঠন নির্ধারণ করেন। দেখা গেল, বস্তুটি ছয় কার্বন বিশিষ্ট শর্করা-অণু, যেটি ডেক্সট্রো-র পরিবর্তে লিভো শ্রেণীভুক্ত।

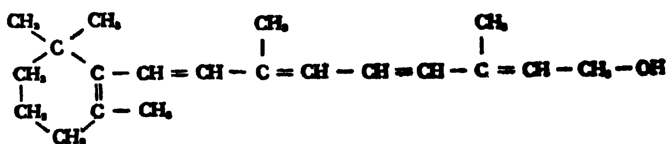


বস্তুটির নামকরণ করা হ'ল এ্যাসকরবিক এ্যাসিড (গ্রীক শব্দগত অর্থ "স্কার্ভিহীন")।

ভাইটামিন 'এ'-র ব্যাপারে বস্তুটির পরিগঠন সম্বন্ধে প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া গেল ভাইটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাদ্য পর্যবেক্ষণের ফলে, যেগুলি প্রায়শঃই হল্‌দে অথবা কমলা রঙের (মাখন, ডিমের কুসুম, গাজর, মাছের যকৃতের তেল প্রভৃতি) হয়।

এই রঙের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী বস্তুটি দেখা গেল ক্যারোটিন (carotene) নামে এক হাইড্রোকার্বন এবং ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ প্রাণরসায়নবিদ্ টি. মুর প্রমাণ করেন যে, ইঁদুরদের ক্যারোটিন সমন্বিত খাবার খাওয়ালে, যকৃতে ভাইটামিন 'এ' সঞ্চিত হয়। হল্‌দে রঙ ভাইটামিনটির নিজস্ব নয়, সুতরাং সিদ্ধান্ত করা হ'ল যে, ক্যারোটিনই ভাইটামিন 'এ' নয়, যকৃতে বস্তুটি এমন এক পদার্থে পরিবর্তিত হয় যা ভাইটামিন 'এ'। (বর্তমানে ক্যারোটিনকে 'প্রোভাইটামিনের (provitamin) উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা হয়)।

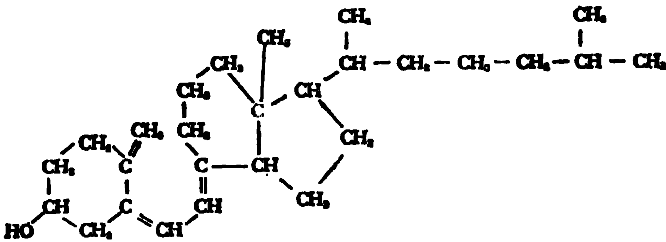
১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান রসায়নবিদ এইচ. এন. হোম্‌স্ এবং আর. ই. করবেট মাছের যকৃতের তেল থেকে ভাইটামিন-'এ' কেলাসিত অবস্থায় পৃথক করেন। দেখা গেল, বস্তুটি ২০টি কার্বন সমন্বিত যৌগ, যাতে, ক্যারোটিন অণুর অর্ধেকের সঙ্গে হাইড্রক্সিল (OH) শ্রেণীযুক্ত :



ভাইটামিন 'ই' অনুসন্ধানকারী বৈজ্ঞানিকগণ তার রাসায়নিক গঠনের শ্রেষ্ঠ ইংগিতটি পেলেন সূর্যালোকের মাধ্যমে। পূর্বে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্‌কোলান্ গোষ্ঠী (যাঁরা প্রথম ভাইটামিনটির অস্তিত্ব সপ্রমাণ করেন) প্রমাণ করেন যে, খাদ্যে ভাইটামিন 'ডি'-র অভাব সত্ত্বেও যে-সব ইঁদুরকে সূর্যালোকে রাখা হয় তাদের রিকেট রোগের আক্রমণ হয় না। প্রাণরসায়নবিদ্‌গণ অনুমান করলেন যে, সূর্যালোক দেহস্থ প্রোভাইটামিনকে, ভাইটামিন 'ডি'-তে পরিবর্তিত করে। যেহেতু ভাইটামিন 'ডি' স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবণীয়, তাঁরা খাদ্যের স্নেহজাতীয় পদার্থে প্রোভাইটামিনটির সন্ধান শুরু করলেন।

স্নেহজাতীয় পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করে অংশগুলির প্রত্যেকটি আলাদাভাবে সূর্যালোকে রেখে তাঁরা নির্ধারণ করলেন যে, যে প্রোভাইটামিনটি সূর্যালোকে ভাইটামিন 'ডি'-তে পরিবর্তিত হয় তা একটি স্টেরয়েড (steroid)। কী ধরনের স্টেরয়েড? তাঁরা দেহস্থ অতি সাধারণ স্টেরয়েড কোলেস্টেরলকে (cholesterol) পরীক্ষা করলেন, কিন্তু সেটি প্রোভাইটামিন নয়। তারপর ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ প্রাণরসায়নবিদ্ ও. রোসেনহাইম্ এবং টি. এ. ওয়েবস্টার আবিষ্কার

করেন যে, সূর্যালোক "আরগোস্টেরল" (ergosterol) নামে কোলেস্টেরলের প্রায় সমধর্মী একটি স্টেরলকে, ভাইটামিন 'ডি'-তে পরিবর্তিত করে। একমাত্র সমস্যা হ'ল, প্রাণীদেহে আরগোস্টেরলের অস্তিত্ব নেই। কালক্রমে, দেহেও প্রোভাইটামিন রূপে '৭-ডিহাইড্রোকোলেস্টেরল (7-dehydrocholesterol) আবিষ্কৃত হ'ল, যার অণুতে কোলেস্টেরল অপেক্ষা দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু কম। এই বস্তুজাত ভাইটামিন 'ডি'-র সংকেত নিম্নরূপ :



ভাইটামিন 'ডি'র নানারূপের মধ্যে একটি রূপের নাম 'ক্যালসিফেরল' (calciferol), যার ল্যাটিন শব্দগত অর্থ 'ক্যালসিয়াম বাহক'—কারণ হাড় সংগঠনের গোড়া পত্তনে বস্তুটি অপরিহার্য।

সব ভাইটামিন স্বল্পতার বহিঃপ্রকাশই তীব্র রোগ আক্রমণ সূচনা করে না। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হারবার্ট ম্যাকলিয়ান ইভান্স্ এবং কে. জে. স্কট এইরূপ আভাস দেন যে, ভাইটামিন স্বল্পতা প্রাণীর বন্ধ্যাত্বর কারণ। ইভান্স্ এবং তাঁর সহকর্মীগণ ১৯৩৬ সালের আগে পর্যন্ত বস্তুটি অর্থাৎ ভাইটামিন 'ই' পৃথক করতে সক্ষম হননি। তখন বস্তুটির নামকরণ করা হয় 'টোকোফেরল' (tocopherol—গ্রীক শব্দগত অর্থ 'সন্তান ধারণ করা')।

দুর্ভাগ্যক্রমে ভাইটামিন 'ই' মানুষের প্রয়োজন কি না অথবা কতটা প্রয়োজন তা আজও জানা যায়নি। স্পষ্টতঃই বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টির জন্য খাদ্য বিষয়ক পরীক্ষা মানুষের উপর করা সম্ভব নয়। এমন কি প্রাণীর ক্ষেত্রেও যদি ভাইটামিন 'ই'-র সরবরাহ বন্ধ ক'রে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি সম্ভব হয় তা থেকেই প্রমাণিত হয় না যে, স্বাভাবিক বন্ধ্যাত্বের কারণও এই ভাইটামিনের অভাব।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ডেনদেশীয় কার্ল-পিটার হেনরিক ড্যাম মুরগীর শাবকের উপর পরীক্ষা করে আবিষ্কার করেন যে, রক্ত জমাট বাঁধার ব্যাপারে এক ধরনের ভাইটামিন জড়িত। তিনি বস্তুটির নাম দেন 'কোএ্যাগুলেশান্‌সভাইটামিন্'

(Koagulationsvitamine)। কালক্রমে সংক্ষেপে বস্তুটির নামকরণ করা হয় ভাইটামিন 'কে' (Vitamin K)। তারপরে সেণ্ট লুই বিশ্ববিদ্যালয়ের এডওয়ার্ড ডয়সি এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ ভাইটামিন 'কে' পৃথক ক'রে তার পরিগঠন নির্ণয় করেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ড্যাম এবং ডয়সি একত্রে ভেষজতত্ত্ব এবং শারীর বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ভাইটামিন 'কে' ভাইটামিনও নয় এবং বস্তুটির পুষ্টিগত সমস্যাও নেই। সাধারণতঃ অন্ত্রে ব্যাকটিরিয়া কর্তৃক প্রয়োজনের বেশি মাত্রায় বস্তুটি উৎপাদিত হয়। বস্তুতঃ, ব্যাকৃটিরিয়া এত বেশি ভাইটামিন 'কে' উৎপাদন করে যে, খাদ্য অপেক্ষা বিষ্ঠাতেই বস্তুটির প্রাচুর্য থাকে। ভাইটামিন 'কে' স্বল্পতার জন্য রক্ত জমাট না বেঁধে রক্তক্ষরণের বিপদ নবজাত শিশুদেরই বেশি। বর্তমানে স্বাস্থ্যকর হাসপাতালগুলিতে নবজাত শিশুর আন্ত্রিক ব্যাকৃটিরিয়ার প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ে তিন দিন সময় লাগার জন্য তাদের অথবা প্রসবের পুর্বে মাতার দেহে সূচী প্রয়োগে এই ভাইটামিন দান করা হয়। পুরাকালে শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই অন্ত্রে ব্যাকটিরিয়ার জন্ম হওয়ায় অন্যান্য সংক্রামক রোগে মৃত্যুর ভয় থাকলেও অন্ততঃ রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকত না।

১৯৩০ দশকের শেষে এবং ১৯৪০ দশকের গোড়ায় প্রাণরসায়নবিদরা আরও কিছু বি-ভাইটামিন আবিষ্কার করেন, যেগুলির নাম—বায়োটিন (biotin), প্যান্‌টোথেনিক এ্যাসিড (pantothenic acid), পিরিডক্সিন (pyridoxine), ফোলিক এ্যাসিড (Folic acid) এবং সায়ানোকোবাল্যামিন (Cyanocobalamine)। এই ভাইটামিনগুলি আন্ত্রিক ব্যাকৃটিরিয়া কর্তৃক উৎপাদিত হয়; তাছাড়া খাদ্যবস্তুতে এই বস্তুগুলি এমন ব্যাপকভাবে উপস্থিত যে, এইগুলির অভাবে কোনো রোগের কথা শোনা যায়নি। বস্তুতঃ গবেষকগণকে সুপরিকল্পিত ভাবে খাদ্য থেকে উক্ত ভাইটামিনগুলি বাদ দিয়ে এবং এমন কি আন্ত্রিক ব্যাকৃটিরিয়া উৎপাদিত ভাইটামিনগুলির কার্যকারিতা নষ্ট করার জন্য 'এ্যাণ্টি-ভাইটামিনগুলি" (anti-vitamins) যোগ ক'রে তবেই উপরোক্ত ভাইটামিনগুলির স্বল্পতার উপসর্গ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। (এ্যাণ্টি-ভাইটামিনগুলি পরিগঠনে ভাইটামিনগুলিরই অনুরূপ। সেইগুলি ভাইটামিন ব্যবহারকারী উৎসেচকগুলির কর্মক্ষমতা প্রতিযোগিতামূলক বাধের সাহায্যে নষ্ট ক'রে দেয়)।

বিভিন্ন ভাইটামিনের পরিগঠন নির্ধারণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই (এবং কোনো

কোনো ক্ষেত্রে আগেই) উক্ত ভাইটামিনগুলির সংশ্লেষণ কার্য শুরু হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পরিগঠন নির্ধারণের তিন বছর পর উইলিয়াম্‌স্‌ এবং তাঁর সহকর্মীরা থিয়ামিন সংশ্লেষিত করেন। পোলিশ বংশজ সুইজারল্যাণ্ডবাসী প্রাণ-রসায়নবিদ্‌ টাডিয়াস্‌ রাইখস্টাইন্‌ এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কিং কর্তৃক পরিগঠন সম্পূর্ণরূপে নির্ধারণের কিছু পূর্বেই এ্যাস্‌করবিক্‌ এ্যাসিড সংশ্লেষিত করেন। উদাহরণ স্বরূপ ভাইটামিন 'এ'র বিষয়ও উল্লেখ করা যায় যে, বস্তুটি দুই দল রাসায়নিক কর্তৃক ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে সংশ্লেষিত হয় (এক্ষেত্রেও পরিগঠন সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হওয়ার পূর্বেই)।

সংশ্লেষিত ভাইটামিন ব্যবহারের ফলে ঔষধের দোকানগুলিতে ভাইটামিনের মিশ্রণ ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভবপর হয়েছে, ব্যক্তিবিশেষে ভাইটামিন বটিকার প্রয়োজনের ইতরবিশেষ ঘটে। সমস্ত ভাইটামিনের মধ্যে ভাইটামিন 'ডি'র সরবরাহই স্বল্পতর হবার সম্ভাবনা বেশি। উত্তরাঞ্চলে শীতকালে সূর্যালোকের স্বল্পতার হেতু শিশুদের রিকেট রোগ আক্রমণের সম্ভাবনা বেশি, সুতরাং তাদেরই বিকীরিত খাদ্যবস্তু বা ভাইটামিন অনুপূরকের প্রয়োজন বেশি। কিন্তু ভাইটামিন 'ডি' (এবং ভাইটামিন 'এ')-রও মাত্রা সাবধানে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন কারণ অধিকমাত্রায় এইগুলি ক্ষতিকারক। কিন্তু যে কোনো সাধারণ ব্যক্তি যে সুষম খাদ্য গ্রহণ করে, তার পক্ষে 'বি' ভাইটামিনের কোনোই প্রয়োজনীয়তা নেই। ভাইটামিন 'সি'র ব্যাপারে একই কথাই প্রযোজ্য কিন্তু তবু যাই হোক এই ভাইটামিনটি কোনো সমস্যা হওয়া উচিতই নয়, কারণ খুব কম লোকই কমলা লেবুর রস পছন্দ করেন না বা এই ভাইটামিন-সচেতনতার দিনে তা পান করেন না।

মোটের উপর ভাইটামিন বটিকাগুলির ব্যাপক ব্যবহারে লোকের কোনো ক্ষতি হয় না, শুধু ওষুধের ব্যবসায়ীদের আয় বাড়ায় এবং বাস্তবে যে বর্তমান আমেরিকানরা পূর্ববর্তী পুরুষের তুলনায় অধিকতর লম্বা এবং ওজনে ভারী তার জন্য অংশতঃ ভাইটামিনই দায়ী।

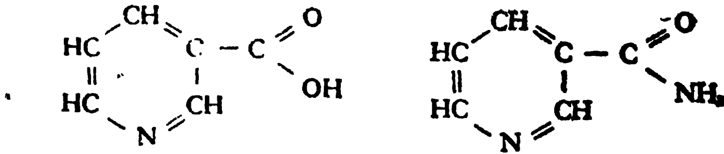
প্রাণরসায়নবিদ্‌রা স্বভাবতই কৌতূহলী হলেন যে, দেহে এত স্বল্প পরিমাণে ভাইটামিনগুলির উপস্থিতি সত্ত্বেও কিভাবে সেইগুলি দেহরসায়নে এমন উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। স্পষ্টতঃই অনুমিত হয় যে, একইরূপ স্বল্প উপস্থিতির উৎসেচকগুলির সঙ্গে এইগুলির কোনোরকম সম্বন্ধ আছে।

উৎসেচকগুলির রসায়নের বিশদ পর্যালোচনায় উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। বহুদিন ধরেই প্রোটিন সংক্রান্ত রসায়নবিদ্‌রা জানতেন যে, কোনো কোনো উৎসেচক (এবং কতকগুলি প্রোটিনও) শুধু মাত্র এ্যামিনো এ্যাসিডগুলি দ্বারা গঠিত নয়; সেগুলির অণুতে এ্যামিনো এ্যাসিড নয় এমন অংশগুলিও শিথিলগ্রথিত। অন্ততঃ উৎসেচকের ক্ষেত্রে এই তথ্যের প্রথম আবিষ্কার যখন ঘটল তখন দেখা গেল, কোনো উৎসেচককে 'ঝিল্লী' বিশ্লেষিত' (dialyzed) করলে অর্থাৎ কলোডিয়ন ঝিল্লীর মধ্য দিয়ে দ্রবীভূত অবস্থায় ছেঁকে নিলে সেগুলি তাদের কার্যকারিতা হারায়। আপাতদৃষ্টিতে উৎসেচকটির কার্যকারিতার পক্ষে অপরিহার্য কোনো অংশ কলোডিয়ন ঝিল্লীর অপরপার্শ্বে জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। কলোডিয়ন থলির মধ্যে যা পড়ে থাকে তা শুধুমাত্র প্রোটিন; যে অংশটি পৃথক হয়ে যায় সেটি নিশ্চয়ই কলোডিয়ন ঝিল্লীর সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্যে গলে যাবার পক্ষে যথেষ্ট ক্ষুদ্র মাপের অণু। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী প্রাণরসায়নবিদ গ্যাব্রিয়েল এমিল্ বারট্রানড এই অংশটির নাম 'কো-এনজাইম্' (co-enzyme) বা 'সহ-উৎসেচক' দেবার প্রস্তাব করেন। উৎসেচকের কার্যকারিতা, যথার্থ প্রোটিন অংশ ('এ্যাপোএন্‌জাইম্'—apoenzyme) এবং তার 'কো-এনজাইমের' সহযোগিতার উপর নির্ভর করে।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অটো-ভারবুর্গ এবং ডব্লিউ ক্রিশ্চিয়ান ইস্টের (yeast) উৎসেচক 'জাইমেসের' (Zymase) অংশরূপে সহ উৎসেচক 'কোজাইমেসের' (Co-zymase) পরিগঠন নিধারণে সফল হন। কোজাইমেসে রয়েছে একটি এ্যাডিনিন্ অণু, দুইটি রিবোজ (ribose) অণু, দুইটি ফস্‌ফেট্ গুচ্ছ এবং 'নিকোটিনামইডের' (nicotinamide) একটি অণু। জীবিত কলায় শেষোক্ত বস্তুটির সাক্ষাৎ লাভ অভাবিতপূর্ব এবং স্বাভাবিকভাবেই নিকোটিনামাইডকে ঘিরে কৌতূহল পুঞ্জীভূত হ'ল। (বস্তুটিকে নিকোটিনামাইড বলা হয়, কারণ বস্তুটিতে একটি এ্যানাইডের—$CONH_2$ অস্তিত্ব রয়েছে এবং 'নিকোটিনিক এ্যাসিড' থেকে বস্তুটি সহজেই উৎপন্ন হয়। আণবিক পরিগঠনে নিকোটিনিক এ্যাসিড তামাকজাত উপক্ষার (alkaloid), নিকোটিনের সমগোত্রীয় কিন্তু এইগুলির গুণ সম্পূর্ণ পৃথক; প্রধান পার্থক্য হচ্ছে নিকোটিনিক এ্যাসিড জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় আর নিকোটিন মারাত্মক বিষ)। নিকোটিনাসাইড এবং নিকোটিনিক এ্যাসিডের সংকেত পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কোজাইমেসের সংকেত নির্দিষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুটির পুনর্নামকরণ করা

হ'ল 'ডাইফস্‌ফোপিরিডিন নিউক্লিওটাইড (diphosphopyrindine nucleotide, ডি. পি. এন্‌.) এ্যাডিনিন্‌, রিবোজ এবং ফসফেট-এর বিশেষত্বমণ্ডিত গঠনের জন্ত



'নিউক্লিওটাইড' (যা নিউক্লিক এ্যাসিডের নিউক্লিওটাইডের অনুরূপ) এবং নিকোটিনাসাইড সংকেতে চক্রগঠনের অনুরূপ পরমাণু সমবায়ের জন্য পিরিডিন নাম।

শীঘ্রই প্রায় অনুরূপ আর একটি কো-এনজাইমের সন্ধান পাওয়া গেল, ডি. পি. এন্‌. এর সঙ্গে যার পার্থক্য দুইটির বদলে তিনটি ফস্‌ফেট গোষ্ঠীর উপস্থিতিতে; স্বভাবতঃই এই বস্তুটির নামকরণ করা হ'ল 'ট্রাইফস্‌ফো-পিরিডিন্‌ নিউক্লিওটাইড' (টি. পি. এন্‌.)। প্রমাণ পাওয়া গেল যে, উৎসেচকগুলি হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি এক অণু থেকে অপর অণুতে স্থানান্তর করণে নিযুক্ত। ডি. পি. এন্‌. ও টি. পি. এন্‌. উভয়েই দেহস্থ সেইরকম বহু উৎসেচকেরই কো-এন্‌জাইম্‌, (এই ধরনের উৎসেচকগুলিকে বলা হয় 'ডি-হাইড্রোজেনেস্‌' dehydrogenases)। কো-এন্‌জাইমগুলিই হাইড্রোজেনগুলি স্থানান্তরনের কাজটি সুসম্পন্ন করে। আসল উৎসেচকটি প্রত্যেকক্ষেত্রেই যে বস্তুতে স্থানান্তরনের কার্যটি সম্পন্ন হবে তার বাছাই-এর কাজ ক'রে থাকে। এন্‌জাইম ও কোএন্‌জাইম্‌ উভয়ের কার্যাবলীই প্রাণের পক্ষে অপরিহার্য এবং যে কোনো একটির সরবরাহে ঘাটতি পড়লেই হাইড্রোজেন স্থানান্তরনের মাধ্যমে খাদ্য বস্তু থেকে শক্তির মুক্তি কার্যে ভাঁটা পড়ে।

উপরোক্ত ব্যাপার থেকে যে তথ্যটি শীঘ্রই লক্ষণীয় হয়ে উঠল তা হ'ল এই যে, উৎসেচকের নিকোটিনামাইড গুচ্ছের অংশটুকু দেহ স্বাধীনভাবে উৎপাদনে সক্ষম নয়। দেহে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রোটিন এবং ডি. পি. এন্‌. ও টি. পি. এন্‌. এর অংশগুলি সমস্তই উৎপাদিত হয়, হয় না শুধু নিকোটিনামাইড। খাদ্যে এই বস্তুটিকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় (অন্ততঃ নিকোটিনিক এ্যাসিড অবস্থায়) পাওয়া অবশ্যই দরকার। যদি তা পাওয়া না যায় তবে ডি. পি. এন্‌. ও টি. পি. এন্‌. এর উৎপাদন ব্যাহত হয়, ফলে এই বস্তুগুলি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হাইড্রোজেন স্থানান্তরন ক্রিয়া মন্দীভূত হয়।

নিকোটিনামাইড বা নিকোটিনিক এ্যাসিড কি তাহলে ভাইটামিন? বস্তুতঃ ফাংক (যিনি 'ভাইটামিন' শব্দটি আবিষ্কার করেন) চালের তুঁষ থেকে নিকোটিনিক এ্যাসিড স্বতন্ত্র করেন। নিকোটিনিক এ্যাসিডে বেরি-বেরি আরোগ্য না হওয়ায় তিনি বস্তুটি উপেক্ষা করেন। কিন্তু কো-এন্‌জাইম্ প্রসঙ্গে নিকোটিনিক এ্যাসিডের আবির্ভাব হওয়ায় উইস্‌কন্‌সিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-রসায়নবিদ্ সি. এ. এল্‌ভেহ্‌জেম্ এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ আর একটি অপুষ্টি রোগে এই বস্তুটিকে ব্যবহারের চেষ্টা করেন।

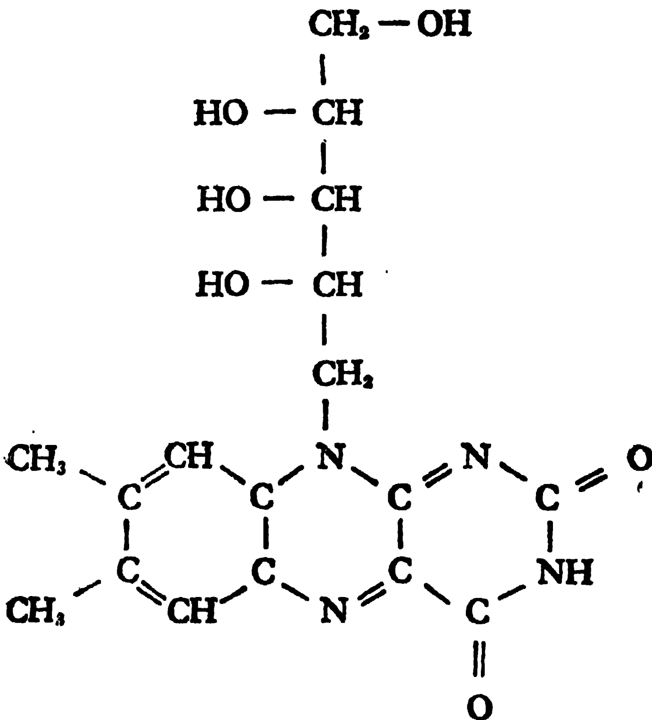
১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন চিকিৎসক জোসেফ গোল্ড-বার্জার পেলাগ্রা (কখনও কখনও রোগটিকে 'ইটালীয় কুষ্ঠ' ও বলা হয়) রোগটি সম্বন্ধে বিশদভাবে অনুসন্ধান করেন যে, রোগটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের স্থানীয় (endemic) রোগ এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় মারীর পর্যায়ে ছিল। পেলাগ্রা রোগের উল্লেখযোগ্য উপসর্গ হচ্ছে শুষ্ক শল্কযুক্ত চর্ম, উদরাময় এবং জিহ্বার প্রদাহ প্রভৃতি ; সময় বিশেষে এই রোগের ফলে মানসিক বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয়। গোল্ডবার্জার লক্ষ্য করেন, যে-সকল পরিবার সীমিত খাদ্যে (মুখ্যতঃ শস্য জাতীয় খাদ্য) জীবনধারণ করত, সাধারণতঃ তারাই এই রোগে আক্রান্ত হ'ত, কিন্তু যে-সব পরিবারের দুগ্ধবতী গরু ছিল তারা আক্রান্ত হ'ত না। তিনি কৃত্রিম খাদ্যের সাহায্যে গবেষণা শুরু করেন—প্রাণী এবং জেলখানার কয়েদীদের (যাদের মধ্যে পেলাগ্রার প্রাচুর্য ছিল) তাই খেতে দিতেন। তিনি কুকুরের মধ্যে 'ব্ল্যাকটঙ্গ' (blacktongue, জিভ কালো হওয়া) যা পেলাগ্রা রোগের অনুরূপ, রোগ সৃষ্টি এবং ইস্টের (yeast) নির্যাসের সাহায্যে তা আরোগ্য করতে সমর্থ হন। তিনি আবিষ্কার করেন যে, কয়েদীদের খাদ্যে দুধের ব্যবস্থা ক'রে তাদের পেলাগ্রা সারানো সম্ভব। গোল্ডবার্জার স্থির করেন যে, কোনো একটি ভাইটামিন এই ব্যাপারে জড়িত—তিনি যার নাম দেন পি-পি (পেলাগ্রা প্রিভেটিনভ্ বা পেলাগ্রা প্রতিরোধকারী) ফ্যাক্টর।

এল্‌ভেহজেম্ নিকোটিনিক এ্যাসিড পরীক্ষার জন্য পেলাগ্রাকেই বেছে নিলেন। তিনি ব্ল্যাকটঙ্গ রোগাক্রান্ত একটি কুকুরকে অল্পমাত্রায় নিকোটিনিক এ্যাসিড দিলেন এবং কুকুরটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গেল। আরও কিছু মাত্রায় দেওয়ার ফলে কুকুরটি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করল। প্রমাণিত হ'ল যে, নিকোটিনিক এ্যাসিডও একটি ভাইটামিন এবং পি-পি ফ্যাক্টর।

আমেরিকান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েসন শঙ্কিত হ'ল যে, জনসাধারণ হয়ত

মনে করতে পারে, তামাকে ভাইটামিন আছে; সেজন্য প্রস্তাব করল যে, ভাইটামিনটিকে নিকোটিনিক এ্যাসিড না বলে সংক্ষেপে নিয়াসিন অথবা নিয়াসিনামাইড বলা হোক। নিয়াসিন শব্দটিই বর্তমানে বহুল প্রচলিত।

ক্রমশঃ একথা পরিষ্কার হ'ল যে, বিভিন্ন ভাইটামিনগুলি নানা কোএন্‌জাইমগুলির অংশ বিশেষ মাত্র, যেগুলি এমন এক আণবিক গুচ্ছ যা প্রাণী অথবা মানুষ নিজেরা উৎপাদন করতে পারে না। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ভারবুর্গ একটি হল্‌দে কো-এন্‌জাইমের সন্ধান পান, যেটি হাইড্রোজেনের স্থানান্তরনে প্রভাবিত করে। অষ্ট্রিয়ান রসায়নবিদ্‌ রিচার্ডকুন্‌ এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ শীঘ্রই ভাইটামিন বি পৃথক করতে সমর্থ হন, যেটি হল্‌দে বলে প্রমাণিত হ'ল। তাঁরা বস্তুটির পরিগঠন নিম্নরূপ নিধারণ করেন :



মধ্যবর্তী চক্রে সংযুক্ত কার্বন শৃংখল 'রিবিটল' (ribitol) অণুর ধরনে হওয়ায় ভাইটামিন 'বি'-কে বলা হয় 'রিবোফ্লেভিন', 'ফ্লেভিন' শব্দটি এসেছে

ল্যাটিন থেকে—যার অর্থ 'হল্‌দে'। যেহেতু বর্ণালী বিশ্লেষণে দেখা গেল, রিবোফ্লেভিন ভারবুর্গ আবিষ্কৃত হল্‌দে কো-এন্‌জাইমের অনুরূপ, কুন্‌ ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রিবোফ্লেভিনের কার্যকারিতার জন্য কোএন্‌জাইমটি পরীক্ষা করেন এবং একই ধরনের কার্যকারিতা আবিষ্কার করেন। এই বছরে সুইডেনবাসী প্রাণরসায়নবিদ হিউগো থিওরেল, ভারবুর্গ-আবিষ্কৃত হল্‌দে কো-এন্‌জাইমের পরিগঠন নির্ধারণ করেন এবং প্রমাণ করেন বস্তুটি ফসফেট গুচ্ছ সংযুক্ত রিবোফ্লেভিন। (১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জটিলতর দ্বিতীয় একটি কোএন্‌জাইম্‌ অণুর অংশ হিসাবে রিবোফ্লেভিনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়)।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কুন্‌ রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে থিওরেল ভেষজতত্ত্ব ও শারীর বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে নাৎসী জার্মানী কর্তৃক অষ্ট্রিয়া দখলের অব্যবহিত পরেই কুন্‌কে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয় এবং (গারহার্ড-ডোম্যাকের মতোই) তিনি পুরস্কার গ্রহণে অসম্মত হতে বাধ্য হন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান প্রাণরসায়নবিদ্‌ কে. লোহ্‌ম্যান্‌ এবং পি. শুস্টার একটি উল্লেখযোগ্য কোএন্‌জাইম্‌ আবিষ্কার করেন, যার পরিগঠনের অংশ হিসাবে থিয়ামিন উপস্থিত। ১৯৪০ সালের মধ্যে ভাইটামিন 'বি'-র সঙ্গে কোএন্‌জাইমের আরও নানা সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হয়। পাইরিডক্সিন্‌, প্যান্‌টোথেনিক অ্যাসিড, ফোলিক অ্যাসিড, বায়োটিন প্রভৃতি প্রত্যেকটিই এক বা একাধিক উৎসেচক গোষ্ঠীর সঙ্গে আবদ্ধ বলে প্রমাণিত হ'ল।

মানব-দেহে রাসায়নিক যন্ত্রাদির পরিমিতির সুন্দর উদাহরণ হচ্ছে ভাইটামিন-গুলি। এইগুলি একটি মাত্র বিশিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্য দায়ী, সেইজন্য মানব কোষ এইগুলির উৎপাদন ব্যবস্থা বাতিল করতে পেরেছে, কারণ খাদ্য বস্তুতে এই বস্তুগুলি সংগ্রহের যুক্তি-সংগত ঝুঁকি নেওয়া চলে। এইগুলি ছাড়াও আরও অনেক বস্তু আছে যা দেহে অতি সামান্য মাত্রায় প্রয়োজন হলেও দেহেই সেইগুলি উৎপাদন করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, অপরিহার্য নিউক্লিক এ্যাসিড উৎপাদনে যে মূল বস্তু প্রয়োজন, প্রায় অনুরূপ বস্তু থেকে এ. টি. পি-র উৎপত্তি। একথা কল্পনা করা যায় না যে, নিউক্লিক এ্যাসিড সংশ্লেষণের পক্ষে প্রয়োজনীয় কোনো উৎসেচকের অভাব হলে জীব বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে, কারণ নিউক্লিক এ্যাসিড এত প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন যে, জীব নিউক্লিক এ্যাসিডের সরবরাহের জন্য খাদ্যের উপর নির্ভর করতে সাহস পাবে

না ; সুতরাং নিউক্লিক এ্যাসিড উৎপাদনে সক্ষমতা মানেই এ. টি. পি. উৎপাদনে সক্ষম হওয়া। ফলে এমন কোনো জীব জানা নেই, যা নিজস্ব এ. টি. পি. উৎপাদনে অক্ষম এবং সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও এমন প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যাবে না।

ভাইটামিনের মতো বিশেষ বস্তু উৎপাদনের অর্থ হচ্ছে—মোটরগাড়ী উৎপাদনের কারখানায়, যেখানে বিভিন্ন অংশগুলি জোড়া লাগাবার ব্যবস্থা আছে, তারই পাশে নাটবল্টু উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। অথচ নাটবল্টু বাইরের থেকে কিনে কাজ চালালে মটর গাড়ীর উৎপাদন আরও সুদক্ষভাবে হয়ে থাকে। ঠিক সেই ভাবে জীব খাদ্যবস্তু থেকে ভাইটামিন সংগ্রহ ক'রে স্থান ও বস্তুর উদ্বৃত্তি সাধন করে।

ভাইটামিনগুলির দ্বারা জীবনের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য তথ্যের ব্যাখ্যা করা যায়। যতদূর জানা গিয়েছে, সমস্ত জীবিত প্রাণীরই 'বি' ভাইটামিনগুলি প্রয়োজন। উদ্ভিদ, প্রাণী বা ব্যাক্‌টিরিয়া প্রত্যক জীবিত কোষেই কোএন্‌-জাইমগুলি কোষের অপরিহার্য অংশ। কোষ 'বি' ভাইটামিনগুলি খাদ্যবস্তুতেই সংগ্রহ করুক অথবা নিজেই প্রস্তুত করুক, সেইগুলির জীবন ও বৃদ্ধির জন্য 'বি' ভাইটামিনগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় ; মূলতঃ প্রাণের একত্বের বিস্ময়কর উদাহরণ এবং এই ব্যাপার সম্ভবতঃ এইটাই প্রমাণ করে যে, আদি যুগের সমুদ্রে একটি মাত্র প্রাণ থেকেই সমস্ত জীবের উদ্ভব।

'বি' ভাইটামিনগুলির ভূমিকা বর্তমানে সুপরিজ্ঞাত হলেও অন্যান্য ভাইটামিনগুলির রাসায়নিক ক্রিয়া নির্ধারণ সুকঠিন ব্যাপার। যে একটিমাত্র ভাইটামিনের ব্যাপারে বাস্তবিকই কিছু অগ্রগতি হয়েছে, তা হচ্ছে ভাইটামিন 'এ'।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন শারীরবৃত্তবিদ্‌ এল্‌. এস্‌. ফ্রিডেরিসিয়া এবং ই. হোল্‌ম্‌ আবিষ্কার করেন যে, ভাইটামিন 'এ' বিহীন খাদ্যে পালিত ইঁদুরের পক্ষে অল্প আলোয় কিছু করা অসুবিধাজনক। তাদের অক্ষিপটগুলি (retina) বিশ্লেষণ ক'রে আবিষ্কৃত হ'ল যে, সেগুলিতে "ভিস্যুয়াল পার্পল্‌" (visual purple) নামক বস্তুর অভাব রয়েছে।

অক্ষিপটে দুই রকমের কোষ আছে—রডস্‌ (rods) এবং কোন্‌স্‌ (cones) অল্প আলোয় দেখার পক্ষে বড়গুলি উপযোগী এবং এইগুলিতেই রয়েছে ভিস্যুয়াল পার্পল্‌। সুতরাং ভিস্যুয়াল পার্পল্‌-এর অভাবের ফলেই কেবলমাত্র

অল্প আলোয় দেখার অসুবিধা হয় এবং ফলে "রাতকাণা" (night blindness) রোগের সৃষ্টি হয়।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হার্ভার্ডের জীববিজ্ঞাবিদ্ জর্জ ওয়াল্ড অল্প আলোর দৃষ্টিশক্তির রাসায়নিক তাৎপর্য নির্ধারণ করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, আলোয় 'ভিস্যুয়াল পার্পল্' বা "রডোপসিন্" (rhodopsin) দুই অংশে বিভক্ত হয়: প্রোটিন অংশ "অপ্‌সিন্" (opsin) এবং অপ্রোটিন অংশ 'রেটিনিন্' (retinene)। দেখা গেল, রেটিনিনের পরিগঠন প্রায় ভাইটামিন 'এ'-র অনুরূপ।

অন্ধকারে রেটিনিন্ সর্বদা অপ্‌সিনের সঙ্গে মিলিত হয়ে রডোপ্‌সিন্ সৃষ্টি করে। কিন্তু আলোয় অপ্‌সিন্ থেকে পৃথক হওয়ার সময় রেটিনিনের ক্ষুদ্র অংশ ভেঙে যায়, কারণ বস্তুটি প্রতিস্থিত। যাই হোক, রেটিনিনের চাহিদা ভাইটামিন 'এ'-র থেকেই পূরণ হয়। ভাইটামিনটি উৎসেচকের সাহায্যে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপসারিত ক'রে রেটিনিনে পরিবর্তিত হয়। এইভাবে ভাইটামিন 'এ' রেটিনিনের প্রতিষ্ঠসঞ্চয় হিসাবে কাজ করে। খাদ্যে ভাইটামিন 'এ'-র অভাব হলে কালক্রমে রেটিনিনের যোগান এবং ভিস্যুয়াল পার্পলের পরিমাণ কম হয়, ফলে 'রাতকাণা' রোগ দেখা যায়।

ভাইটামিন 'এ'-র অবশ্যই অন্যান্য উপযোগিতাও আছে। কারণ, বস্তুটির অভাবে শ্লেষ্ম ঝিল্লীগুলিতে শুষ্কতার সৃষ্টি করে এবং অন্যান্য উপসর্গের সৃষ্টি করে, যার সঙ্গে অবশ্য অক্ষিপটের গোলযোগের কোনো সম্বন্ধ আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। কিন্তু অন্যান্য উপযোগিতাগুলি এখনও অজানা।

ভাইটামিন 'সি', 'ডি', 'ই' এবং 'কে'গুলি সম্বন্ধেও এই একই কথাই প্রযোজ্য।

॥ খনিজ পদার্থসমূহ (Minerals) ॥

এ কথা মনে করা স্বাভাবিক যে, জীবিত কলার মতো আশ্চর্যজনক কিছু সৃষ্টির উপকরণগুলি নিশ্চয়ই বহিরাগত মনোহর বস্তু। প্রোটিন এবং নিউক্লিক এ্যাসিডগুলি সত্যই আশ্চর্যজনক, কিন্তু যদি আমরা উপলব্ধি করি যে, মনুষ্যদেহ গঠনকারী মৌলগুলি—ধূলোর মতোই নগণ্য এবং বস্তুগুলি মাত্র কয়েক টাকাতেই কিনতে পারা যায়, তবে গর্বের আমাদের কিছুই থাকে না। (কয়েক আনাতেই আগে কেনা সম্ভব হ'ত, বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির ফলে দর বেড়েছে)।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, যখন রসায়নবিদরা জৈবিক যৌগগুলি বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন তখন পরিষ্কার বোঝা যায় যে, জীবিত কলা কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনে গঠিত। এই চারটি মৌলই সমগ্র মনুষ্য দেহের ওজনের শতকরা ৯৬ ভাগ রয়েছে। তাছাড়া সামান্য গন্ধকও (সালফার) আছে। এই মৌলগুলি পুড়িয়ে ফেললে সামান্য সাদা ছাই অবশিষ্ট থাকে, যার অধিকাংশই হাড়ের অবশিষ্টাংশরূপে পাওয়া যায়। ছাই খনিজ পদার্থ সমূহের সংগ্রহ।

এই ছাইএ সাধারণ লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতি বিস্ময়কর নয়। আর যাই হোক, লবণ শুধুমাত্র আহার্যের স্বাদ বাড়াবার জন্য নয়— যা মুখরোচক মশলাগুলির (আমাদের দেশের মশলা যথা, হলুদ, লংকা, শর্ষে প্রভৃতি) মতো বর্জ্জন করা চলে। এ বস্তুটির উপর জীবন-মরণ নির্ভর করে। শুধুমাত্র রক্তের স্বাদ গ্রহণ করলেই বোঝা যাবে যে, লবণ দেহের মূল উপাদান। তৃণভোজী প্রাণী যারা খাদ্য ব্যাপারে ভোজন-বিলাসী নয়, ঘাস ও গাছের পাতায় লবণহীনতার পরিপূরণ হিসাবে প্রয়োজনীয় লবণ সংগ্রহের জন্য কষ্ট সহ্য করে এবং বিপদের ঝুঁকিও নিয়ে থাকে।

বহুপূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সুইডেনের রসায়নবিদ জোহান্ গটলিয়ের গ্যান্ প্রমাণ করেন যে, হাড়গুলি মুখ্যতঃ ক্যালশিয়াম ফস্ফেট্ দ্বারা গঠিত এবং ইতালীয় বিজ্ঞানী ভি. মেনঘিনি আবিষ্কার করেন যে, রক্তে লৌহ (iron) রয়েছে। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জাস্টাস্ ফন্ লিবিগ কলাগুলিতে পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম আবিষ্কার করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় দেহস্থ খনিজ পদার্থ হিসাবে ক্যাল্শিয়াম, ফস্ফোরাস্, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেশিয়াম এবং লৌহের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। অধিকন্তু, জীবন ক্রিয়ায় উপরোক্ত বস্তুগুলি জৈব যৌগসমূহের মৌলগুলির ন্যায় সমান সক্রিয়।

লৌহের ব্যাপারটিই সব থেকে সহজবোধ্য। খাদ্যে লৌহের অভাব হলে রক্তে হিমোগ্লোবিনের অভাব ঘটে এবং ফুসফুস থেকে কোষসমূহে অক্সিজেনের সরবরাহ কমে যায়। এই অবস্থাকে বলা হয়, লৌহের অভাবজনিত রক্তশূন্যতা (iron deficiency anemia)। রোগী লৌহের অভাবে পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করে এবং অক্সিজেনের অভাবে ক্লান্তি বোধ করে।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ চিকিৎসক সিডনী রিঙ্গার আবিষ্কার করেন যে, ব্যাঙের হৃদপিণ্ড দেহের বাইরে একটি দ্রবণে (আজ পর্যন্ত যাকে বলা হয়

'রিঙ্গারের দ্রবণ' Ringer's solution) জীবিত ও স্পন্দিত অবস্থায় রাখা যেতে পারে—যে দ্রবণে অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্যালশিয়াম ব্যাঙের রক্তে যে হারে মৌলগুলি উপস্থিত, সেই হারে উপস্থিত থাকে। প্রত্যেকটি মৌলই পেশীর কার্যকারিতার জন্য কোনো না কোনোভাবে অপরিহার্য। ক্যাল্‌শিয়ামের অভাবে রক্ত জমাট বাঁধে না এবং এই ব্যাপারে ক্যালশিয়ামের পরিবর্ত হিসাবে অন্য মৌলও উপযোগী নয়।

সমস্ত খনিজ পদার্থসমূহের মধ্যে অবশেষে ফস্‌ফোরাসই বিভিন্ন ধরনের বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পন্ন করে বলে আবিষ্কৃত হয়েছে! এই বিষয়টি নিউক্লিক এ্যাসিড পর্যালোচনায় বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে

হাড়ের মুখ্য উপাদান ক্যালশিয়ামের পরিমাণ দেহের শতকরা ২ ভাগ এবং ফস্‌ফোরাসের পরিমাণ দেহের শতকরা ১ ভাগ। অন্যান্য মৌলগুলির উপস্থিতি আরও কম হারে বর্তমান; লৌহের উপস্থিতি দেহের শতকরা ০'০০৪ ভাগ মাত্র। (তবুও সাধারণ বয়স্ক পুরুষের কলাগুলিতে গড়ে এক আউন্সের দশ ভাগের একভাগ লৌহ উপস্থিত)। কিন্তু আমাদের তালিকা শেষ হয় নি; অন্যান্য খনিজপদার্থসমূহ দেহকলায় ক্বচিৎ লক্ষণযোগ্য স্বল্পতম পরিমাণে উপস্থিত থাকলেও, জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

কোনো মৌলের উপস্থিতি মাত্রই তাৎপর্যপূর্ণ নয়, কারণ মৌলটির উপস্থিতি অপবস্তু (impurities) হিসাবে হতেও পারে। আমাদের খাদ্যের সঙ্গে প্রতিবেশে উপস্থিত সমস্ত মৌলই আমাদের দেহাভ্যন্তরে কণা মাত্রায় প্রবেশ করে এবং অতি স্বল্পতম অংশ আমাদের দেহ কলায় স্থানলাভ করে। কিন্তু উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সিলিকন (silicon) এবং এ্যালুমিনিয়াম (allu-minium) প্রভৃতি মৌলগুলি আমাদের কোনো কাজেই লাগে না। অপর পক্ষে, জিংক (zinc, দস্তা) ধাতুটি অপরিহার্য। কিন্তু অপরিহার্য মৌলগুলির সঙ্গে আকস্মিক অপবস্তুগুলির পার্থক্য কি?

সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে, কতকগুলি প্রয়োজনীয় উৎসেচকে, কণা-মাত্রার মৌলগুলি (trace elements) অত্যাবশ্যক উপাদান হিসাবে প্রমাণ করা। (উৎসেচকে কেন? কারণ, অন্য কোনো উপায়ে কণা মাত্রার মৌলগুলি সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না)। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের ডেভিড কিলিন্‌ এবং টি. ম্যান্‌ প্রমাণ করেন যে, দস্তা (zinc) কার্বনিক এ্যানহাইড্রেস্‌ (carbonic anhydrase) নামক উৎসেচকটির অপরিহার্য অংশ। কার্বনিক

এ্যান্‌হাইড্রেস্‌ উৎসেচকটি দেহ কর্তৃক কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ন্ত্রণের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং উক্ত গুরুত্বপূর্ণ আবর্জনাটির যথাযথ নিয়ন্ত্রণ আবার জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। ফলতঃ, তত্ত্বে সূচিত যে, দস্তা (zinc) প্রাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং পরীক্ষায় সেই কথাই প্রমাণিত হয়। দস্তা-বিরল খাদ্যে ইঁদুরের বৃদ্ধি বন্ধ হয়, লোম ঝরে যায়, চামড়ায় শল্কের (scaliness) সৃষ্টি হয় এবং মৌলটির অভাবে ভাইটামিন অভাবের মতোই অকালে মারা পড়ে।

একই ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাণীর পক্ষে তামা (copper), ম্যাংগানিজ (manganese), কোবাল্ট (cobalt) এবং মলিবডেনাম্‌ (molybdenum) অত্যাবশ্যক। খাদ্যে এইগুলির অনুপস্থিতির ফলে রোগ দেখা দেয়। অবশ্য-প্রয়োজনীয় কণা মাত্রার মৌলগুলির মধ্যে সর্বশেষে আবিষ্কৃত মলিবডেনাম্‌ (molybdenum)—"জ্যানথিন অক্সিডেস্‌ (xanthine oxidase) নামক উৎসেচকের উপাদান। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে উদ্ভিদ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রথম মলিবডেনামের গুরুত্ব লক্ষ্য করা হয়, যখন ভূতত্ত্ববিদ্‌রা আবিষ্কার করেন যে, অপ্রচুর মলিবডেনামযুক্ত মৃত্তিকায় উদ্ভিদের বৃদ্ধিলাভ ব্যাহত হয়। অনুমিত হয় যে, বাতাসের নাইট্রোজেনকে নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগে পরিবর্তনে প্রভাবকের কাজ করে এমন কিছু মৃত্তিকাস্থ জীবাণুর, কোনো উৎসেচকের উপাদান হিসাবে—মলিবডেনাম উপস্থিত রয়েছে। উদ্ভিদ নিজে বাতাস থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণে সক্ষম না হওয়ায় জীবাণুগুলির উপর নির্ভরশীল। (আমাদের গ্রহে জীবের পরস্পর নির্ভরশীলতার বহু উদাহরণের মধ্যে এইটি অন্যতম। জীব-জগৎ দীর্ঘ এবং জটিল শৃংখলে পরস্পর সম্বন্ধ, এই শৃংখলের যে কোনো অংশে ভাঙন ঘটলে বহু ক্লেশ এবং এমন কি দুর্বিপাকের সম্ভাবনা)।

বর্তমানে উপলব্ধি করা গিয়েছে যে, জলহীন মরুভূমির ন্যায় কণামাত্রার মৌলবিহীন "মরুভূমিও" আছে, সাধারণতঃ দুইটিই একস্থানে থাকে, যদিও তার ব্যতিক্রম আছে। অস্ট্রেলিয়ায় ভূমিতত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার করেছেন যে, যথাযথ যৌগে মিশ্রিত এক আউন্স মলিবডেনাম, ১৬ একর মলিবডেনাম-বিরল জমিতে ছড়ালে জমির উর্বরা শক্তি বিশেষ রকমে বাড়ে। কণা-মাত্রার মৌলগুলির মাত্রাই চূড়ান্ত নির্ণায়ক (crucial)। অত্যধিক মাত্রা, স্বল্পতম মাত্রার মতোই ক্ষতিকারক। কোনো কোনো মৌল (যেমন তামা) স্বল্প মাত্রায় প্রাণের পক্ষে অপরিহার্য হলেও, অধিক মাত্রায় বিষের কাজ করে।

খনিজ পদার্থসমূহের উনতা আবিষ্কারের অন্যতম নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে কোবাল্ট জড়িত। বিগত কালের মারাত্মক রোগ "পার্নিশাস্ এ্যানিমিয়া" বা (pernicious anæmia) বা মারাত্মক রক্তশূন্যতা এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের, রোগবিদ্যাবিদ্ জর্জ হুয়েট হুইপ্‌ল্ বিভিন্ন খাদ্যের সাহায্যে হিমোগ্লোবিন পুনরুৎপাদনের পরীক্ষা করছিলেন। তিনি কুকুরের রক্তমোক্ষণে রক্তশূন্যতা সৃষ্টি করে বিভিন্ন খাদ্যের সাহায্যে পরীক্ষা করছিলেন যে, কোনো খাদ্য নাই যা হিমোগ্লোবিন ত্বরিত পুনরুৎপাদনে সক্ষম। তিনি যে পার্নিশাস এ্যানিমিয়া বা অন্য যে কোনো ধরনের রক্তশূন্যতা রোগ সম্বন্ধে কৌতূহলী ছিলেন ব'লে এই পরীক্ষা কার্য চালিয়েছিলেন তা নয়, তিনি এই পরীক্ষা করছিলেন পিত্ত-রঞ্জকের (bile pigments) পর্যালোচনা করার জন্য, যে যৌগটি হিমোগ্লোবিন থেকে দেহে উৎপন্ন হয়। হুইপ্‌ল্ আবিষ্কার করেন যে, যে খাদ্যটি কুকুরের দেহে হিমোগ্লোবিন উৎপাদন ত্বরান্বিত করে, তা হচ্ছে যকৃৎ।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বোস্টনের দুইজন চিকিৎসক জর্জ রিচার্ডস্ মিনো এবং উইলিয়ম প্যারি মরফি হুইপ্‌লের পরীক্ষার ফলাফল বিচার বিশ্লেষণ ক'রে পার্নিশাস এ্যানিমিয়া আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় যকৃৎ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত করেন। চিকিৎসায় কাজ হ'ল। যতদিন রোগী খাদ্যের প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবে যকৃৎ আহার করত, এই মারাত্মক রোগ থেকে ততদিন নিষ্কৃতি লাভ করত। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে হুইপ্‌ল্, মিনো ও মরফি ভেষজতত্ত্ব ও শারীরবিদ্যায় একত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, যকৃৎ যদিও যথাযথ রন্ধনে ডিম, পেঁয়াজ বা চর্বি সহযোগে মুখরোচক তবুও দৈনন্দিন আহার্য হিসাবে একঘেয়ে। (কিছুকাল পরে রোগীর মনে হওয়া সম্ভব যে, এই খাদ্যের বদলে রক্তশূন্যতাই ছিল ভালো)। প্রাণরসায়নবিদ্‌রা যকৃতে আরোগ্যকারী বস্তুটির অনুসন্ধান শুরু করলেন এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের এডুইন্ এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ এমন একটি নির্যাস প্রস্তুত করেন, যা যকৃতের চেয়ে শতগুণ কর্মক্ষম। সক্রিয় অংশটি পৃথক করনের জন্য অবশ্য আরও বিশুদ্ধকরনের প্রয়োজন ছিল। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মার্ক গবেষণাগারগুলির রসায়নবিদ্‌রা আবিষ্কার করেন যে, যকৃতের নির্যাস কোনো কোনো ব্যাক্‌টিরিয়ার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে। আবিষ্কারের ফলে উক্ত বস্তুজাত যে কোনো দ্রব্যের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা সহজ হ'ল এবং প্রাণ-

রসায়নবিদ্রা নির্যাসটি বিভিন্ন অংশে বিশ্লিষ্ট ক'রে অংশগুলি ত্বরিত পরীক্ষা করার সুযোগ পেলেন। যেহেতু যকৃতস্থ বস্তুটির প্রতি ব্যাকটিরিয়াগুলির ক্রিয়া থিয়ামিন বা রিবোফ্লেভিনের সঙ্গে ক্রিয়ার অনুরূপ, সেইহেতু গবেষকগণ সন্দেহ করেন যে, যে বস্তুটি তাঁরা সন্ধান করছেন সেইটিও ভাইটামিন 'বি' গোষ্ঠীভুক্ত। তাঁরা বস্তুটির নাম দেন 'ভাইটামিন বি$_{১২}$' (Vitamin B_{12})।

১৯৪৮ সাল নাগাদ ব্যাকটিরিয়ার প্রতিক্রিয়া এবং বর্ণরেখচিত্র (chromatography) ব্যবহারে ইংল্যাণ্ডের ই. এল. স্মিথ এবং মার্ক কোম্পানীর কার্ল এ. ফোকার্স বিশুদ্ধ ভাইটামিন বি$_{১২}$ পৃথক করতে সমর্থ হন। দেখা গেল, ভাইটামিনটি লাল রঙের এবং উপরোক্ত উভয় বৈজ্ঞানিকেরই মনে হ'ল যে, রঙটি কোনো কোনো কোবাল্ট যৌগের অনুরূপ। ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছিল যে, কোবাল্ট ন্যূনতার ফলে গো-মেষাদির মারাত্মক রক্তশূন্যতা রোগ দেখা দেয়। স্মিথ এবং ফোকার্স উভয়েই ভাইটামিন বি$_{১২}$ পুড়িয়ে ছাই বিশ্লেষণ করে প্রকৃতই কোবাল্টের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। বর্তমানে যৌগটির নামকরণ করা হয়েছে সায়ানোকোবাল্যামিন (cyanocobalamine)। এখনও পর্যন্ত জীবিত কলায় এই একটি মাত্রই কোবাল্ট সংযুক্ত যৌগের সন্ধান পাওয়া গেছে।

যৌগটিকে বিশ্লেষিত ক'রে, বিশ্লিষ্ট অংশগুলি পরীক্ষা ক'রে রসায়নবিদ্রা সত্বর সিদ্ধান্ত করেন যে, ভাইটামিন বি$_{১২}$ যৌগটি অত্যন্ত জটিল এবং বস্তুটির যে স্থূল-সংকেত (empirical formula) তাঁরা নির্ধারণ করেন তা হ'ল— $C_{63}H_{88}O_{14}N_{14}PCo$. তারপর বৃটিশ রসায়নবিদ্ ডরোথি হজকিন্ রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে বস্তুটির সম্পূর্ণ পরিগঠন নির্ণয় করেন। যৌগটির কেলাসের 'অপবর্তনের নক্সা' (diffraction pattern) তাঁহাকে অণুতে ইলেকট্রনের ঘনত্ব (electron densities) নির্ণয়ে সাহায্য করে—অর্থাৎ অণুর যে অঞ্চলে ইলেকট্রনের অস্তিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে এবং যে অঞ্চলে সে সম্ভাবনা নেই তা তিনি উপরোক্ত পদ্ধতিতে আবিষ্কার করেন। যদি সমসম্ভাবনা বিশিষ্ট অঞ্চলে রেখা টানা হয় তবে সমগ্র অণুটির কাঠামোর ছবি পাওয়া যাবে। এই কাঠামোয় তিনি অণুটির জ্ঞাত বিভিন্ন অংশ যথাযথ সন্নিবেশিত করতে সক্ষম হন। রঞ্জন রশ্মির অপবর্তনের ছবি থেকে এই চরম জটিল অণুটির ইলেকট্রন ঘনত্বের হিসাব করার জন্য তিনি একটি আধুনিক গণনাকারী যন্ত্র বা কম্পিউটার computer)—(দি ন্যাশানাল ব্যুরো অব্ স্ট্যাণ্ডার্ডস্ ওয়েস্টার্ণ অটোমেটিক

কমপিউটার (Standards Western Automatic Computer, SWAC) ব্যবহার করেন।

দেখা গেল, ভাইটামিন বি১২ বা সায়ানোকোবালামিন পরমাণুটি একদিক ভারী পরফাইরিন (Porphyrin) চক্র, যার দুইটি ক্ষুদ্রতর পিরোল চক্রের (pyrrole rings) সংযোগকারী একটি কার্বন সেতুর অভাব রয়েছে এবং পিরোল চক্রে জটিল পার্শ্বশৃঙ্খলের (side-chain) সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুটির সঙ্গে 'হেম' (heme) অণুর সাদৃশ্য রয়েছে ; মৌল তফাৎ এই যে, হেমেতে পরফাইরিন চক্রের কেন্দ্রে রয়েছে লৌহের পরমাণু আর সায়ানোকোবাল্যামিনে রয়েছে কোবাল্ট পরমাণু।

মারাত্মক রক্তশূন্যতা (pernicious-anæmia) রোগযুক্ত ব্যক্তির রক্তে স্বল্প পরিমাণ সায়ানোকোবাল্যামিন সূচীপ্রয়োগ বিশেষ কার্যকর। অন্যান্য 'বি' ভাইটামিনের হাজার ভাগের এক ভাগ এই বস্তুতে দেহের চাহিদা পুরণ হয়। সুতরাং যে কোনো খাদ্যই আমরা গ্রহণ করি না কেন, তাতে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট বেশি সায়ানোকোবাল্যামিন থাকা উচিত। খাদ্যে বস্তুটির উপস্থিতি না থাকলেও অন্ত্রস্থ ব্যাকটিরিয়াগুলি কিছু পরিমাণে এই ভাইটামিনটি উৎপাদন করে। তা'হলে মারাত্মক রক্তশূন্যতা রোগের উৎপত্তি কী ভাবে হয় ?

আপাতদৃষ্টিতে রোগী অন্ত্রের প্রাচীরের মাধ্যমে দেহে যথেষ্ট পরিমাণে এই ভাইটামিনটি শোধনে সক্ষম নয়। রোগীর বিষয় ভাইটামিনটি প্রচুর পরিমাণে বর্তমান থাকে (যার অভাবে রোগী মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে)। যকৃৎ আহারের ফলে রোগী এই ভাইটামিনটির প্রাচুর্য থেকে কোনোক্রমে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সংগহ ক'রে জীবন ধারণে সক্ষম হয়। কিন্তু সূচীপ্রয়োগে যতটুকু ভাইটামিন রোগীর প্রয়োজন খাদ্যের মাধ্যমে তার শতগুণ বেশি পরিমাণ ভাইটামিনের প্রয়োজন হয়।

রোগীর অন্ত্রের কোনো গোলযোগের ফলে অন্ত্র-দেয়ালের মাধ্যমে ভাইটামিন শোষণ ব্যাহত হয়। মার্কিন চিকিৎসক ডব্লিউ. বি. ক্যাসেলের গবেষণার ফলে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এ কথা জানা গেছে যে, এই রহস্যের সূত্র রয়েছে পাচক রসে (gastric juice)। ক্যাস্‌ল্‌ পাচক রসের এই প্রয়োজনীয় উপাদানের নামকরণ করেন "ইনট্রিনসিক্ ফ্যাক্টর" (intrinsic factor, নিহিত কারণ)। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে গবেষকগণ প্রাণীদের পাকস্থলীর প্রাচীরে এমন একটি বস্তু আবিষ্কার করেন, যেটি ভাইটামিন শোষণে সাহায্য করে এবং ক্যাস্‌ল্‌ কথিত

"ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর" ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে পার্নিশাস এ্যানিমিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পাকস্থলীতে এই বস্তুটি অনুপস্থিত। যদি বস্তুটি সামান্য পরিমাণে সায়ানোকোবাল্যামিনে মিশ্রিত করা হয়, তবে রোগীর পক্ষে ভাইটামিনটি শোষণে কোনো অসুবিধা হয় না। ঠিক কী ভাবে এই "ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর" বস্তুটি ভাইটামিন শোষণে সাহায্য করে তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

আবার কণামাত্রার মৌলের (trace elements) আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক। প্রথম যে কণা মাত্রার মৌলটি আবিষ্কৃত হয় তা কোনো ধাতু নয়, বস্তুটি আয়োডিন, যে মৌলের গুণাগুণ ফ্লোরিনের মতোই। এই গল্পের সূত্রপাত থাইরয়েড গ্রন্থিতে (thyroid gland)।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান প্রাণরসায়নবিদ ই. বোম্যান আবিষ্কার করেন যে, আয়োডিনের উপস্থিতিই থাইরয়েডের বিশেষত্ব, যে মৌলটি দেহস্থ অন্যান্য কলা-গুলিতে (tissues) অনুপস্থিত। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড মেরিন নামে এক চিকিৎসক ক্লীভল্যাণ্ডে সবেমাত্র চিকিৎসা ব্যবসা শুরু ক'রেই সেই অঞ্চলে গল-গণ্ড (Goiter) রোগের প্রাবল্য লক্ষ্য ক রে বিস্মিত হন। গলগণ্ড রোগটি খুবই প্রকট—রোগীর থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডটি স্ফীত হয় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি বুদ্ধিহীন, অলস, উত্তেজনা প্রবণ, চঞ্চল এবং বিস্ফারিত চক্ষুতারকা বিশিষ্ট হয়। রোগটি ছোঁয়াচে নয়। ডাঃ মেরিন আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, যে মৌলটির উপস্থিতি থাইরয়েডের বিশেষত্ব, সেই আয়োডিনের ন্যূনতাই উক্ত রোগের কারণ নয় ত? ক্লীভল্যাণ্ড, সমুদ্র থেকে দূরবর্তী হওয়ায় মৃত্তিকায় আয়োডিন দুর্লভ হওয়া সম্ভব এবং সমুদ্র তীরের মতো আয়োডিন সমন্বিত সামুদ্রিক আহার্যেরও সেখানে অভাব।

ডাক্তার প্রাণীদের উপর গবেষণা চালান এবং দশ বছর পর নিশ্চিত হয়ে গলগণ্ড রোগীদের আয়োডিন সমন্বিত যৌগ আহার্যের সাহায্যে চিকিৎসার চেষ্টা করেন। সম্ভবতঃ এই পদ্ধতির সফলতায় তিনি খুব বেশি আশ্চর্যান্বিত হননি। মেরিন তখন খাদ্যে ব্যবহৃত লবণে এবং সমুদ্র দূরবর্তী শহরসমূহের পানীয় জলে, যেখানে মৃত্তিকাস্থ আয়োডিনের ন্যূনতা রয়েছে, আয়োডিন সমন্বিত যৌগ মিশ্রণের উপদেশ দেন। তাঁর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা হয় এবং আরও দশ বছর পরে তবেই পানীয় জল এবং লবণে আয়োডিন সমন্বিত যৌগ মিশ্রণের প্রথা স্বীকৃত হয়। আয়োডিনের পরিপূরণ ব্যবস্থা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরল ধরনের গলগণ্ড রোগের প্রাদুর্ভাব কমে গেল।

বর্তমানে আমেরিকায় গবেষকগণ (এবং জনসাধারণ) উপরোক্ত একই ধরনের আর একটি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয় নিয়ে আলোচনামুখর—বিষয়টি হচ্ছে দাঁতের ক্ষয় নিবারণের জন্য জলে ফ্লুরিন (Flourine) মিশ্রণ। ব্যাপারটি অবৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক লড়াইয়ের আসরে তীব্র বাদানুবাদের বিষয় এবং আজ পর্যন্ত বিরোধীপক্ষ আয়োডিনের তুলনায় ফ্লুরিনের ব্যাপারে বাধা দানের তীব্রতায় অনেক বেশি সফল। সম্ভবতঃ এই ব্যাপারের অন্যতম কারণ এই যে, গলগণ্ডের বিকৃতির মতো দাঁতে গর্ত হওয়া ততটা গুরুতর বলে প্রতীত হয় না।

এই শতাব্দীর শুরুতেই দন্তচিকিৎসকগণ লক্ষ্য করেন যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোনো অঞ্চলে (যেমন আরকানসাসের কোনো কোনো অঞ্চল) লোকের দাঁতে কালো কালো দাগ দেখা যায়—তাদের দাঁতের কলাই (enamel) রঙীন হয়। কালক্রমে আবিষ্কৃত হ'ল যে, এই ব্যাপারের কারণ, স্থানীয় অঞ্চলের পানীয় জলে ফ্লুরিনের অস্তিত্ব স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি। পানীয় জলের ফ্লুরিনে গবেষকদের মনোযোগ আকৃষ্ট হ'লে আর একটি কৌতুহলোদ্দীপক আবিষ্কার সংঘটিত হ'ল। দেখা গেল যে, যে অঞ্চলের জলে ফ্লুরিনের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি সে অঞ্চলের লোকদের দাঁতের ক্ষয়ের হার অস্বাভাবিক ভাবে কম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ইলিনয়ের গালেসবার্গ শহরের তরুণদের দাঁতে গর্তের হার নিকটবর্তী কুইন্সী শহর বাসিন্দাদের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ—গালেসবার্গের জলে ফ্লুরিন বর্তমান এবং কুইন্সির জলে ধরতে গেলে ফ্লুরিন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

দাঁতের ব্যথায় যাঁরা ভুগছেন নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, দাঁতের ক্ষয় হাসির ব্যাপার নয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই রোগের জন্য বছরে চিকিৎসকদের বিল মেটাতে পনেরো হাজার কোটি ডলারেরও বেশি ব্যয় হয় এবং ৩৫ বছর বয়সেই দুই তৃতীয়াংশ আমেরিকান অন্ততঃ কিছু স্বাভাবিক দাঁত হারায়। জলে ফ্লুরিন মিশ্রণ নিরাপদ কি না এবং সেই ব্যবস্থায় দন্তক্ষয় নিবারিত হয় কি না এই বিরাট গবেষণা কার্যের জন্য দন্তগবেষকগণ সমর্থন লাভে সমর্থ হন। তাঁরা আবিষ্কার করেন, পানীয় জলে প্রতি দশ লক্ষ ভাগে এক ভাগ ফ্লুরিন মিশ্রণে দাঁত রঙীন হয় না কিন্তু ক্ষয় নিবারিত হয়। সুতরাং তাঁরা সাধারণ ব্যবহার্য পানীয় জলে দশ লক্ষ ভাগে একভাগ ফ্লুরিন মিশ্রণ পরীক্ষার মান হিসাবে গ্রহণ করেন।

রাসয়নিক ধর্মে ফ্লুরিন ক্লোরিনের সমগোত্রীয়। যে মাত্রায় বস্তুটি ব্যবহারের

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে অধিকমাত্রায় সেটি প্রবল অধিবিষগুণসম্পন্ন (toxic) কিন্তু সে কথা অন্যান্য মৌলের ব্যাপারেও সত্য, সব কিছুই মাত্রা নির্দিষ্ট। বিশেষ মাত্রায় ক্লোরিন, আয়োডিন এবং কণামাত্রার মৌলগুলিও (যেমন তামা) অধিবিষগুণ সম্পন্ন। জলে দশ লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্রা বস্তুতঃই অতি সামান্য। তবুও অজ্ঞাত কোনো উপায়ে পানীয় জলের সামান্য মাত্রার এই ফ্লুরিন দাঁতের কলাইয়ে উপস্থিত হয়ে তার ক্ষয় নিবারণ করে। শৈশবকালেই বস্তুটি দাঁতের কলাইয়েতে যুক্ত হতে পারে, যখন দাঁত গ'ড়ে ওঠে এবং একবার কলাইয়েতে যুক্ত হলে মৌলটি সারাজীবন দাঁতের ক্ষয় নিবারণ করে।

গত দুই দশকে গবেষকগণ জল ফ্লুরিনযুক্ত করা সম্পর্কে কতকগুলি বড় রকম গবেষণাকার্য চালিয়েছেন। সম্ভবতঃ, সবচেয়ে সুপরিজ্ঞাত গবেষণাটি হচ্ছে নিউ-ইয়র্ক স্টেটের নিউবার্গের দশবৎসর ব্যাপী গবেষণা। অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে নিউবার্গ এবং পার্শ্বস্থ হাড্‌সন নদীর অপর তীরের কিংসটন—এই উভয় শহরেরই শিশুদের সাধারণ স্বাস্থ্য এবং দাঁতের গর্ত সম্পর্কে বিবরণী রাখা হয়—নিউবার্গের পানীয় জলে ফ্লুরিন মিশ্রত করা হয় এবং কিংসটনে তা করা হয় না। দশ বছর পরে উভয় শহরের শিশুদের (প্রত্যেক শহরের চার শ'য়ের উপর শিশু) স্বাস্থ্যের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়। নিউবার্গের শিশুরা, যারা ফ্লুরিন মিশ্রিত জল পান করত, সমসাময়িক কিংসটনের শিশুদের তুলনায় তাদের দাঁতে গর্তের হার শতকরা ৫৮ ভাগ কম ছিল। অনেকের মোটেই দন্তক্ষয় হয়নি। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় নিউবার্গের শিশুদের উপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়নি, সকল রকম পরীক্ষাতেই তারা কিংসটনের শিশুদের মতোই স্বাস্থ্যবান ব'লে প্রমাণিত হয়।

অন্যত্র অনুরূপ পর্যালোচনায় একই রকম ফল পাওয়া গিয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, ইলিনয়ের ইভান্‌স্টনে ১৩ বৎসর ব্যাপী জলে ফ্লুরিন মিশ্রণের ফলে সেই শহরের শিশুদের দন্তক্ষয়ের হার বহু কমে যায় এবং চিকিৎসকের বিল হিসাবে প্রায় পৌণে দশলক্ষ ডলার বেঁচে গিয়েছে—এই বিবরণী প্রকাশ করেছেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস্‌ অধ্যাপক জে. রয় ব্লেনি, যিনি উক্ত গবেষণার অধ্যক্ষ ছিলেন।

২৫ বছরের গবেষণালব্ধ জ্ঞানে দন্ত চিকিৎসকগণ বর্তমানে নিশ্চিত যে, প্রতি বছর মাথা পিছু কয়েক পেনি খরচ করলে দন্তক্ষয়ের হার তিন ভাগের

দু'ভাগ কমে যাবে, দাঁতের খরচ বাবদ অন্ততঃ দশ হাজার কোটি ডলার বাঁচবে এবং যে পরিমাণ যন্ত্রণা লাঘব ও দাঁত নষ্ট হওয়া বাঁচবে তার পরিমাণ টাকার মূল্যে হয় না। জাতীয় দন্ত এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সংগঠনগুলি—যুক্তরাষ্ট্রীয় জন-স্বাস্থ্য বিভাগ এবং অঙ্গ-রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য সংগঠনগুলি পানীয় জলে ফ্লুরিন মিশ্রণের সুপারিশ করেন। তবুও রাজনীতির দাপটে ফ্লুরিন মিশ্রণ কার্য অধিকাংশ স্থানেই ব্যাহত হয়েছে। প্রায় হাজারটির উপর শহরে মোট দুই কোটি কুড়ি লক্ষ লোক ফ্লুরিন মিশ্রিতের জল গ্রহণ করে। কিন্তু 'ফ্লুরিন মিশ্রণ বিরোধী জাতীয় সংস্থা' (National Committee aganist Flouridation) নামক একটি দল, ফ্লুরিন মিশ্রণ বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য শহরের পর শহরে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং এমন কি যেখানে ফ্লুরিন মিশ্রণের আইন কার্যকরী করা হয়েছে তা পুনরায় বাতিলের ব্যবস্থা করেছে।

এই কার্যে দুইটি মুখ্য যুক্তি বিশেষ কার্যকরী হয়েছে। একটি হচ্ছে, ফ্লুরিন যৌগগুলি বিষ। বস্তুগুলি সত্যই বিষ, কিন্তু যে মাত্রায় ব্যবহৃত হয় সে মাত্রায় নয়। অপরটি হচ্ছে ফ্লুরিন মিশ্রণ বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা হওয়ায়, ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। হতে পারে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোনো সমাজের কোনো ব্যক্তির অপর ব্যক্তিকে সহজরোধ্য রোগ আক্রমণের অধীন করার স্বাধীনতা আছে কি না। যদি বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবিধি ক্ষতিকারক হয়, তবে শুধু মাত্র ফ্লুরিন মিশ্রণ নয়, ক্লোরিন মিশ্রণ, আয়োডিন মিশ্রণ এবং এমন কি কলেরা ও বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হিসাবে টিকা গ্রহণের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম করতে হয়,—যদিও শেষোক্ত স্বাস্থ্যবিধি অধিকাংশ সভ্য শহরেই বাধ্যতামূলক।

॥ হরমোনসমূহ ॥

উৎসেচকসমূহ ভাইটামিনসমূহ, কণামাত্রার মৌলগুলি—এই সব স্বল্পমাত্রার দ্রব্যগুলি জীবের জীবনমরণ নির্ধারক। কিন্তু এইগুলি ছাড়াও চতুর্থ একটি গোষ্ঠী আছে, যা আরও বেশি ক্ষমতাশালী। সেইগুলি সব কিছুই পরিচালনা করে; সেইগুলি যেন প্রধান সুইচ, যা সমস্ত শহর কর্মচাঞ্চল্যমুখর ক'রে তোলে, যেন ইঞ্জিন নিয়ামক চাবি অথবা বলা যেতে পারে, অথবা যে লাল কাপড়, যা ষাঁড়কে উত্তেজিত করে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে দুইজন ইংরেজ শারীরবৃত্তবিদ্ উইলিয়াম ম্যাডক্ বেলিস্ এবং অর্নেস্ট হেনরি স্টারলিং পাচকতন্ত্রের এক কৌতূহলোদ্দীপক কার্যে

কৌতূহলী হন। পাকাশয়ের পশ্চাতে অবস্থিত গ্ল্যাণ্ডটি (গ্রন্থি), যার নাম অগ্ন্যাশয় (Pancreas) ঠিক যে মুহূর্তে খাদ্য পাকাশয় থেকে অন্ত্রে প্রবেশ করে —সেই মুহূর্তে অন্ত্রের উপরিভাগে নিজস্ব পাচক রস নিঃসৃত করে। কিভাবে অগ্ন্যাশয় সংবাদ পায়, কিভাবেই বা জানতে পারে—যথাযথ মুহূর্ত সমাগত? স্পষ্ট প্রতীয়মান অনুমান এই যে, স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে এই সংবাদ পরিবেশিত হয় (স্নায়ুতন্ত্রই দেহস্থ যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম বলে তখন জানা ছিল)। অনুমিত হয়, অন্ত্রে খাদ্যের প্রবেশ স্নায়ুমূলগুলি উত্তেজিত করে এবং সংবাদটি মস্তিষ্ক অথবা সুষুম্নাকাণ্ডের (spinal cord) মাধ্যমে অগ্ন্যাশয়ে পরিবেশিত হয়।

এই তত্ত্বটি যাচাই করার জন্য বেলিস্ এবং স্টার্লিং অগ্ন্যাশয়ের প্রত্যেকটি স্নায়ু কেটে বাদ দিলেন। তাঁদের পরিশ্রম বৃথা হ'ল! স্নায়ুগুলি কাটা সত্ত্বেও অগ্ন্যাশয়, সঠিক মুহূর্তেই আপন রস নিঃসৃত করতে থাকল।

বিভ্রান্ত গবেষকদ্বয় পরিবর্ত-সংবাদ-প্রদানকারী কোনো প্রণালী আছে কি না তার অনুসন্ধান শুরু করলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা এক রাসায়নিক সংবাদ-সরবরাহকারীর হদিশ পেলেন। বস্তুটি অন্ত্রের দেয়াল নিঃসৃত একটি পদার্থ। যখন বস্তুটি তাঁরা প্রাণীর দেহে সূচী প্রয়োগ করেন তখন অগ্ন্যাশয়ের রস নিঃসৃত হতে শুরু হল, যদিও সে সময় প্রাণীটি আহার গ্রহণ করছিল না। বেলিস্ এবং স্টারলিং সিদ্ধান্ত করেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় খাদ্য অন্ত্রে প্রবেশ ক'রে তার দেয়ালকে বস্তুটি নিঃসরণের জন্য উত্তেজিত করে, যে বস্তুটি রক্তস্রোতের মাধ্যমে অগ্ন্যাশয়ে উপস্থিত হয় এবং গ্ল্যাণ্ডটিকে চালু ক'রে অগ্ন্যাশয়কে রস নিঃসরণে উত্তেজিত করে। গবেষকদ্বয় অন্ত্র নিঃসৃত বস্তুটির নাম দেন 'সিক্রিটিন্' (secretin) এবং বস্তুটির সাধারণ নামকরণ করেন 'হরমোন' বা গ্রন্থিরস, যার গ্রীক শব্দগত অর্থ 'কর্মচাঞ্চল্যে উদ্বুদ্ধ করা'। বর্তমানে জানা গিয়েছে যে, সিক্রিটিন হচ্ছে ক্ষুদ্র প্রোটিন অণু।

এই ব্যাপারের কয়েক বছর আগে শারীরবৃত্তবিদ্রা আবিষ্কার করেন যে, 'এ্যাড্রিনালের' (Adrenals—kidney বা বৃক্কের উপরিভাগে দুইটি ক্ষুদ্র অবয়ব) নির্যাস দেহে সূচী প্রয়োগে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী রাসায়নিক ইয়োকিশি তাকামিনে রক্তচাপ বৃদ্ধিকারী বস্তুটি পৃথক করেন এবং নাম দেন 'এ্যাড্রিনালিন্' (পরবর্তী কালে নামটি ব্যবসায়িক নামে পর্যবসিত হয়, বর্তমান রাসায়নিক নাম 'এপিনেফ্রিন (epinephrine)। বস্তুটির পরিগঠন

এ্যামিনো এ্যাসিড টাইরোসিনের অনুরূপ, যার থেকে বস্তুটি দেহে উৎপাদিত হয়।

স্পষ্টতঃই এ্যাড্রিনালিনও একটি গ্রন্থিরস। কালক্রমে শারীরবৃত্তবিদগণ আবিষ্কার করেন যে, দেহস্থ অন্যান্য অনেক গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ডও হরমোনসমূহ নিঃসৃত করে। (গ্ল্যাণ্ড শব্দটি এসেছে ওক গাছের বীজের গ্রীক শব্দ থেকে, যে শব্দে মূলতঃ দেহস্থ যে কোনো ক্ষুদ্র কলাসমষ্টি বোঝাত। কিন্তু রস-নিঃসরণকারী যে কোনো কলাকে, এমনকি দুগ্ধ-নিঃসরণকারী কলাসমূহ এবং যকৃতের মতো বৃহৎ অঙ্গ সমূহকেও গ্ল্যাণ্ড নাম দেওয়া হ'ল। ক্ষুদ্র অবয়বগুলি, যেগুলি রস নিঃসৃত করে না সেইগুলির ক্ষেত্রে ক্রমশঃই এই নাম পরিত্যক্ত হয়, যেমন—"লিম্ফ গ্ল্যাণ্ডসমূহের" (lymph glands) নতুন নামকরণ হয়—'লিম্ফ নোডসমূহ' (lymph nodes)। তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত গলা বা বগলের নোডসমূহ সংক্রমণের ফলে বৃদ্ধি লাভ করলে মায়েরা, এমন কি চিকিৎসকরা পর্যন্ত বলে থাকেন যে 'গ্ল্যাণ্ড বেড়েছে'।

বহু গ্ল্যাণ্ডই, যেমন পৌষ্টিক নালীর পার্শ্বস্থ গ্ল্যাণ্ডসমূহ, ঘর্ম-নিঃসরণের গ্ল্যাণ্ডসমূহ এবং লালা-নিঃসরণের গ্ল্যাণ্ডসমূহ তাদের রস-নালী (duct) মারফৎ নিঃসৃত করে। কতকগুলি অবশ্য নালীবিহীন (ductless), সেইগুলি সোজাসুজি রক্তস্রোতে রস নিঃসরণ করে, যার মাধ্যমে রসটি দেহে পরিচালিত হয়। এইসব নালীবিহীন বা এণ্ডোক্রাইন গ্ল্যাণ্ড (endocrine glands) বা অন্তঃক্ষরণ গ্রন্থিসমূহের নিঃসরণই হরমোন বা গ্রন্থিরস। এই কারণে হরমোন পর্যালোচনা বিদ্যার অন্য নাম 'এণ্ডোক্রাইনোলজি' (endocrinology) বা 'গ্রন্থিরসবিদ্যা'।

প্রাণরসায়নবিদগণ যখন আবিষ্কার করেন যে, থাইরয়েড গ্রন্থিতে আয়োডিন ঘনীভূত রয়েছে তখন তাঁরা যুক্তিসংগতভাবেই অনুমান করেন যে, মৌলটি হরমোনের অংশ। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মিনেসোটার মেয়ো ফাউণ্ডেশনের এডওয়ার্ড ক্যালভিন কেনড্যাল্ থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে আয়োডিন সমন্বিত একটি এ্যামিনো এ্যাসিড পৃথক করেন, যে-বস্তুটির আচরণ হরমোনের মতো, তিনি বস্তুটির নাম দেন 'থাইরক্সিন্' (Thyroxin)। থাইরক্সিনের প্রতি অণুতে থাকে আয়োডিনের চারটি পরমাণু। এ্যাড্রিনালিনের মতোই থাইরক্সিনের সঙ্গে টাইরোসিনের গোষ্ঠী সাদৃশ্য প্রখর এবং টাইরোসিন থেকেই বস্তুটি দেহে উৎপাদিত হয়। বহু বছর পরে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণরসায়নবিদ রোসালিণ্ড পিট্-রিভার্স

এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ আর একটি থাইরয়েড হরমোন পৃথক করেন, যাতে চারটি আয়োডিন পরমাণুর বদলে তিনটি আয়োডিন পরমাণু উপস্থিত থাকায় বস্তুটির নামকরণ করা হয়। 'ট্রাই-আয়োডোথাইরোনিন্' (tri-iodothyronine)। বস্তুটি থাইরক্সিনের তুলনায় কম স্থায়ী কিন্তু কার্যকারিতা তিন থেকে পাঁচগুণ বেশি।

থাইরয়েড গ্রন্থিরসসমূহ সামগ্রিকভাবে দেহের বিপাকক্রিয়ার নিয়ামক, এইগুলি সমস্ত কোষকে কর্মে উদ্দীপিত করে। যে সকল ব্যক্তির থাইরয়েড কম ক্রিয়াশীল তারা অলস ও অনুভূতিহীন এবং কিছুকালের মধ্যেই জড়বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কারণ তাদের বিভিন্ন কোষগুলির কর্মক্ষমতা কম। বিপরীত পক্ষে অতিক্রিয়াশীল থাইরয়েড বিশিষ্ট ব্যক্তি উত্তেজনাপ্রবণ এবং অস্থির হয়, কারণ তার দেহস্থ কোষগুলি অস্বাভাবিক সক্রিয়। কম অথবা বেশি ক্রিয়াশীল উভয় ধরনেরই গ্রন্থির ফলে গলগণ্ড রোগ দেখা দেয়।

থাইরয়েড গ্রন্থি দেহের বিরাম বা পৈঠ বিপাকক্রিয়ার (basal metabolism) অর্থাৎ আরামপ্রদ পরিবেশে বিশ্রাম-গ্রহণ কালে অক্সিজেন গ্রহণের হার বা 'অলসতার হার' নিয়ন্ত্রণ করে। যদি কোনো ব্যক্তির বিরাম বিপাকক্রিয়ার হার স্বাভাবিকের তুলনায় কম বা বেশি হয়, তবে স্বভাবতঃই সন্দেহ কেন্দ্রীভূত হয় থাইরয়েড গ্রন্থির উপর। বিরাম বিপাকক্রিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ ক্লান্তিকর ব্যাপার ; কারণ রোগীকে অগ্রিম বেশ কিছু সময় অনাহারে থাকতে হবে এবং তারপর যখন বিপাকক্রিয়ার হার মাপা হবে তখন আধঘণ্টা স্থির হয়ে শুয়ে থাকতে হবে এবং তার আগেও যে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে শুয়ে থাকতে হবে সে কথা বলা বাহুল্য। এত ঝামেলা না ক'রে অবশ্য অন্যভাবে সোজাসুজি ব্যাপারটার ফয়সালা করা যেতে পারে—অর্থাৎ থাইরয়েড-গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনের পরিমাণ নির্ধারণ করা। বর্তমানে গবেষকগণ এমন উপায় আবিষ্কার করেছেন, যার দ্বারা রক্ত-স্রোতে 'প্রোটিনবদ্ধ-আয়োডিন' (Protein bound Iodine, PBI)-এর পরিমাণ নির্ণয় করা যায় ; এই পদ্ধতিতে থাইরয়েড হরমোন উৎপাদনের হার নির্ধারিত হয় এবং এইভাবে 'বিরাম বিপাক ক্রিয়া' নির্ধারণের পরিবর্তে, সহজেই সংক্ষেপে রক্ত পরীক্ষা করা সম্ভব।

সুপরিজ্ঞাত গ্রন্থিরস ইনসুলিনই প্রথম প্রোটিন, যার পরিগঠন সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা গিয়েছিল। বহু ঘটনা পরম্পরায় বস্তুটি আবিষ্কৃত হয়।

এক শ্রেণীর রোগের সাধারণ নাম ডায়বিটিস বা বহুমূত্র রোগ—যেগুলির

বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অস্বাভাবিক তৃষ্ণা এবং পরিণামে অস্বাভাবিক পরিমাণের মূত্রত্যাগ। নামটির গ্রীক শব্দগত অর্থ 'সাইফন' (সম্ভবতঃ শব্দটির স্রষ্টিকর্তা কল্পনায় দেহকে সাইফনের (syphon) মতো দেখেছিলেন, যার মধ্য দিয়ে অবিরাম জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে)। এই শ্রেণীর সবচেয়ে সাংঘাতিক রোগ হচ্ছে 'মধুমেহ' বা 'ডায়াবিটিস মেলিটাস' (Diabetes mellitus)। মেলিটাস শব্দটি এসেছে মধুর গ্রীক শব্দ থেকে এবং এই রোগের এক প্রাগ্রসর পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মূত্রে শর্করা মিশ্রিত থাকে (গ্লুকোজ হিসাবে)। শর্করার এই অপচয়ে বোঝা যায়, দেহে খাদ্যের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না এবং বস্তুতঃ বহুমূত্র রোগীর রোগ পুরাতন হবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় তেমনই ক্রমশঃই ওজন কমে যায়। এক পুরুষ আগেও এই রোগের বিশেষ কোনো চিকিৎসা ছিল না।

উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান শারীরবৃত্তবিদ জে. ফন্. মেরিং এবং ও মিন্‌কোভস্কি আবিষ্কার করেন যে, কুকুরের অগ্ন্যাশয় কেটে বাদ দিলে মানুষের বহুমূত্র রোগের অনুরূপ লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। বেলিস্ এবং স্টারলিং কর্তৃক 'সিক্রিটিন্' আবিষ্কারের ফলে অনুমিত হ'ল অগ্ন্যাশয়ের কোনো একটি গ্রন্থিরস বহুমূত্রের ব্যাপারে জড়িত। কিন্তু অগ্ন্যাশয়ের একমাত্র জ্ঞাত নিঃসরণ হচ্ছে পাচক রস; গ্রন্থিরস কোথা থেকে আসবে? একটা তাৎপর্যপূর্ণ হদিশ পাওয়া গেল। অগ্ন্যাশয়ের নালীটি বেঁধে দেওয়া হলে গ্রন্থিটির অধিকাংশ অংশ শুকিয়ে গেল, শুধু 'ল্যাংহার্নের দ্বীপপুঞ্জ' (islets of Langerhans, জার্মান চিকিৎসক পল ল্যাংহার্ন কর্তৃক ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁরই নামানুসারে.) নামক কোষপুঞ্জ অবিকৃত রইল।

সুতরাং ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডবাসী চিকিৎসক এ্যালবার্ট শার্পি-স্যাফার স্থির করেন যে, ল্যাংহার্নের দ্বীপপুঞ্জই বহুমূত্র বিরোধী গ্রন্থিরস উৎপাদন করে। তিনি এই অনুমিত গ্রন্থিরসের নাম দেন 'ইনসুলিন্' (insulin), যে কথাটির ল্যাটিন শব্দগত অর্থ 'দ্বীপ'।

অগ্ন্যাশয় থেকে এই গ্রন্থিরস নিষ্কাষণ প্রচেষ্টা প্রথমে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হ'ল। বর্তমানে আমরা জানি যে, ইনসুলিন একটি প্রোটিন এবং অগ্ন্যাশয়ের প্রোটিন বিশ্লিষ্টকারী উৎসেচকগুলি এটিকে ধ্বংস করে ও ঠিক সেই ব্যাপারই ঘটে যখন রসায়নবিদরা বস্তুটি পৃথক করার চেষ্টা করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যানাডীয় চিকিৎসক ফ্রেডারিক গ্র্যাণ্ট ব্যানটিং এবং শারীরবৃত্তবিদ্ চার্লস হারবার্ট বেস্ট (টরেণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের জে. জে. আর. ম্যাকলিয়ডের

গবেষণাগারে গবেষণারত অবস্থায়) নতুন উপায়ে এই প্রচেষ্টা করেন। প্রথমে তাঁরা অগ্ন্যাশয়ের নালীটি বেঁধে দেন। ফলে উৎসেচক উৎপাদনকারী গ্রন্থিটি শুকিয়ে যায় এবং প্রোটিন বিশ্লিষ্টকারী উৎসেচকটির উৎপাদন বন্ধ হয়; তখন, বৈজ্ঞানিকদ্বয় ল্যাংহার্নের দ্বীপপুঞ্জ থেকে হরমোনটির নির্যাস পৃথকীকরণে সক্ষম হন। বহুমূত্র রোগ নিরাময়ে বস্তুতঃই নির্যাসটি কার্যকরী হয়। ব্যানটিং পদার্থটির নাম দেন 'আইলেটিন' (isletin) কিন্তু শার্পি স্যাফার প্রস্তাবিত পুরনো ল্যাটিনিকৃত নামটিই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে। বস্তুটির নাম হয় 'ইনস্থলিন্' এবং এখনও তাই বলা হয়।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্যানটিং এবং কোনো কারণে ম্যাকলিয়ড (ইনস্থলিন আবিষ্কারে যাঁর একমাত্র অবদান হচ্ছে গ্রীষ্মের ছুটিতে তাঁর গবেষণাগার ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া) ভেষজতত্ত্ব এবং শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

দেহাভ্যন্তরে ইনস্থলিনের প্রভাব রক্তে গ্লুকোজ গাঢ়তার মাত্রার তারতম্যে পরিষ্কার বোঝা যায়। সাধারণতঃ দেহ অধিকাংশ গ্লুকোজ এক ধরনের 'গ্লাইকোজেন' (glycogen) হিসাবে যকৃতে সঞ্চিত করে, শুধু কোষের সাময়িক চাহিদা পুরণের জন্য সামান্য মাত্রার গ্লুকোজ রক্তস্রোতে থেকে যায়। রক্তে গ্লুকোজের ঘনতা বেশি হলে অগ্ন্যাশয় ইনস্থলিন উৎপাদনে উদ্দীপিত হয়, যা রক্তস্রোতে মিশে গ্লুকোজের মাত্রা কমিয়ে আনে। বিপরীত পক্ষে গ্লুকোজ মাত্রা অত্যন্ত কম হলে ইনস্থলিন উৎপাদন মন্দীভূত হয়, যার ফলে শর্করার ঘনত্ব বাড়ে। এইভাবে ভারসাম্য স্থাপিত হয়। ইনস্থলিনের উৎপাদনের গ্লুকোজের ঘনত্ব কমে, ফলে ইনস্থলিন উৎপাদন মন্দীভূত হয়, ফলে গ্লুকোজের ঘনত্ব বাড়ে, ফলে ইনস্থলিন উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ফলে গ্লুকোজের ঘনত্ব কমে—এইভাবে চলে। এই ব্যাপারটাকে বলা হয় 'ফীড-ব্যাক্' (feed-back) পদ্ধতি। গৃহাভ্যন্তরে তাপ নিয়ন্ত্রণকারী 'স্থির উষ্ণতার যন্ত্র' বা থার্মোস্ট্যাট (thermostat) একই পদ্ধতিতে কাজ করে।

রক্ত-শর্করার ঘনত্বের ব্যাপারে ল্যাংহার্ন দ্বীপপুঞ্জ নিঃসৃত দ্বিতীয় একটি গ্রন্থিরস এই নিয়ন্ত্রণকার্য আরো নিপুণতর পন্থায় করার সহায়ক। এই দ্বীপ-পুঞ্জ দুই ধরনের বিশেষ কোষ দ্বারা গঠিত—'আল্ফা' (alpha) ও 'বীটা' (beta)। বীটা-কোষগুলি ইনস্থলিন উৎপাদন করে আর আলফা-কোষগুলি 'গ্লুকাগোন' (glucagon) নামে একটি গ্রন্থিরস উৎপাদন করে। গ্লুকাগোনের

কার্যকারিতা ইনসুলিনের বিপরীত, ফলে রক্তে গ্লুকোজ ঘনত্বের প্রভাবে দুই হরমোনের ক্রিয়ায় ভারসাম্যের এদিক-ওদিক হয়ে থাকে।

বহুমূত্র রোগের ক্ষেত্রে বিপদ হচ্ছে এই যে, 'ল্যাংহার্নের দ্বীপপুঞ্জে'র ইনসুলিন উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং রক্তে গ্লুকোজের ঘনত্ব বাড়তে থাকে। যখন এই ঘনত্ব স্বাভাবিকের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ে, তখন মাত্রা 'বৃক্ক প্রবেশ পথ' (renal threshold) অতিক্রম করে অর্থাৎ গ্লুকোজ উপচিয়ে মূত্রের সঙ্গে মিশে যায়। এক দিক দিয়ে মূত্রে মিশে গ্লুকোজের এই অপচয় মন্দের ভালো, কারণ যদি রক্তে গ্লুকোজের ঘনত্ব আর বাড়ত তবে রক্তের সান্দ্রতাও (viscocity) বাড়ত, ফলে হৃদযন্ত্রের উপর অনাবশ্যক চাপ বাড়ত। (হৃদযন্ত্র রক্তসঞ্চালনের জন্য পরিকল্পিত, গুড়ের জন্য নয়)।

মধুমেহ রোগ নির্ণয়ের ক্লাসিক পদ্ধতি হচ্ছে, মূত্রে শর্করার উপস্থিতি নির্ণয় করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কয়েক ফোঁটা মূত্র 'বেনেডিক্টের' দ্রবণে (আমেরিকার রসায়নবিদ ফ্র্যান্সিস্ গ্যানো বেনেডিক্টের নামানুসারে) তপ্ত করা হয়। উপরোক্ত দ্রবণে কপার সালফেট (Copper Sulphate) থাকায় রঙ ঘন নীল হয়। যদি মূত্রে গ্লুকোজ না থাকে তবে দ্রবণটির রঙ নীলই থাকে। যদি গ্লুকোজ উপস্থিত থাকে তবে কপার সালপেট কিউপ্রাস অক্সাইডে (cuprous oxide) পরিবর্তিত হয়। কিউপ্রাস অক্সাইড বস্তুটি ইঁটের মতো লাল রঙের অদ্রবণীয় বস্তু। সুতরাং টেস্ট-টিউবের তলদেশে রক্তাভ অধঃক্ষেপ নির্ভুলভাবে মূত্রে শর্করার উপস্থিতি প্রমাণ করে, যার অর্থ হচ্ছে মধুমেহ রোগ।

বর্তমানে সহজতর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা ছোট ছোট কাগজের টুকরো দুই ধরনের উৎসেচক—গ্লুকোজ ডিহাইড্রোজেনেস্ (glucose dehydrogenase) এবং পারক্সিডেজ (Peroxidase) ও জৈব বস্তু 'অরথোটলিডিনে' (orthotolidine) ভেজানো হয়। হলদে রঙের এই কাগজের টুকরো রোগীর মূত্রে ডুবিয়ে বাতাসে মেলে দেওয়া হয়। গ্লুকোজ উপস্থিত থাকলে বস্তুটি গ্লুকোজ ডিহাইড্রোজেনেসের প্রভাবন সহায়তার মারফৎ বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়। ফলে হাইড্রোজেন পারক্সাইড (Hydrogen peroxide) উৎপন্ন হয়। তখন কাগজস্থ পারক্সিডেজ এই হাইড্রোজেন পারক্সাইডকে অরথোটলিডিনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে সাহায্য করে, যার ফলে ঘন নীল রঙ উৎপন্ন হয়। সংক্ষেপে হলদে কাগজটি মূত্রে ডোবানর

ফলে যদি নীল রঙে পরিবর্তিত হয় তবে প্রবল সন্দেহ করা যেতে পারে যে, মধুমেহ রোগ হয়েছে।

মূত্রে সর্করার উপস্থিতির অর্থ মধুমেহ রোগ রোগীর দেহে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। তার চেয়ে গ্লুকোজ মাত্রা যাচাই ক'রে বৃক্ক প্রবেশপথ অতিক্রম করার পুর্বেই রোগ নির্ণয় করা উৎকৃষ্টতর পন্থা। বর্তমানে বহুল প্রচলিত পরীক্ষা হচ্ছে 'গ্লুকোজ সহন পরীক্ষা' (glucose tolerance test) অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির আহার্যে গ্লুকোজ সংযুক্ত ক'রে, পরে রক্তে গ্লুকোজ মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে ঐ মাত্রার কম হওয়ার হার পরিমাপ করা স্বাভাবিকভাবে অগ্ন্যাশয় থেকে এক্ষেত্রে প্রচুর ইনস্থলিন নিঃসৃত হয়। সুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে দু'ঘণ্টার মধ্যেই শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে আসে। যদি শর্করার মাত্রা তিন ঘণ্টা বা তার পরেও বেশি থাকে তবে বুঝতে হবে অগ্ন্যাশয়ের কর্মক্ষমতা কম—অর্থাৎ সেই বিশেষ ব্যক্তি সম্ভবতঃ মধুমেহ রোগের প্রাথমিক আক্রমণে আক্রান্ত।

ব্যানটিং এবং বেস্ট কর্তৃক ইনস্থলিন পৃথকীকরণের এক বছরের মধ্যেই চিকিৎসকরা বহুমূত্র রোগীদের সূচীপ্রয়োগে গ্রন্থিরসটি দান করার মাধ্যমে চিকিৎসা করতে থাকেন। কিন্তু যদিও সূচীপ্রয়োগে বহুমূত্রে আক্রান্ত রোগী পরিমিত স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারে তবুও এইভাবে নিয়মিত ইনস্থলিন গ্রহণে অসুবিধাও প্রচুর। ইনস্থলিনের এই অধিক মাত্রা স্বাভাবিক অব্যাহত 'ফীড-ব্যাক্' পদ্ধতির সূক্ষ্ম সাম্যের তুলনায় রক্ত মাত্রায় হঠাৎ বড় রকমের পরিবর্তন আনে। তাছাড়া অবশ্য 'হাইপো-ডারমিক সূঁচ'ও (hypodermic needles) বিরক্তিকর। দুর্ভাগ্যক্রমে ইনস্থলিন খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায় না, কারণ পাকস্থলীতে বস্তুটি দ্রুত বিশ্লিষ্ট হয়। যাই হোক, ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে গবেষকগণ 'ইনস্থলিনেস্' নামে একটি উৎসেচক আবিষ্কার করেন, যে-বস্তুটি ইনস্থলিন ধ্বংস করে ; বস্তুটির কার্যকারিতা হচ্ছে দেহস্থ বাড়তি ইনস্থলিন সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করা। অনুমান করা যাক্, এই উৎসেচকটির কার্যকারিতা নষ্ট করা সম্ভব, তাহলে বহুমূত্র রোগাক্রান্ত রোগীর সামান্য স্বাভাবিক ইনস্থলিন সরবরাহ বেশিক্ষণ কাজ করতে সক্ষম হবে। সে ক্ষেত্রে রোগী হয়ত গ্রন্থিরসটির সূচীপ্রয়োগ ছাড়াই বাঁচতে পারবে। উক্ত উৎসেচকটি অকর্মণ্য করার ওষুধ হয়েছে।

বস্তুতঃ, বহুমূত্র রোগের কয়েকটি ক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য দুই ধরনের বটিকা

ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে একটি কোষগুলির শর্করা ব্যবহারে সাহায্য করে।

সম্ভবতঃ ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে ইনস্থলিনের কিছু ভূমিকা আছে।

যদিও ইতিহাসে এমন আহার-সচেতন জাতি আর দেখা যায় না, তবুও আমেরিকার মতো স্থ-আহারী জাতির মধ্যে দেহের ওজনের অতিবৃদ্ধি প্রায় সর্বজনীন রূপ নিয়েছে। যদিও চিকিৎসক এবং বীমা কোম্পানীগুলি জনসাধারণকে এই কথা বোঝানোর জন্য বহু চেষ্টা করেছেন যে, ওজনের অতিবৃদ্ধির ফলে মধুমেহ, ধমনীর কাঠিন্য (atherosclerosis) প্রভৃতি গুরুতর রোগের পথ প্রশস্ত ক'রে জীবন প্রত্যাশার হার কমিয়ে দেয় তবুও এই অতি বৃদ্ধির মাত্রা কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

এই ব্যাপারের সহজ ব্যাখ্যা হচ্ছে পৃথুল (obese) লোকেরা ঔদরিক। এই মত শুধু মাত্র কৃশ লোকদের। প্রত্যেক পৃথুল লোকই সাক্ষ্য দেবে যে, মেদবৃদ্ধি তাঁদের স্বাস্থ্য, আরাম এবং আকৃতির পক্ষে ক্ষতিকর—তা জেনে বহুবার তাঁরা আহারের ব্যাপারে সংযমী হবার চেষ্টা করেছেন। সাময়িকভাবে তাঁরা স্থফল পেলেও পুনরায় তাঁদের ওজন বেড়েছে। (ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, আমার ওজন প্রায় ৩০ পাউণ্ড বাড়তি এবং উপরোক্ত মন্তব্যের সঙ্গে আমি একমত)।

মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য জটিল এক তত্ত্বের অবতারণা করেন, তাঁদের মতে অতি আহার শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বোকামি নয়, বস্তুতঃ ব্যক্তিগত সচেতন নিয়ন্ত্রণের বাইরে তাদের এই ব্যাপারে বাধ্য করা হয়। তাঁদের মতে, পৃথুল ব্যক্তিরা শৈশবের পারিবারিক প্রতিবেশের ফলে 'অস্মিতা গোলযোগে বা ব্যক্তিত্ব বিপর্যয়ে' (personality disturbance) আক্রান্ত। তাই বন্ধু-বান্ধব ও চিকিৎসকদের উপদেশ এবং নিজেদের সহজ বুদ্ধির বিরুদ্ধেও এক নির্জ্ঞাত (unconscious) শক্তি তাদের অতি আহারে বাধ্য করে।

হয়ত তাই কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা এখনও তাঁদের আবিষ্কৃত কোনো মানসিক চিকিৎসা (psychiatry) পদ্ধতির সাহায্যে পৃথুলতার হার কমাতে পারেননি। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আইওয়া স্টেট কলেজের দুইজন পুষ্টিবিদ্যাবিদ্ এল্. জি. বুকিনাল এবং ই. ইস্. এপ্রাইট্ মনোবিজ্ঞান প্রসূত পৃথুলতার কারণ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব পরীক্ষা করার প্রচেষ্টার বিবরণ দান করেন। তাঁরা গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পাঠরত ১১১টি বালিকার পর্যালোচনা করেন, যাদের দুইভাগে বিভক্ত করা হয়; একদল

তিন বৎসর যাবৎ স্পষ্টতঃই পৃথুল, অপরদল স্বাভাবিক ওজনবিশিষ্ট। দুই দলের মধ্যে ব্যক্তিত্ববাচক অথবা ব্যবহারগত কোনো পার্থক্য দেখা যায়নি। একটি মাত্র পার্থক্য যা দেখা গিয়েছিল, তা হচ্ছে এই যে, পৃথুল মেয়েদের পিতামাতা গড়ে স্বাভাবিক মেয়েদের পিতা-মাতার তুলনায় পৃথুল।

এই ব্যাপার কি পৃথুলতার বংশগত প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়? অবশ্য বলা যেতে পারে যে, পৃথুল পিতা-মাতার সন্তান খাবার টেবিলে পিতা-মাতার দেখা-দেখি খাদ্যের পরিমিতি বোধ হারাতে পারে। পরীক্ষাগারে এক ধরনের ইঁদুর উৎপাদন করা হয়েছে যেগুলিকে ইচ্ছামতো আহারের সুযোগ দিলে সমসুযোগ লাভকারী অন্যান্য প্রজাতির তুলনায় তারা দ্বিগুণ মোটা হয়ে ওঠে; এ ব্যাপারটি তাহলে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে?

অনুমিত হয়, সচেতন-খাদ্য বিলাস অথবা নির্জ্ঞাত বোধ্যকরণ—যে, কোনোটাই অতি আহারের কারণ হোক না কেন, সব ক্ষেত্রেই একটা দৈহিক প্রবণতা আছে, যা বংশগতির ফল—যেমন চোখের রঙের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকে এমন একটা কিছু নিয়ে জন্মাই,—কোনো কোনো শারীরবৃত্তবিদ যার নাম দিয়েছেন 'এ্যাপ্পেস্ট্যাট' (appestat),যেটি চুল্লী নিয়ন্ত্রণকারী 'থার্মোস্ট্যাটের' মতোই ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে। 'এ্যাপ্পেস্ট্যাট' যদি উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকে তাহলে সেই বিশেষ ব্যক্তি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি 'ক্যালরি' গ্রহণ (calories) ক'রেই চলে। যদি সে কঠোর আত্ম-সংযমের চেষ্টা করে তবুও কিছু আগে বা পরে সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যায়।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে শারীর-বৃত্তবিদ এস্. ডব্লিউ. র‍্যান্‌সন্ প্রমাণ করেন যে, 'হাইপো-থ্যালামাসের' (hypothalamus মস্তিষ্কের নিম্নাংশে অবস্থিত) একটি অংশ ধ্বংস হলে প্রাণীরা পৃথুল হয়। অনুমিত হ'ল, এ্যাপ্পেস্ট্যাটের অবস্থানের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কি থেকে এই বস্তুটির কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ হয়? 'ক্ষুধার জ্বালা' কথাটা মনে আসে। খালি পাকস্থলী তরংগিত ও আকুঞ্চিত হয় এবং খাদ্যের প্রবেশে এই আকুঞ্চন প্রশমিত হয়। সম্ভবতঃ, পাকস্থলীর এই আকুঞ্চনই এ্যাপ্পেস্ট্যাটের নির্দেশ। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়; শল্য চিকিৎসায় পাকস্থলীর অপসরণ ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত করেনি।

হারভার্ডের শারীরবৃত্তবিদ্ জাঁ মেয়ার আরও যুক্তিসঙ্গত তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, রক্তের গ্লুকোজ মাত্রায় এ্যাপ্পেস্ট্যাট সাড়া

দেয়। খাদ্য পরিপাকের পর রক্তের গ্লুকোজ মাত্রা ধীরে ধীরে কমে যায়। যখন এই মাত্রা একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে তখন এ্যাপ্পেস্ট্যাটটি আবার ক্রিয়া শুরু হয়। যদি সেই ক্ষুধার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেই ব্যক্তি আহার্য গ্রহণ করে তবে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা সাময়িকভাবে বাড়ে এবং এ্যাপেস্ট্যাটটির কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

ইনসুলিন গ্লুকাগোন ব্যবস্থার উপস্থিতি সত্ত্বেও অল্প মাত্রায় এই গ্লুকোজ মাত্রা ওঠানামা করে। সুতরাং ইন্সুলিন গ্লুকাগোন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপে ফলের তারতম্য ঘটা উচিত। প্রকৃতই গ্লুকাগোন সূচী প্রয়োগে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়ে এবং ক্ষুধা মরে যায় (সম্ভবতঃ পৃথুল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে গ্লুকাগোন উৎপাদন কম হওয়ায় গ্লুকোজের মাত্রা অস্বাভাবিক কম থাকে এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্ষুধা প্রবল থাকে। কিন্তু ব্যাপারটা এখনও দূর কল্পনার পর্যায়ে)।

যদি গ্লুকোজের মাত্রা ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে তবে মধুমেহ রোগীর ক্ষেত্রে কি হয়? মধুমেহ রোগে ইনসুলিনের ন্যূনতায়—গ্লুকোজের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেশি থাকে। তার ফলে ক্ষুধা না থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। মধুমেহ রোগীরা সর্বদাই ক্ষুৎপীড়িত।

মায়ার বলেন, গ্লুকোজ কি হারে হাইপোথ্যালামাসে প্রবেশ করবে তার হার নিয়ন্ত্রণ করে ইনসুলিন। মধুমেহ রোগে ইনসুলিনের ন্যূনতা অথবা অনুপস্থিতির ফলে এ্যাপ্পেস্ট্যাটের কোষে গ্লুকোজের প্রবেশ আরও আয়াসসাধ্য হয়ে পড়ে, ফলে যন্ত্রটির ক্রিয়া এমন হয় যেন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কম। এ্যাপ্পেস্ট্যাটটি বরাবরের মতোই চালু থাকে এবং মধুমেহ রোগী সর্বদাই ক্ষুৎপীড়িত থাকে।

এ পর্যন্ত যে-সব গ্রন্থিরসের বিষয় আলোচিত হ'ল সবই হয় প্রোটিন (যেমন ইনসুলিন, গ্লুকাগোন, সিক্রিটিন) অথবা ঈষৎ পরিবর্তিত এ্যামিনো এ্যাসিড (যেমন থাইরক্সিন, ট্রাই-আয়োডোথাইরোনিন্, এ্যাড্রিনালিন)। এইবার সম্পূর্ণ পৃথক এক গোষ্ঠীর কথা আলোচিত হবে—'স্টেরয়েড হরমোন' বা স্টেরয়েড গ্রন্থিরস (Steroid hormones)।

সেই কাহিনীর শুরু ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে, যখন দুইজন জার্মান শারীরবৃত্তবিদ্ বার্নার্ড জোনডেক্ এবং এস্ এ্যাস্হিম আবিষ্কার করেন যে, গর্ভবতী নারীর মূত্রের নির্যাস স্ত্রী-ইঁদুরে সূচীপ্রয়োগ করলে সেগুলির যৌন উত্তাপ বাড়ে।

(তাঁদের আবিষ্কার ফলে গর্ভসঞ্চারের প্রাথমিক অবস্থায় গর্ভবতী কিনা তা নির্ণয় করার পন্থা প্রথম আবিষ্কৃত হয়)। পরিষ্কার বোঝা গেল যে, তাঁরা একরকম গ্রন্থিরস আবিষ্কার করেছেন—বিশেষ ক'রে বস্তুটি 'যৌন গ্রন্থিরস' (sex-hormone)।

দুই বৎসরের মধ্যে জার্মানীর এ্যাডলফ বুটেন্যাণ্ড এবং সেণ্ট লুই বিশ্ববিদ্যালয়ের এডওয়ার্ড ডয়সি উপরোক্ত গ্রন্থিরসটি বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করতে সমর্থ হন। স্ত্রীলোকের যৌন-উত্তাপের পরিভাষা 'ইস্ট্রাস্' (estrus) শব্দ থেকে বস্তুটির নামকরণ করা হয় 'ইস্ট্রোন্' (estr ne)। বস্তুটির পরিগঠন শীঘ্রই নির্ণীত হল, দেখা গেল বস্তুটি একটি স্টেরয়েড যার পরিগঠন চতুর্চক্রযুক্ত কোলেস্টেরলের।

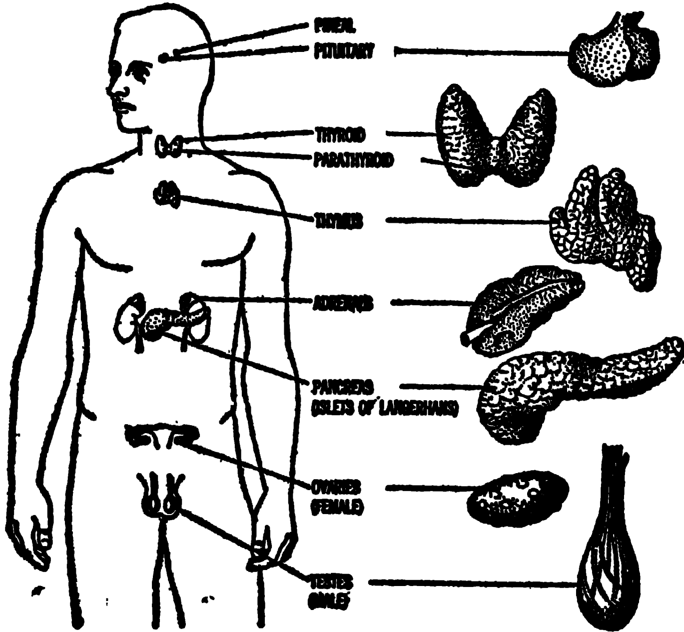
'ইস্ট্রোজেনসমূহ' (ইস্ট্রাসের জন্মদাতা—Estrogens) নামক 'স্ত্রী-যৌন হরমোন গোষ্ঠীর' মধ্যে ইস্ট্রোন্ একটি। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বুটেন্যাণ্ড প্রথম পুরুষ যৌন হরমোন অথবা 'এ্যানড্রোজেন' (পুরুষত্ব সৃষ্টিকারী—androgen) পৃথক করেন। তিনি বস্তুটির নাম দেন 'এ্যান্ড্রোস্টেরন্' (androsterone)।

কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে যে পরিবর্তন আসে তা নিয়ন্ত্রণ করে যৌন হরমোনগুলি: যথা পুরুষের দাড়ি এবং নারীর ক্ষেত্রে বক্ষের বৃদ্ধি। নারীর জটিল রজঃচক্র কয়েকটি ইস্ট্রোজেনের সম্মিলিত ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

স্ত্রী-যৌন হরমোনগুলি অধিকাংশই ডিম্বকোষে উৎপাদিত হয় এবং পুরুষ যৌন হরমোনসমূহ উৎপাদিত হয় অণ্ডকোষে। এই দুইটি অংগই তাই 'গ্ল্যাণ্ডের' বা গ্রন্থির পর্যায়ে পড়ে। যাকে বলা যায়, অত্যধিক শালীনতাবোধের দরুন জনসাধারণের ভাষায় যৌনাঙ্গসমূহকে 'গ্ল্যাণ্ড' বলে উল্লেখ করা হয়, যদিও সেইগুলির উপরে উল্লিখিত যথার্থ ই শালীন পরিভাষা রয়েছে।

যৌন গ্রন্থিরসগুলিই কেবলমাত্র 'স্টেরয়েড হরমোন' নয়। প্রথম স্টেরয়েড ধরনের অ-যৌন যে রাসায়নিক বস্তু আবিষ্কৃত হয়, তা হয় এ্যাড্রিনাল গ্রন্থিসমূহে। বস্তুতঃ সেগুলি হচ্ছে দ্বৈত গ্ল্যাণ্ড—একটি অন্তঃস্থ গ্ল্যাণ্ড যাকে বলা হয় এ্যাড্রিনাল 'মেডুলা' (medulla)—মজ্জার ল্যাটিন শব্দ থেকে গৃহীত) এবং বহিঃস্থ গ্ল্যাণ্ড, যার নাম এ্যাড্রিনাল করটেক্স (cortex) বল্কলের ল্যাটিন শব্দ থেকে গৃহীত। মেডুলা থেকেই এ্যাড্রিনালিন উৎপাদিত হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে গবেষকগণ আবিষ্কার করেন যে, প্রাণীদের এ্যাড্রিনাল গ্ল্যাণ্ড কেটে বাদ দেবার পরও (যার

ফলে মৃত্যু সুনিশ্চিত) করটেক্সের নির্যাস প্রয়োগে তারা বেঁচে থাকতে পারে। স্বভাবতঃই অবিলম্বে 'করটিক্যাল হরমোন' সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু হ'ল।



এণ্ডোক্রাইন গ্ল্যাণ্ডসমূহ (অন্তঃক্ষরণ গ্রন্থিসমূহ)

এই অনুসন্ধানের পশ্চাতে বাস্তব চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কারণ ছিল। এ্যাড্রিনাল অপসারিত করলে যে-সকল বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পায়, 'এ্যাডিসনের রোগে' ও (Addisons disease—১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ চিকিৎসক টমাস এ্যাডিসন্ কর্তৃক প্রথম বর্ণিত) একই ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্পষ্টতঃই এ্যাড্রিনাল করটেক্স কর্তৃক গ্রন্থিরস উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার ফলেই রোগটি প্রকাশ পায়। হয়ত, ইনসুলিন যেমন মধুমেহ সারায় 'করটিকাল হরমোন' সূচীপ্রয়োগেও এ্যাডিসনের রোগ সারতে পারে।

এই অনুসন্ধান কার্যে দুই জনের অবদান উল্লেখযোগ্য। একজন হচ্ছেন, টাডিয়াস রাইখস্টাইন্ (যিনি পরবর্তীকালে ভাইটামিন 'সি' সংশ্লেষিত করেন), অপর ব্যক্তি এডওয়ার্ড কেণ্ডাল (যিনি ২০ বৎসর পূর্বে প্রথম 'থাইরয়েড হরমোন' আবিষ্কার করেন)। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে গবেষকদ্বয়

এ্যাড্রিনাল করটেক্স থেকে চব্বিশটিরও বেশি বিভিন্ন যৌগ পৃথক করেন। অন্ততঃ চারটির মধ্যে হরমোনের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কেণ্ডাল যৌগ-বস্তুগুলির নামকরণ করেন—'এ' 'বি' 'ই' 'এফ্' ইত্যাদি। দেখা গেল, সমস্ত 'করটিকাল হরমোন'গুলিই স্টেরয়েড।

এ্যাড্রিনালগুলি অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থি এবং সাধারণ ব্যবহার্য করটিকাল নির্যাসের জন্য অসংখ্য প্রাণীর গ্রন্থি দরকার। আপাতদৃষ্টিতে এই সমস্যার যুক্তি সংগত সমাধান হচ্ছে গ্রন্থিরসগুলি সংশ্লেষিত করা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলা কালে এক মিথ্যা গুজবের ফলে করটিকাল হরমোনের গবেষণা পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলে। খবর পাওয়া গেল, জার্মানরা আর্জেণ্টাইনের পশু বধ গৃহ থেকে এ্যাড্রিনাল গ্ল্যাণ্ডগুলি কিনে নিয়ে করটিকাল হরমোন উৎপাদন করছে, যা-সুউচ্চ বিমান উড্ডীয়নে পাইলটদের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে তুলেছে। এই গুজবে সত্য ছিল না, তবুও যুক্তরাষ্ট্র করটিকাল হরমোনসমূহ সংশ্লেষিত করার উপায় সম্বন্ধীয় গবেষণা পূর্ণ অগ্রাধিকার লাভ করে—এমন কি এই গবেষণা পেনিসিলিন ও ম্যালেরিয়া আরোগ্যকারী ওষুধ সংশ্লেষণের চেয়েও প্রাধান্য লাভ করে।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কেণ্ডাল, যৌগ 'এ'টি' সংশ্লেষিত করেন এবং পরবর্তী বছরে মার্ক-এণ্ড-কোং বস্তুটির উৎপাদন পুর্ণোদ্যমে শুরু করে। সকলকে হতাশ ক'রে বস্তুটি এ্যাডিসনের রোগের ক্ষেত্রে মূল্যহীন বলে প্রমাণিত হ'ল। গুরুতর পরিশ্রম করে মার্কের প্রাণরসায়নবিদ লুইস এইচ. সারেট তখন ৩৭টি পর্যায় বিশিষ্ট উপায়ে যৌগ 'ই' টি সংশ্লেষিত করেন—পরবর্তী কালে যে বস্তুটির নাম হয় 'কর্টিসন' (Cortisone)।

যৌগ 'ই'টির সংশ্লেষে চিকিৎসক মহলে তখন সামান্যই সাড়া জেগেছিল। যুদ্ধ শেষ হ'ল, জার্মান পাইলটদের ক্ষেত্রে করটিকালের ভেল্কি অসত্য বলে প্রমাণিত হ'ল এবং যৌগ 'এ'টি কোনো কাজেই লাগল না। তখন অপ্রত্যাশিত একটি দিক থেকে যৌগ 'ই'টি প্রাধান্য লাভ করল।

২০ বছর ধরে মেয়ো ক্লিনিকের চিকিৎসক ফিলিপ শোয়ালটার হেঞ্চ কষ্টকর এবং সময় বিশেষে পক্ষাঘাত সৃষ্টিকারী রোগ 'রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস্' (rheumatiod arthritis) সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন। হেঞ্চ সন্দেহ করেন, এই রোগের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা দেহে আছে—কারণ, গর্ভাবস্থায় এবং কামলা রোগের (Jaundice) আক্রমণ কালে আরথ্রাইটিস্ রোগ আরোগ্য

হয়। তিনি এমন কোনো জীব-রাসয়ানিক কারণ খুঁজে পেলেন না, যা গর্ভাবস্থা ও কামলা রোগে একযোগে উপস্থিত। তিনি পিত্তরঞ্জক (bile pigments—কামলা রোগে জড়িত) এবং যৌন হরমোন (গর্ভাবস্থার সঙ্গে জড়িত) উভয়ের সূচীপ্রয়োগই চেষ্টা করেন—কিন্তু আরথ্রাইটিস্ আক্রান্ত রোগীর পক্ষে কোনোটাই কার্যকরী হয়নি।

যাই হোক, এই ব্যাপারে করটিকাল হরমোন যে জড়িত তার ইতস্ততঃ প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগল এবং ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে উপযুক্ত পরিমাণে করটিজোন লভ্য হলে হেঞ্চ বস্তুটি পরীক্ষা করেন। ফল হ'ল আশ্চর্য! ইনস্থলিনে যেমন মধুমেহ সারে না, এই ওষুধে তেমনই আরথ্রাইটিসও সারে না কিন্তু লক্ষণগুলির উপশম হয় এবং আরথ্রাইটিস আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এই উপশমই স্বর্গের আশীর্বাদ স্বরূপ। তাছাড়াও পরে প্রমাণিত হ'ল যে, এ্যাডিসনের রোগের চিকিৎসাও কর্টিসোনে সম্ভব—যা যৌগ 'এ'-র দ্বারা সম্ভব হয়নি।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'করটিকাল হরমোন' সংক্রান্ত গবেষণার জন্য কেণ্ডাল, হেঞ্চ এবং রাইনস্টাইন্ একত্রে ভেষজতত্ত্ব ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে দেহের কার্যকারিতায় 'করটিকাল' হরমোনগুলির প্রভাব এত বহুমুখী যে, সর্বদাই নানা উপসর্গের ভয় আছে এবং তার মধ্যে কোনো কোনোটি আবার মারাত্মক। তাই করটিকাল হরমোন সংক্রান্ত চিকিৎসা অত্যাবশ্যক না হলে চিকিৎসকরা বস্তুটি ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক। এই সব চরম উপসর্গগুলি দূরীকরণের জন্য করটিকাল হরমোনগুলির অনুরূপ সংশ্লেষিত নানা বস্তু (কোনো কোনোটির অণুতে ফ্লুরিন পরমাণু সংযুক্ত) ব্যবহারের চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু এখনও উপযুক্ত আদর্শ বস্তুর সন্ধান মেলেনি। আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সর্বাধিক সক্রিয় করটিকাল হরমোনগুলির অন্যতম 'এ্যালডোস্টেরন' (aldosterone) ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাইখস্টাইন্ এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ কর্তৃক পৃথকীকৃত হয়।

এইসব বিভিন্ন শক্তিশালী গ্রন্থিরসসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে কিসে? সবগুলিই (কতকগুলি এই বইতে উল্লেখই করা হয়নি) দেহে কম-বেশি চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তা সত্ত্বেও সবগুলি একত্রে এমন সুষমভাবে কাজ করে যে, দেহ-ছন্দে ছেদ না পড়ে সুষ্ঠু কার্য সম্পাদিত হয়। অনুমিত হয়, নিয়ন্ত্রণকারী এমন কিছু আছে যা বস্তুগুলির কার্য নিয়ন্ত্রিত করে।

উপরোক্ত প্রশ্নের প্রায় সঠিক উত্তর পিটুইটারী—মস্তিষ্কের নিম্নে (মস্তিকের অংশ বহির্ভূত) একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থি। প্রাচীন ধারণা যে, এই গ্রন্থির ক্রিয়ার ফলেই লালা নির্গত হয় সেই জন্যই এইরকম নামকরণ হয়েছে—কারণ, শব্দটির ল্যাটিন ব্যুৎপত্তি 'পিটুইটা' (pituita—স্পিট, spit অর্থাৎ থুথু শব্দটিও এই থেকে এসেছে)। উক্ত ধারণা ভ্রান্ত হওয়ায় বৈজ্ঞানিকগণ গ্রন্থিটির পুনর্নামকরণ করেছেন 'হাইপোফাইসিস্ (hypophysis) (গ্রীক শব্দগত অর্থ 'নিম্নে উৎপন্ন' অর্থাৎ মস্তিষ্কের নিম্নে)। কিন্তু পিটুইটারী শব্দটি এখনও সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়।

গ্ল্যাণ্ডটির তিনটি অংশ—সম্মুখবর্তী ভাগ (anterior lobe), পশ্চাদ্বর্তী ভাগ (posterior lobe) এবং কোনো কোনো জীবে এই দুইয়ের সংযোগ-সাধনী একটি ক্ষুদ্র সেতু। সম্মুখবর্তী ভাগই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, কারণ সেখানে অন্ততঃ ছয়টি হরমোন উৎপাদিত হয় (সবগুলিই ক্ষুদ্র অণু প্রোটিন), যেগুলি বিশেষ ক'রে নালীহীন গ্রন্থিগুলির উপর বিশিষ্ট ক্রিয়া করে বলে অনুমিত হয়। অন্য ভাবে বলতে গেলে পিটুইটারীর সম্মুখবর্তী অংশ অর্কেষ্ট্রা পরিচালনকারীর ভূমিকা নেয়, যার নির্দেশে অন্যান্য গ্রন্থিগুলি সুরে লয়ে চলে। (উল্লেখযোগ্য যে পিটুইটারী মাথার খুলির ঠিক কেন্দ্রে অবস্থিত ; যেন বিশেষ ক'রে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত)।

পিটুইটারীর অন্যতম দূত হচ্ছে 'থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন' (thyroid-stimulating hormone বা TSH) বস্তুটি 'ফীড ব্যাক্' পদ্ধতিতে থাইরয়েডকে উদ্দীপিত করে। অর্থাৎ বস্তুটি থাইরয়েড হরমোন উৎপাদনে থাইরয়েডকে উদ্দীপিত করে ; রক্তে থাইরয়েড হরমোনের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে পিটুইটারী কর্তৃক টি. এস্. এইচ্ উৎপাদন বন্ধ হয় ; রক্তে টি. এস্. এইচ্ কম হলে থাইরয়েড উৎপাদন বন্ধ হয়, ফলে টি. এস্. এইচ্ উৎপাদনে পিটুইটারী উদ্দীপিত হয়—এইভাবে চক্র আবর্তনে ভারসাম্য বজায় থাকে।

একই উপায়ে 'এ্যাড্রিনাল-করটিকাল-উদ্দীপক হরমোন' বা 'এ্যাড্রিনো করটিকোট্রপিক হরমোন' (ACTH এ. সি. টি. এইচ.) করটিকাল হরমোন সমূহের মাত্রা ঠিক রাখে। যদি বাড়তি এ. সি. টি. এইচ্ দেহে সূচী প্রয়োগ করা হয় তবে এই হরমোনগুলির মাত্রা দেহে বাড়বে। সুতরাং এই উপায়ে কর্টিসোন সূচী-প্রয়োগের একই ফল লাভ হয়। সেই কারণে 'রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিসের' চিকিৎসায় এ. সি. টি. এইচ্ ব্যবহৃত হয়।

পিটুইটারীর সম্মুখভাগ উৎপাদিত হরমোনগুলির মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ হচ্ছে 'সোমাটোট্রপিক হরমোন' (এস্. টি. এইচ), যার জনপ্রিয় নাম 'গ্রোথ হরমোন' (growth hormone)। বস্তুটির প্রভাবে দেহের সাধারণ বৃদ্ধিলাভ ঘটে। যে শিশুর এই গ্রন্থিরসটি যথেষ্ট উৎপাদিত হয় না সে বামনত্ব প্রাপ্ত হয়, আর যার উৎপাদন বেশি সে কালে সার্কাসের দৈত্য হয়। যদি পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির আগে এই গোলযোগ দেখা না দেয় (অর্থাৎ যখন হাড়গুলি পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়ে কঠিন হয়ে পড়ে) তখন সাধারণতঃ হাত, পা, চিবুক ইত্যাদি যে কোনটি বিরাটত্ব প্রাপ্ত হয়—যে অবস্থাকে বলা হয় 'এ্যাক্রো মিগালি' (acromegaly, বিরাট চরমপ্রান্ত সমূহের গ্রীক শব্দ থেকে গৃহীত)।

রাসায়নিক ক্রিয়ার অর্থে এই গ্রন্থিরসগুলির ক্রিয়া-রহস্য কী তার অনুসন্ধানে গবেষকগণ আজ পর্যন্ত কঠিন বাধার প্রাচীরেই ব্যাহত হয়েছেন। তাঁরা এখনও সঠিকভাবে জানেন না যে, কিভাবে একটি গ্রন্থিরস তার স্বনির্দিষ্ট কাজ-গুলি সমাধা করে।

এ কথা নিশ্চিত বলে অনুমিত হয় যে গ্রন্থিরসগুলি উৎসেচকের মতো ক্রিয়া করে না। অন্ততঃ কোন্ গ্রন্থিরস যে প্রত্যক্ষভাবে নির্দিষ্ট ক্রিয়ায় প্রভাবকের কার্য করেছে তা জানা যায়নি। বিকল্প অনুমান এই যে, গ্রন্থিরসগুলি নিজেরা উৎসেচক না হলেও উৎসেচকগুলির উপর ক্রিয়া করে—অর্থাৎ উৎসেচকের ক্রিয়া হয় উদ্দীপিত করে, না হয় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। গ্রন্থিরসগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিশদভাবে পর্যালোচিত ইনসুলিন গ্রন্থিরসটি গ্লুকোকাইনেজ' নামে (glucokinase) উৎসেচকের (যে উৎসেচকটি গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে পরিবর্তিত করার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়) সঙ্গে জড়িত বলে নিশ্চিতভাবে অনুমিত হয়। এই উৎসেচকটির কাজে এ্যান্টিরিয়র পিটুইটারী এবং এ্যাড্রিনাল করটেক্সের নির্ধাস প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং ইনসুলিন সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করে। এইভাবে রক্তে ইনসুলিনের উপস্থিতি এই উৎসেচকটিকে সক্রিয় করে তোলে ফাল গ্লুকোজের গ্লাইকোজেনে পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। কিভাবে ইনসুলিন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমায় তার ব্যাখ্যা এই তত্ত্বে পাওয়া যায়।

তথাপি ইনসুলিনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি বিপাকক্রিয়ার এতগুলি পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করে যে, উপরোক্ত একটিমাত্র ক্রিয়ার দ্বারা মধুমেহ রোগীর দেহ-রসায়নে সমস্ত অস্বাভাবিকতা উৎপাদন কী ক'রে সম্ভব তা বোঝা কঠিন।

(অন্যান্য গ্রন্থিরসের বেলাতেও একই কথা সত্য)। সেইজন্য কোনো কোনো প্রাণরসায়নবিদ আরও ব্যাপক প্রভাব অন্বেষণের পক্ষপাতী।

একটা বিশ্বাস ক্রমেই গড়ে উঠছে যে, ইনসুলিন কোনো ভাবে গ্লুকোজের কোষে অনুপ্রবেশে সহায়তা করে। এই তত্ত্ব অনুসারে মধুমেহ রোগীর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেশি হবার কারণ এই যে, কোষে শর্করা প্রবেশ করতে পারে না, ফলে তা রোগীর কোনোই কাজে আসে না। (মধুমেহ রোগীর অতৃপ্ত ক্ষুধার কারণ বর্ণনায় পূর্বেই বলা হয়েছে, মেয়ার বলেছেন যে রক্তের গ্লুকোজ এ্যাপেস্ট্যাটের কোষসমূহে প্রবেশ লাভে সমর্থ হয় না)।

যদি ইনসুলিন গ্লুকোজের কোষে প্রবেশে সহায়তা করে তবে নিশ্চয়ই বস্তুটি কোনো উপায়ে কোষ ঝিল্লীর উপর ক্রিয়া করে। কেমন করে? কেউ তা জানে না। বস্তুতঃ কোষ ঝিল্লী সম্বন্ধেই বিশেষ কিছু জানা নেই, শুধু মাত্র এইটুকু জানা গেছে যে, বস্তুটি প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় পদার্থে প্রস্তুত। আমরা কল্পনা করতে পারি, ইনসুলিন প্রোটিন অণু হিসাবে কোষ ঝিল্লীর প্রোটিনের এ্যামিনো এ্যাসিড গঠিত পার্শ্বশৃঙ্খল (side chain) পরিবর্তিত করে এবং এইভাবে গ্লুকোজের প্রবেশ-পথ খুলে দেয় (এবং সম্ভবতঃ আরও বহু বস্তুরও)।

যদি আমরা এই ধরনের সাধারণ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হই (অবশ্য বর্তমানে তার বিকল্প কিছু নেই), আমরা অনুমান করতে পারি যে, অন্যান্য গ্রন্থিরস-গুলিও প্রত্যেকে নিজস্ব ধারায় কোষঝিল্লীর উপর একইভাবে ক্রিয়া করে, কারণ প্রত্যেকটিরই নির্দিষ্ট এ্যামিনো এ্যাসিড গঠন রয়েছে। অনুরূপভাবে স্টেরয়েড হরমোনগুলি স্নেহ জাতীয় পদার্থ হিসাবে ঝিল্লীর স্নেহজাতীয় পরমাণুর উপর ক্রিয়া করে—হয় কোনো বিশেষ বস্তুর প্রবেশ-পথ খুলে দেয়, নয় বন্ধ করে। স্পষ্টতঃই কোনো বস্তুকে কোষে প্রবেশে সাহায্য করে অথবা প্রবেশ-পথ বন্ধ ক'রে গ্রন্থিরসগুলি কোষের কার্যকলাপে চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কোনো উৎসেচককে প্রচুর উপাদান সরবরাহ করে, কোনোটিকে বা বঞ্চিত করে, গ্রন্থিরসগুলি কোষের উৎপাদন কার্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, একটিমাত্র গ্রন্থিরস অনেকগুলি বস্তুর প্রবেশ বা অ-প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করে তবে একটি গ্রন্থিরস উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি বিপাক ক্রিয়ায় কী গভীর প্রভাব বিস্তার করবে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি এবং বস্তুতঃই ইনসুলিনের ক্ষেত্রে সেই ব্যাপারই ঘটে থাকে।

উপরোক্ত ছবিটি আকর্ষণীয়। কিন্তু যদি সত্যও হয় তবুও আরও প্রচুর নির্দিষ্ট ধরনের তথ্য প্রাণরসায়নবিদদের অনিবার্যরূপে প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যক্রমে তার জন্য তাঁদের আরও অপেক্ষা করতে হবে।

॥ মৃত্যু ॥

সংক্রমণ, ক্যান্সার এবং পুষ্টিগত গোলযোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আধুনিক ভেষজের অগ্রগতি এই সম্ভাবনা বৃদ্ধি করেছে যে, কোনো ব্যক্তি আরও দীর্ঘজীবি হয়ে বৃদ্ধ হওয়া অবধি বেঁচে থাকতে পারে। বর্তমান পুরুষে জাত অন্ততঃ অর্ধেক সংখ্যক ব্যক্তি ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচার আশা করতে পারে (যদি না পারমাণবিক যুদ্ধ বা অন্য কোনো একান্ত বিপর্যয় ঘটে)।

প্রাচীনকালে বার্ধক্যের ঘটনা বিরল হওয়ায়, সন্দেহ নেই যে অংশতঃ সেই কারণেই তৎকালে দীর্ঘায়ুদের প্রতি অত্যন্ত বেশি রকমের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হ'ত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, "ইলিয়াডে" 'বৃদ্ধ' প্রায়াম এবং 'বৃদ্ধ' নেস্টর সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে যে, নেস্টর তিন পুরুষ বেঁচেছিলেন, কিন্তু যে-আমলে আয়ুর গড় ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে ছিল, সেই আমলে তিন পুরুষ বাঁচার জন্য ৭০ বছরের বেশি বয়স হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। ৭০ বছর বার্ধক্যের পর্যায়ে নিশ্চয়ই পড়ে কিন্তু বর্তমানের মান অনুযায়ী ব্যাপারটা অসাধারণ নয়। যেহেতু হোমরের সময় নেস্টরের বয়স লোকের মধ্যে আলোড়ন এনেছিল, সেইহেতু পরবর্তী কালের পুরাণকাররা অনুমান করেন যে, তিনি নিশ্চয়ই প্রায় ২০০ বছরের বৃদ্ধ ছিলেন।

যথেচ্ছ আর একটি উদাহরণ সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে, শেক্সপীয়ারের "২য় রিচার্ড" এর প্রারম্ভ কথা হচ্ছে "গণ্টের বৃদ্ধ জন, ল্যাঙ্কাস্টারের সম্মানিত প্রাচীন" ইত্যাদি। কাহিনীতে উল্লিখিত আছে যে, জনের সমসাময়িকগণও তাঁকে বৃদ্ধ বলে মনে করতেন। তাই যখন জানা যায় যে, গণ্টের জন মাত্র ৫৯ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচেছিলেন তখন আমরা আশ্চর্যান্বিত হই। আমাদের কালের ইতিহাসে কৌতুহলোদ্দীপক উদাহরণ হচ্ছে, এব্রাহাম লিঙ্কন। হয় তাঁর শ্মশ্রুর জন্য, অথবা তাঁর বলিরেখাঙ্কিত বিষণ্ণ মুখের জন্য অথবা সমসাময়িককালের সঙ্গীতে তাঁকে "পিতা এব্রাহাম" বলে উল্লেখ করায় অধিকাংশ লোক মনে করেন, মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন।

অবশ্য কল্পনা করা যায় যে, তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন। যখন তাঁকে হত্যা করা হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র ৫৬ বৎসর।

এইসব বলার অর্থ এই নয় যে, আধুনিক ভেষজসমূহ আবিষ্কারের পূর্বে বাস্তবিকই বার্ধক্য অজ্ঞাত ছিল। গ্রীসে নাট্যকার সোফোক্লিস ৯০ বছর বেঁচেছিলেন, বাগ্মী আইসোক্রেটিস বেঁচেছিলেন ৯৮ বছর। পঞ্চম শতাব্দীর রোমে ফ্লেরিয়াস ক্যাসিওডোরাস ৯৫ বছর বয়সে মারা যান। দ্বাদশ শতাব্দীর ভেনিসের "ডোজ" (মুখ্য শাসক) এনরিকো ডানডোলা ৯৭ বছর বেঁচেছিলেন। রেনেসাঁস যুগের চিত্রকর টিসিয়ান্ (Titian) ৯৯ বছর বেঁচেছিলেন। পঞ্চদশ লুইএর আমলে বিখ্যাত কার্ডিনালের ভ্রাতুষ্পুত্র ম্যাক্ ছ রিসেল্যু (Richelieu) ৯২ বছর বেঁচেছিলেন।

উপরোক্ত উদাহরণে যে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, চিকিৎসার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সমাজে গড় জীবন প্রত্যাশার হার বাড়লেও, ব্যক্তিগত পরমায়ু দীর্ঘতর হয়নি। বর্তমানেও খুব কম লোকই আইসোক্রেটিস্ অথবা ডানডোলোর সমান অথবা দীর্ঘতর পরমায়ু লাভ করবে ব'লে আমরা আশা করতে পারি। আধুনিক নবতিপর ব্যক্তিরা যে অধিকতর উদ্যমের সঙ্গে জীবন-প্রবাহে অংশ গ্রহণ করতে পারবে তাও আমরা আশা করতে পারি না। ৯০ বছর বয়সে সোফোক্লিস মহান নাটকগুলি লেখেন এবং আইসোক্রেটিস বিখ্যাত বক্তৃতাগুলি রচনা করেন। টিশিয়ান জীবনের শেষ বছর পর্যন্ত অংকন কার্য চালিয়ে যান; ৯৬ বছর বয়সেও ডানডোলো ছিলেন বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ভেনেশীয় যুদ্ধের অদম্য নেতা। (আমাদের সমসাময়িক তুলনীয় কর্মতৎপর বৃদ্ধদের মধ্যে একমাত্র বার্নার্ড শ-ই সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ, যিনি ৯৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বেঁচেছিলেন)।

যদিও পূর্বের তুলনায় আমাদের কালের লোক অধিকতর সংখ্যায় ৬০ বছর বয়সে পৌছায় তথাপি সেই বয়সের পর অতীতের তুলনায় জীবন প্রত্যাশার হারের বিশেষ উন্নতি হয়নি। মেট্রোপলিটন জীবন বীমা কোম্পানী হিসাব করে দেখিয়েছে, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়স্ক পুরুষ আমেরিকাবাসীর জীবন-প্রত্যাশা দেড় শতাব্দী আগের আমেরিকার মতোই—অর্থাৎ পূর্বের হিসাবের ১৪.৮ এর তুলনায় ১৪.৩। স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ১৬.১ এবং ১৫.৮। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের পর এ্যান্টিবায়োটিকসের

আবির্ভাবের ফলে ৬০ বৎসর বয়সে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রত্যাশার হার বেড়েছে আড়াই বছর। তবে মোটের উপর বিজ্ঞান ও ভেষজের অগ্রগতি সত্ত্বেও বার্ধক্য পূর্বের ন্যায় একইভাবে একই হারে মানুষকে আক্রমণ করে। মানবিক যন্ত্রাদির ক্রমশঃ ক্ষয় এবং অবশেষে অচলতা নিবারণের কোনো উপায় মানুষের আজও জানা নেই।

অন্যান্য যন্ত্রাদির মতোই সচল অংশগুলিই প্রথম অচল হয়। শেষ সময়ে রক্ত সংবহনতন্ত্র—ক্রিয়াশীল হৃদপিণ্ড এবং ধমনীগুলিই মানুষের ক্ষেত্রে 'এ্যাকিলিসের গোড়ালী' (দুর্বলতম স্থান)। অকাল মৃত্যু দমনে মানুষের অগ্রগতি, রক্ত সংবহনতন্ত্রের গোলযোগকেই পয়লা নম্বরের মারকের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৫০ ভাগ মৃত্যুর কারণ সংবহনতন্ত্রের রোগ এবং উক্ত রোগগুলির মধ্যে শুধুমাত্র ধমনীর কাঠিন্য (atherosclerosis) রোগেই প্রতি চারজনে একজনের মৃত্যু হয়।

ধমনীর অন্তঃস্থ পৃষ্ঠে শস্যচুর্ণবৎ স্নেহজাতীয় পদার্থের অবক্ষেপন 'ধমনী কাঠিন্য' রোগের (গ্রীক শব্দগত অর্থ "শস্যচুর্ণবৎ কাঠিন্য") লক্ষণ, যার ফলে রক্ত সংবহন পাত্রগুলিতে স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালনের জন্য হৃদপিণ্ডকে কঠিনতর শ্রম করতে হয়। ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং পরিণামে ক্ষুদ্র সংবাহন পাত্রগুলির উপর চাপ পড়ায় সেগুলি ফেটে যেতে পারে। যদি মস্তিষ্কে ব্যাপারটা ঘটে (যে অঞ্চলটি বিশেষভাবে সহজ আক্রমণসাধ্য) তবে তাকে বলা হয় "সেরিব্রাল হেমারেজ" 'মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরণ' (cerebral hemorrhage) বা "স্ট্রোক" (stroke)। কখনও কখনও এই পাত্রের ফেটে-যাওয়াটা ক্ষুদ্র আকারে ঘটে থাকে, যার ফলে নগণ্য সাময়িক ঈষৎ অস্বস্তি ঘটে, বা কখনো লক্ষ্যগোচর বড় হয় না কিন্তু বৃহৎ আকারে যদি রক্ত সংবহন পাত্রের বিদারণ হয় তবে তার ফলে পক্ষাঘাত ও ত্বরিত মৃত্যু আনয়ন করে।

ধমনীর কর্কশতা এবং অপ্রশস্ততার ফলে আর একটি বিপদের ঝুঁকি আছে। ধমনীর অন্তঃস্থ কর্কশ পাত্রে অধিকতর ঘর্ষণের ফলে রক্তের জমাট বাঁধার সম্ভাবনা প্রবল এবং অপ্রশস্ত ধমনীতে রক্তের জমাট বাঁধার ফলে রক্ত সংবহন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। হৃদপিণ্ডের পেশীর সঙ্গে যুক্ত 'করোনারী ধমনী'তে (coronary artery) রক্ত সংবহন বন্ধের (করোনারী থ্রম্বসিস্—coronary thrombosis) ফলে প্রায় তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

ঠিক কী কারণে ধমনীর দেয়ালে অবক্ষেপের সূচনা হয় তা নিয়ে চিকিৎসা-

বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ কথা নিশ্চিত যে, কোলেস্টেরল এই ব্যাপারে জড়িত, কিন্তু ঠিক কি ভাবে জড়িত তা স্পষ্ট নয়। মনুষ্যরক্তের প্লাজমায় "লিপোপ্রোটিন" (lipoproteins) সমূহ রয়েছে—যে বস্তুটি কোলেস্টেরল এবং কতগুলি স্নেহজাতীয় পদার্থের মাধ্যমে কতকগুলি প্রোটিনে সংবদ্ধ। লিপোপ্রোটিনের কয়েকটি অংশ—সুস্থ অথবা রুগ্ন অবস্থায়, আহারের আগে ও পরে, একটি নির্দিষ্ট গাঢ়তায় বর্তমান থাকে। কতকগুলি বাড়ে কমে, আহারের পর বাড়ে। কতকগুলি আবার পৃথুল ব্যক্তির ক্ষেত্রে খুবই গাঢ়। কোলেস্টেরলের প্রাচুর্য সমন্বিত একটি অংশ, বিশেষ করে পৃথুল ব্যক্তি এবং ধমনী কাঠিন্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহে খুবই গাঢ়।

রক্তে স্নেহজাতীয় পদার্থ বৃদ্ধি পেলে যেমন ধমনীর কাঠিন্য রোগ হয় তেমনই মেদবহুল হওয়ার সম্ভাবনা। কৃশ লোকের তুলনায় পৃথুল ব্যক্তির আথেরোসক্লেরোসিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বহুমূত্র রোগীদের রক্তে স্নেহ জাতীয় পদার্থের মাত্রা অধিক এবং সুস্থ লোকের তুলনায় তাদের ধমনীর কাঠিন্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ; এবং সব মিলিয়ে কথা হল এই যে, মেদবহুল লোকের বহুমূত্র হওয়ার সম্ভাবনা কৃশ লোকের তুলনায় বেশি।

সুতরাং দীর্ঘজীবি ব্যক্তিরা যে কৃশ, ক্ষুদ্রকায় হয় তার মধ্যে আকস্মিকতা কিছু নেই। দীর্ঘদেহী, মেদবহুল ব্যক্তিরা আমুদে হতে পারেন কিন্তু সাধাণতঃ তাড়াতাড়িই তাঁদের চলে যেতে হয়। অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম আছে—কারণ উইনস্টন্ চার্চিল এবং হারবার্ট হুভার উভয়েই বার্ধক্যের চরমে পৌছেছিলেন এবং দুজনের কেউই কখনও কৃশ ছিলেন বলে শোনা যায়নি)।

বর্তমানে প্রশ্ন হচ্ছে খাদ্যের সাহায্যে ধমনীর কাঠিন্য রোগের বৃদ্ধি অথবা নিবারণ সম্ভব কি না। প্রাণীজ স্নেহপদার্থ—যেমন দুধ, ডিম এবং মাখন বিশেষ করে প্রচুর কোলেস্টেরল সম্পন্ন, উদ্ভিজ্জ স্নেহজাতীয় পদাথে কোলেস্টেরল কম। তাছাড়া উদ্ভিজ্জ স্নেহ জাতীয় পদার্থের স্নেহাম্লসমূহ (fatty acids) অপূর্ণযোজী unsaturated) ধরনের, যেগুলি কোলেস্টেরলের অবক্ষেপ রোধ করে। যদিও এই ব্যাপারের অনুসন্ধানে কোনো সঠিক ফল পাওয়া যায়নি তবুও লোকে ধমনীগাত্রের স্থূলত্ব রোধ কল্লে "অল্প কোলেস্টেরল সমন্বিত আহারের" জন্য ঝুঁকেছে। অবশ্য সন্দেহ নেই যে তার ফলে কোনো ক্ষতি হবে না।

অবশ্য রক্তের কোলেস্টেরল, খাদ্যের কোলেস্টেরল থেকে সংগৃহীত নয়। দেহ সহজেই কোলেস্টেরল উৎপাদনে সক্ষম এবং উৎপাদন করেও থাকে। যদি

কোলেস্টেরলবিহীন খাদ্য গ্রহণ করা হয়েও থাকে তা'হলেও রক্তের লিপো-প্রোটীনে পর্যাপ্ত কোলেস্টেরল উপস্থিত থাকে। সুতরাং এই কথা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় যে, কোলেস্টেরলের উপস্থিতিই সব নয়, নির্দিষ্ট ব্যক্তির দেহে ক্ষতিকর স্থানে উক্ত বস্তুর অবক্ষেপের প্রবণতাই আসল। সম্ভবতঃ অত্যধিক কোলেস্টেরল উৎপাদনে বংশগত প্রবণতা বর্তমান। প্রাণরসায়নবিদরা এমন ভেষজের সন্ধানে আছেন, যা কোলেস্টেরল গঠনে বাধা দেবে, তাঁরা আশা করেন, তার ফলে ধমনী-কাঠিন্যের প্রবণতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা উক্ত রোগের আক্রমণ থেকে নিস্তার পাবে।

কিন্তু ধমনী-কাঠিন্যের হাত থেকে রেহাই পেলেও লোকে বার্ধক্যে উপনীত হয়। বার্ধক্য সবজনীন রোগ। ক্রমশঃ দুর্বল হওয়া হাড়ের ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি, পেশীর শিথিলতা, জোড়গুলির কাঠিন্য প্রতিবর্তের (reflex) হ্রাস, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, মানসিক কর্মক্ষমতা হ্রাস কিছুতেই রোধ করা সম্ভব নয়। উপরোক্ত ঘটনাগুলির হার কোনো ব্যক্তির তুলনায় অপরের ক্ষেত্রে বেশি বা কম হলেও সর্বজনীন ভাবে অপ্রতিরোধ্য।

কিন্তু কেন? বার্ধক্যই বা কি? আজ পর্যন্ত এই ব্যাপারে শুধুমাত্র দূর কল্পনাই হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহের সংক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় (যার হার বংশগতির উপর নির্ভরশীল)। আবার কেউ বা বলেন, কোষসমূহে এক ধরনের 'আবর্জনা' জমে (যার হার ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন)। অনুমিত হয় যে, কোষ প্রতিক্রিয়ার ফলে জাত এইসব 'আবর্জনা' ধীরে ধীরে কোষে জমে, যা কোষ ধ্বংস অথবা দূরীভূত করতে সক্ষম নয় এবং অবশেষে সেইগুলি কোষের বিপাক ক্রিয়ায় এমন বাধার সৃষ্টি করে যে, কোষের কর্মক্ষমতা লোপ পায়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে কোষ এইভাবে অকর্মণ্য হলে দেহের মৃত্যু হয়। এই ধারণার ভিন্ন ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, প্রোটীন অণুগুলিই কালক্রমে 'আবর্জনা'য় পর্যবসিত হয়, কারণ নিজেদের মধ্যে পরসংযোগের (cross-links) ফলে সেইগুলি কঠিন ও ভংগুর হয় এবং অবশেষে দেহ যন্ত্র ক্রমে ক্রমে অচল হয়ে পড়ে।

ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালবার্ট আই. ল্যানসিং কর্তৃক অনুসন্ধানকৃত তত্ত্বই সবচেয়ে বাস্তব, তিনি বার্ধক্যের সঙ্গে কোষে পুঞ্জীভূত অ-দ্রবণীয় ক্যালশিয়ামের যোগাযোগের প্রমাণ পেয়েছেন। ক্ষুদ্র চক্রাকার প্রাণী রটিফারের

গবেষণায় তিনি আরও আবিষ্কার করেন যে, বার্ধক্যে উপনীত রটিফারের সন্তান তরুণ দম্পতি জাত রটিফারের তুলনায় অল্পজীবি।

এক শতাব্দীই যে মানুষের অপরিবর্তনীয় পরমায়ু সে কথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। প্রাণরসায়ন বিদ্যার ক্রম অগ্রগতি হয়ত একদিন এমন পদ্ধতি আবিষ্কার করবে, যা বার্ধক্য এবং রক্ত সংবহনতন্ত্রে রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষয়িষ্ণু পরিবর্তন কার্য মন্থর করে দিতে সক্ষম হবে। যদি অমরতা লাভ নাই করি অন্ততঃ আমরা দীর্ঘজীবি হতে পারব।

অবশ্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য উপরোক্ত ইচ্ছার বাস্তব পরিপূরণ (ব্যক্তি হিসাবে তা আমাদের যতই প্রলোভিত করুক না কেন) আমাদের আকাঙ্খা হওয়া উচিত কি না সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ রয়েছে।